# ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১৫ : ১৬

**এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম**
বাংলার দুটি অনালোচিত মোগল মসজিদ
**আখতার জাহান দুলারী**
ঐতিহাসিক মির্জানগর : ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধান
**শেখ রজিকুল ইসলাম**
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : পূর্ববাংলার জীবন ও প্রতিবেশ
**সৌভিক রেজা**
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচিন্তা : আত্মোপলব্ধির প্রয়াস
**সরিফা সালোয়া ডিনা**
শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ প্রসঙ্গ
**ইয়াসমিন আরা সাথী**
মেহেরপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস
**মো. নিজাম উদ্দীন**
বাংলা ভাষায় সাব'উল মু'আল্লাকাত (সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা) চর্চার ধারা ও প্রকৃতি
**আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর**
তাওফীক আল হাকিমের 'নাহরুল জুনুন' নাটকের বাংলা অনুবাদ : একটি পর্যালোচনা
**মো. আ.রশীদ সিদ্দিকী**
বাংলাদেশের টুরি জাতিগোষ্ঠী : সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয় উদ্ঘাটন
**শর্মিষ্ঠা রায়**
কৃষি ভর্তুকি এবং আখচাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব : একটি সমীক্ষা
**মোহাম্মাদ নাজিমুল হক**
স্বাধীন সুলতানী আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮) বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা
**মুনসী মুনজুরুল হক**
১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

সৌজন্য কপি

**নির্বাহী সম্পাদক**
মোঃ আবুল বাসার মিঞা

**সহযোগী সম্পাদক**
স্বরোচিষ সরকার

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০৮

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

**প্রকাশক**

মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫ ।। ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

**কভার ডিজাইন**
আবু তাহের বাবু

**সম্পাদনা সহকারী**
এস. এম. গোলাম নবী
উপ-রেজিস্ট্রার
আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

**মুদ্রক**
**মেসার্স শাহপীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস**
**কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।**

**মূল্য**
টাকা ১৫০.০০

## সম্পাদকমণ্ডলী

**নির্বাহী সম্পাদক**

**মোঃ আবুল বাসার মিঞা**
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**সহযোগী সম্পাদক**

**স্বরোচিষ সরকার**
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

**সদস্য**

**মু. আবদুল কাদির ভূঁইয়া**
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল

**এম. জয়নূল আবেদীন**
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**মোঃ আতর আলী**
প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**সৈয়দ জাবিদ হোসাইন**
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**শওকত আরা**
প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**এ.এফ.এম. শামসুর রহমান**
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী**
প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**বেগম আসমা সিদ্দিকা**
প্রফেসর, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**তারিক সাইফুল ইসলাম**
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**এম. মোস্তফা কামাল**
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

**যোগাযোগর ঠিকানা**
নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

# প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি সিডিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে"। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে।

# সূচিপত্র

এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম ॥ বাংলার দুটি অনালোচিত মোগল মসজিদ ৭

আখতার জাহান দুলারী ॥ ঐতিহাসিক মির্জানগর : ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধান ১৭

শেখ রজিকুল ইসলাম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : পূর্ববাংলার জীবন ও প্রতিবেশ ২৭

সৌভিক রেজা ॥ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচিন্তা : আত্মোপলব্ধির প্রয়াস ৪৩

সরিফা সালোয়া ডিনা ॥ শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ প্রসঙ্গ ৫৫

ইয়াসমিন আরা সাথী ॥ মেহেরপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস ৬৭

মো. নিজাম উদ্দীন ॥ বাংলা ভাষায় সাব'উল মু'আল্লাকাত (সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা) চর্চার ধারা ও প্রকৃতি ৮৫

আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ॥ তাওফীক আল হাকীমের 'নাহরুল জুনূন' নাটকের বাংলা অনুবাদ : একটি পর্যালোচনা ১০১

মো. আ. রশীদ সিদ্দিকী ॥ বাংলাদেশের টুরি জাতিগোষ্ঠী : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন ১১৫

শর্মিষ্ঠা রায় ॥ কৃষি ভর্তুকি এবং আখচাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব : একটি সমীক্ষ ১২৫

মোহাম্মাদ নাজিমুল হক ॥ স্বাধীন সুলতানী আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮) বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা ১৩১

মুনসী মুনজুরুল হক ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা ১৪৭

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# বাংলার দুটি অনালোচিত মোগল মসজিদ

এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম*

**Abstract :** Bengal came under the Mughal rule during the reign of Akbar the Great. The conquest of Bengal by the Mughals ushered in a new area of peace and progress. Under the rule of Mughal, Bengal architecture did not develop to that extent as was developed in the centre. Even then a good number of Mughal buildings came into view in different parts of Bengal. Some scholars have brought out a considerable number of these monuments in there valuable works. In spite of their hard labour a few number of monuments remain unexposed in the remote parts of the country like Senora Mosque and Haligana Idgah Mosque. The aim of the present article is to bring to light two Mughal Mosques, hitherto unknown located in the countryside.

## ভূমিকা

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এ দেশে মুসলিম শাসন যেমন প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এ দেশের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা হয়। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজীর মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের যে সূচনা হয়েছিল ইলিয়াস শাহী আমলে (১৩৪২-১৪১৫ খ্রি.) তা চরম শিখরে উন্নীত হয় এবং হোসেন শাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) আরও গতি সঞ্চারিত হয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এমন কি আসাম ও বিহারেও।[১] পরবর্তীতে সুর-আফগান শাসনামলে (১৫৩৮-১৫৭৬ খ্রি.) বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের এ ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ দেশের স্থাপত্যকলায় এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটে। সুলতানি আমলে দেশজ উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা স্থাপত্যকলার নির্মাণশৈলী ও আলঙ্কারিক রীতি-নীতি মোগলদের নিকট সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হলেও তা একেবারে বর্জিতও হয়নি। বরং কিছু পরিবর্তন ও কিছু নতুন সংযোজনের মাধ্যমে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য আরও পরিপূর্ণতা অর্জন করে। তাই বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের প্রতিটি ইমারতেই স্বদেশী ও বহির্দেশীয় স্থাপত্য রীতির অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় যার

---

* এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

[১] এ. এইচ. দানী, *মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬১), পৃ. ১১৭, পাদটীকা-২ ও ৩।

অন্যতম উদাহরণ হলো আলোচ্য দুটি মসজিদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোগল শাসনামলে প্রশাসনিক সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাকে ১৯টি সরকার এবং প্রতিটি সরকারকে আবার কতিপয় পরগণায় বিভক্ত করা হয়। এসব সরকার ও পরগণার শাসকগণ নিজ নিজ এলাকায় শাসনকার্য পরিচালনার পাশাপাশি কিছু স্থাপত্য ইমারতও গড়ে তুলেছিলেন। এরূপ দুটি স্থাপত্যকীর্তি হলো দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত সেনরা মসজিদ ও হলিগনা ঈদগাহ মসজিদ। প্রত্যন্তর অঞ্চলে নির্মিত জনদৃষ্টির অন্তরালে পতিত মসজিদ দুটির স্থাপত্যিক বিবরণ তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

## সেনরা মসজিদ

### *অবস্থান*

মসজিদটি বর্তমানে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ফুলবাড়ী উপজেলার কাজীহাল ইউনিয়নের সেনরা গ্রামের এক প্রাচীন দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বর্তমানে মসজিদটি অনেকটা ভগ্নদশা অবস্থায় দণ্ডায়মান। তবে বিদ্যমান নিদর্শন থেকে মসজিদটির ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী বিনির্মাণ সম্ভব।

### ভূমি নকশা ও গঠন (ভূমি নকশা ১ ও আলোকচিত্র ১)

আয়তাকার পরিসরে নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের বহিঃপরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৭.৯৫ মি. এবং পূর্ব পশ্চিমে ২.৮৫ মি.। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় সংযোজিত কোণস্থিত গোলায়িত বুরুজের নমুনা থেকে ধারণা করা যায় যে, এর উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণেও অনুরূপ গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজ ছিল এবং বুরুজগুলো একদা বপ্র ছেড়ে উপরে কিয়ৎদূরে উত্থিত হয়ে নিচ্ছিদ্র ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত ছিল বলে মনে হয়।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৭.০৫ মি. ও প্রস্থে ১.৫৩ মি.। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি সমবর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং নামাজগৃহের প্রতিটি 'বে' একটি করে উল্টানো বাটির ন্যায় গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। গম্বুজগুলো আবার দরজা, মিহরাব ও আড়াআড়ি খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে আড়াআড়ি খিলান দুটি সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকলেও কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকের গম্বুজ ব্যতীত অপর দুটি গম্বুজ মারাত্মকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। গম্বুজের নিম্নের ফাঁকা স্থানগুলো কৌণিকভাবে সজ্জিত ইটের বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত যার নমুনা অদ্যাবধি দক্ষিণ দিকের গম্বুজের নিম্নাংশে লক্ষ করা যায়।

নামাজগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য সম্মুখ দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথদ্বয় অপেক্ষা সামান্য বড় ও সম্মুখ দিকে কিছুটা উদ্‌গত। এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি সরু ক্ষুদ্র বুরুজ একদা বপ্র ছেড়ে উপরে উত্থিত ছিল বলে মনে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের স্থলে কেবলমাত্র দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যভাগে একটি মাত্র কুলঙ্গি বিদ্যমান যা বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে কিছুটা ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। মসজিদে ধর্মীয় গ্রন্থাদি অথবা অন্য কোনো জিনিসপত্র (প্রদীপ হতে পারে) রাখার জন্য সম্ভবত এ ধরনের কুলঙ্গি নির্মাণ করা হয়েছে। চতুঃকেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট এ প্রবেশপথগুলো আবার আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। এ কাঠামোর উপরিভাগে একসারি বদ্ধ মার্লন নকশা বিদ্যমান এবং এর উভয় পার্শ্বে আবার ফুলেল নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগে কিবলা দেয়ালে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর একটি মাত্র অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত। এ ধরনের অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব রংপুর জেলার বারিয়া মসজিদে লক্ষ করা

যায়।[২] মিহরাবটি আবার পশ্চাৎ দিকে কিছুটা উদ্‌গত এবং এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি গোলায়িত সরু ক্ষুদ্রাকৃতির বুরুজ সংযোজিত যার একটি অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। মসজিদের কার্নিস সমান্তরাল এবং এর উপর বপ্র বিদ্যমান।

## **দোচালা ইমারত** (আলোকচিত্র ২)

এ মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে ৪.৮০ মি. × ২.৮০ মি. আয়তনের একটি দোচালা ইমারত অবস্থিত। ইমারতটির পূর্ব দেয়ালে খিলান সংবলিত একটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং খিলানটি দুটি কোণ দণ্ড থেকে উত্থিত। এ প্রবেশপথ প্রস্থে ০.৮০ মি. এবং উচ্চতায় ২.১০ মি.। এর উভয় পার্শ্বে বদ্ধ প্যানেল নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ প্যানেলগুলোর অভ্যন্তরে ফুল, লতা-পাতার নকশা খোদিত। এ প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কুলঙ্গিগুলো আবার আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। বক্র কার্নিসের উপর দিয়ে এক সারি অলঙ্কৃত ঠেস (Bracket) ইমারতটির শোভা বর্ধন করছে। ঠিক এর নিচ দিয়ে একটি অলঙ্কৃত বন্ধনী (Moulding) নিয়মিত ছেদসহ কার্নিসের উভয় প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। বন্ধনীটি আবার লজেন্স মোটিফে অলঙ্কৃত।

বাংলার স্থাপত্যে দোচালা ছাদ বিশিষ্ট এ ইমারতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র বাংলার স্থাপত্যেই নয় বরং বাংলার বাইরেও এ ধরনের দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের ধারা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীতে আগ্রা দুর্গে নির্মিত *বাংলা-ই-দরসনা-ই-মুবারক* ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাহোর দুর্গে নির্মিত *শাহদারী* প্রাসাদের কথা বলা যেতে পারে।[৩] যাহোক সেনরা মসজিদ সংলগ্ন এ ইমারতের অভ্যন্তরীণ ভাগ যথেষ্ট সংকীর্ণ যা বসবাসের অনুপযোগী। এটি পাঠাগার হিসেবেও ব্যবহারের কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। স্থানীয়ভাবে এটি দরগাহ নামে পরিচিত। যদিও এর অভ্যন্তরে কবরের চিহ্ন মাত্র নেই। এ ধরনের মসজিদ সংলগ্ন দোচালা ইমারত রাজশাহী জেলার কিসমত মারিয়া মসজিদে লক্ষ করা যায়।[৪] জনাব সোহরাব উদ্দীন আহমদ মসজিদ সংলগ্ন এ ইমারতটিকে দরগাহ বা সমাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫]

## **নির্মাণ তারিখ**

এ মসজিদের কোনো শিলালিপি অথবা কোনো বিবরণ থেকে অদ্যাবধি এর কোনো সঠিক নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। তবে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করলে যেমন – দুটি খিলান দ্বারা বিভক্ত এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহ, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্রাকৃতির বুরুজের সংযোজন, বপ্র থেকে উত্থিত গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজ, সরল রৈখিক কার্নিস,

---

[২] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, "ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব", এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ১২১।

[৩] এ. বি. এম. হোসেন, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলঙ্করণ : উৎস ও ক্রমবিকাশ", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৯৯১), পৃ. ২৫৭ ; এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২; এস. এম. হাসান, *মস্কস আর্কিটেকচার অব প্রি-মুঘল বেঙ্গল* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৯), পৃ. ১৭৯।

[৪] সোহরাব উদ্দীন আহমেদ, "দি মস্ক এ্যাট কিসমত মারিয়া", *জার্নাল অব দি বরেন্দ্র রিচার্স মিউজিয়াম*, ভলিয়্যুম-৬, ১৯৮২, পৃ. ১১৫-২০।

[৫] তদেব, পৃ. ১২০।

পলেস্তারার ব্যবহার প্রভৃতি মোগল স্থাপত্য রীতির পরিচায়ক। তাছাড়া এগুলোর কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য এতদঞ্চলে অবস্থিত ফুলহার মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[৬], দরিয়াপুর মসজিদ (১৭১৭-১৮ খ্রি.)[৭], ভাঙ্গনী মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[৮] প্রভৃতি ইমারতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং গঠনশৈলীর দিক থেকে মসিজদটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমান করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

## হলিগনা ঈদগাহ মসজিদ

### *অবস্থান*

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত উপজেলা সদর থেকে ১৩ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৫ কি.মি. ও চকজুনিদ গ্রাম থেকে ২.৫ কি.মি. পূর্ব দিকে মৃত প্রায় করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মসজিদটি অবস্থিত।

**ভূমি নকশা ও গঠন** (ভূমি নকশা ২ ও আলোকচিত্র ৩)
আয়তাকার পরিসরে নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৯.৮৫ মি. ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩.৮০ মি. এবং মসজিদের দেয়ালের প্রশস্ততা ১.০৫ মি.। নামাজগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি বহু খাঁজখিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ বিদ্যমান থাকলেও উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কোনো প্রবেশপথ দেখা যায় না। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের স্থলে বহির্গাত্রে কুলঙ্গি সন্নিবেশিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী দুটি প্রবেশপথ অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ এবং সম্মুখ দিকে উদ্‌গত। এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্রাকৃতির বুরুজ সংযোজনের চিহ্ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের চার কোণায় সংযোজিত চারটি গোলায়িত বুরুজ সমান্তরাল কার্নিস থেকে কিয়ৎদূরে উত্থিত এবং এদের শিরোভাগ নিচ্ছিদ্র কিউপোলাতে সমাপ্ত।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে ৮.৩০ মি. ও প্রস্থে ২.৩৫ মি.। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান শ্রেণী দ্বারা এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি সমবর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। নামাজগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে প্রতিটি 'বে'-এর উপর একটি করে গম্বুজ অষ্টাভুজাকৃতির পিপার উপর সংস্থাপিত। এ পিপার নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানগুলো ত্রিভুজাকৃতির বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। গম্বুজ শীর্ষবিন্দুতে পদ্ম পাঁপড়ি থেকে উত্থিত কলস শির-চূড়া বিদ্যমান। মসজিদ স্থাপত্যের চিরাচরিত রীতি অনুসারে পূর্ব দেয়ালের তিনটি খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি অবতল মিহরাব সন্নিবেশিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী দুটি মিহরাব অপেক্ষা সামান্য বড়। অর্থাৎ উভয় পার্শ্বের মিহরাব দুটির পরিমাপ প্রস্থে ১.১৫ মি. ও ১.১৫ মি. এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবের পরিমাপ প্রস্থে ১.২৭ মি.। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আবার কেন্দ্রীয় খিলানপথের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে কিছুটা উদ্‌গত এবং এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি সরু ক্ষুদ্রাকৃতির বুরুজ সংযোজনের চিহ্ন লক্ষ করা যায়।

---

[৬] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।
[৭] তদেব, পৃ. ১২৪।
[৮] তদেব, পৃ. ১৪৮-৪৯।

## অলঙ্করণ

মোগল আমলে নির্মিত এ মসজিদটি এতদাঞ্চলের মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ। এ মসজিদের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (আলোকচিত্র ৪)। এর সম্মুখভাগের বহির্গাত্রের অলঙ্করণে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু মসজিদটির অপর তিন দিকের দেয়াল গাত্র পলেস্তারায় আচ্ছাদিত। এতে অনুমিত হয় যে, মসজিদটি পরিবর্তনকালীন যুগে নির্মিত হতে পারে। যার জন্য এর অলঙ্করণের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলক নকশা ও পলেস্তারার ব্যবহার-এ দুটি ভিন্ন রীতি যথা সুলতানি ও মোগল রীতির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। যাহোক এসব পোড়ামাটির আলঙ্কারিক বিষয়বস্তু হিসেবে ফুলেল নকশা, গোলাপ সদৃশ্য নকশা, বৃক্ষ লতানো চারা গাছের নকশা প্রভৃতি দেখা যায়। তাছাড়া পিপার নিম্নাংশের ফাঁকা স্থান ভরাটের জন্য ব্যবহৃত ইটগুলো এমনভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত করা হয়েছে যা এর আলঙ্কারিক শ্রীবৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। কোণস্থিত গোলায়িত বুরুজগুলোর কলসাকৃতির ভিত্তিভূমি এর আঙ্গিক অলঙ্করণে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে। গম্বুজ শীর্ষবিন্দুতে ব্যবহৃত পদ্ম নকশা ও কলস শির-চূড়া এর আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

## নির্মাণ তারিখ

আলোচ্য মসজিদটি কখন নির্মিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো শিলালিপি বা অন্য কোনো নির্ভুল তথ্য অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি। তবে এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যলোচনা করলে এ মসজিদের সম্ভাব্য নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যেমন – দুটি খিলান দ্বারা বিভক্ত এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহ, কেন্দ্রীয় মিহরাব ও কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্রাকৃতির বুরুজ সংযোজন, কোণস্থিত গোলায়িত বুরুজ, সরল রৈখিক কার্নিস, পলেস্তারার ব্যবহার, চতুঃকেন্দ্রিক খিলান প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণে অনুমান করা যায় যে, মসজিদটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। তবে গাত্র অলঙ্করণের ক্ষেত্রে উভয় রীতির সংমিশ্রণ (সুলতানি আমলের পোড়ামাটির ফলক নকশা ও মোগল আমলের পলেস্তারার অলঙ্করণ) দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, মসজিদটি সুলতানি ও মোগল আমলের পরিবর্তনকালীন যুগে নির্মিত হতে পারে। তবে এসবই অনুমান নির্ভর, কোনো দালিলিক প্রমাণপত্র পাওয়া যায়নি।

## সাধারণ আলোচনা

ভূমি নকশা ও নির্মাণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের প্রধানতম ও পবিত্র ধর্মীয় স্থাপত্য হিসেবে মসজিদসমূহকে নিম্ন বর্ণিত ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখানো যেতে পারে। যথা : (ক) প্রশান্ত কেন্দ্রীয় অংশসহ (Nave) বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, (খ) তিন বা ততোধিক গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ, (গ) এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ, (ঘ) বারান্দাযুক্ত এক ও বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, (ঙ) গম্বুজ সংবলিত খোলাচত্বর বিহীন মসজিদ এবং (চ) প্রাচীর ঘেরা খোলাচত্বর বিশিষ্ট মসজিদ।

মোগল আমলে বাংলায় সাধারণত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়। স্থাপত্যগত ও নির্মাণশৈলীর দিক থেকে বাংলার তিন বা ততোধিক গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকৃতির মোগল

মসজিদসমূহকে নিম্ন লিখিত পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।[৯] যেমন – (ক) সমাকৃতির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, (খ) বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, (গ) বিভিন্ন আকৃতির ভল্ট পরিবেষ্টিত বৃহদাকৃতরি কেন্দ্রীয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, এবং (ঘ) গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত মসজিদ।

উল্লিখিত শ্রেণী বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য মসজিদদ্বয় প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে আলোচ্য মসজিদদ্বয়ের কতকগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে কোণস্থিত গোলায়িত বুরুজের সংযোজন, তিনটি প্রবেশপথ যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি কিছুটা বৃহৎ ও সম্মুখ দিকে উদ্গত, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে সন্নিবেশিত অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব, অষ্টভুজাকৃতি পিপার উপর গম্বুজ স্থাপন, দুটি খিলান দ্বারা নামাজগৃহকে তিনটি 'বে'-তে বিভক্তিকরণ, বাংলা পান্দানতিফের ব্যবহার, বদ্ধ মার্লন নকশার ব্যবহার প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য রংপুর জেলার কাজীপাড়া মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[১০], কাজীতাড়ি মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[১১], দরিয়াপুর মসজিদ (১৭১৭-১৮ খ্রি.)[১২], কামদিয়া মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[১৩], ফুলহার মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[১৪], মাস্তা মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[১৫], তঙ্কা মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[১৬], নয়ারহাট মসজিদ (১৭৬২ খ্রি.)[১৭], মিঠাপুকুর মসজিদ (১৮১০ খ্রি.)[১৮] এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ (১৭৪০ খ্রি.)[১৯] ও কাজী সদরউদ্দীন মসজিদে (অষ্টাদশ শতাব্দী)[২০] লক্ষ করা যায়।

মসজিদ দুটির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে আরোও পরিলক্ষিত হয় যে, এদের নির্মাণশৈলীতে একদিকে যেমন মোগল রীতির প্রতিফলন ঘটেছে অন্যদিকে তেমনি প্রাক-মোগল নির্মাণ রীতিও অনুসৃত হয়েছে। মোগল স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শির-চুড়াযুক্ত কন্দাকৃতির গম্বুজ, পিপার উপর গম্বুজ স্থাপন, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের প্রক্ষিপ্ততা ও সরু ক্ষুদ্রাকৃতির বুরুজ সংযোজন, বপ্র থেকে উপরে উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, চতুঃকেন্দ্রিক খিলান, পলেস্তারার

---

[৯] সুলতান আহমদ, "টু আনপাবলিশড মুঘল মস্কস ইন রংপুর ডিস্ট্রিক্ট", *বাংলাদেশ ললিত কলা*, ভলিয়্যুম ২, ১৯৮৪, পৃ. ৪৯।

[১০] এম. এ. বারী, "মুঘল মস্কস টাইপস ইন বাংলাদেশ : অরিজিন এন্ড ডেভলপমেন্ট", অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, আই. বি. এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৪-৬৫।

[১১] তদেব, পৃ. ১৫১-৫৩।

[১২] এ. বি. এম. হোসেন, "টু লেট মুঘল ইন্সক্রিপশন", *জার্নাল অব দি বরেন্দ্র রিচার্স মিউজিয়াম*, ভলিয়্যুম ২, ১৯৭৩ পৃ. ৭১-৭৩।

[১৩] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ১১১-১২।

[১৪] তদেব, পৃ. ১১৪।

[১৫] তদেব, পৃ. ১১৮-১৯।

[১৬] তদেব, পৃ. ১১৬-১৭।

[১৭] এম. এ. বারী, পৃ. ১৬১-৬৩।

[১৮] তদেব, পৃ. ১৭৩-৭৪।

[১৯] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ১০৮-০৯।

[২০] কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, "কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ : গঠনশৈলী ও স্থাপত্য উৎস", *আই.বি.এস. জার্নাল*, ১৪শ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ. ৭-৯।

ব্যবহার, সমান্তরাল কার্নিস প্রভৃতি। অপর দিকে পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার, অবতল মিহরাব, উল্টানো বাটির ন্যায় গম্বুজ ও কোণস্থিত গোলায়িত বুরুজ সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবতল মিহরাবের ধারণা সম্ভবত প্রাক-মুসলিম সিরিয়ার গির্জার অ্যাপস হতে অনুসৃত।[২১] বাংলার স্থাপত্যে এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন – বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ (১৪৫০ খ্রি.), গৌড়ের দরাসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯ খ্রি.), তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০ খ্রি.), ধুনিয়াচক মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) প্রভৃতি। এ মসিজদদ্বয়ে ব্যবহৃত কোণস্থিত গোলায়িত বুরুজ মোগল বাংলার স্থাপত্যে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ। এ ধরনের গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজ খান জাহান রীতির অনুকরণ বলেই মনে হয় যা তুঘলক স্থাপত্য রীতি থেকে অনুসৃত।[২২] অবশ্য এ ধরনের গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার এতদঞ্চলের কুমেদপুর মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত), মাঝপাড়া মসজিদ (সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত) ও ভাঙ্গনী মসজিদে দেখা যায়।[২৩] পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহারও মসজিদটিকে কিছুটা অভিনবত্ব দান করেছে। আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[২৪] এ ধরনের পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার সুলতানী বাংলার স্থাপত্যের পাশাপাশি মোগল আমলে নির্মিত বরিশালের কমলাপুর মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)[২৫], দিনাজপুরের নায়বাবাদ মসজিদ (১৭৫৯-৮৮ খ্রি.)[২৬], ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল মসজিদ (১৬৬৩ খ্রি.)[২৭], পাবনার চাটমোহর মসজিদ (১৫৮২ খ্রি.)[২৮] প্রভৃতি ইমারতে লক্ষ করা যায়।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, বাংলার প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মোগল বাংলার রাজধানী শহরেই কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য ইমরাত গড়ে ওঠেনি বরং এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য প্রত্নকীর্তি। এসব ইমারতে কেন্দ্রীয় মোগল স্থাপত্য রীতির পাশাপাশি প্রাক-মোগল স্থাপত্য ঐতিহ্যও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং আলোচিত মসজিদ দুটিকে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাস আরো সমৃদ্ধশালী হবে বলে আশা করা যায়। আর এখানেই মসজিদ দুটির গুরুত্ব নিহিত।

---

[২১] এ. বি.এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য* (ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), পৃ. ২৭; এম. এ. বারী, *মুঘল মস্কস*, পৃ. ৫৯।

[২২] তুঘলক স্থাপত্যের বুরুজগুলো ছিল গোলাকৃতির ও অবনমন সংবলিত। আর খান জাহান আলী রীতির বুরুজগুলো গোলায়িত হলেও এগুলো অবনমন ছিল না এবং এগুলো ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত হতে দেখা যায়, দ্রষ্টব্য, এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬, আলোকচিত্র-৫৯ ও ৬৩।

[২৩] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ১২৯, ১৩৮ ও ১৪৮।

[২৪] এম. এ. বারী, "খলিফাতাবাদ : এ স্টাডি অব ইটস হিস্ট্রি এন্ড মনুমেন্টস", অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ১৯৮০, পৃ. ৭৮, পাদটীকা ২।

[২৫] তদেব, পৃ. ১৭৪-৭৫।

[২৬] এম.এ. বারী, *মুঘল মস্কস*, পৃ. ২৪৪।

[২৭] তদেব, পৃ. ১২৩।

[২৮] তদেব, পৃ. ১৩৩।

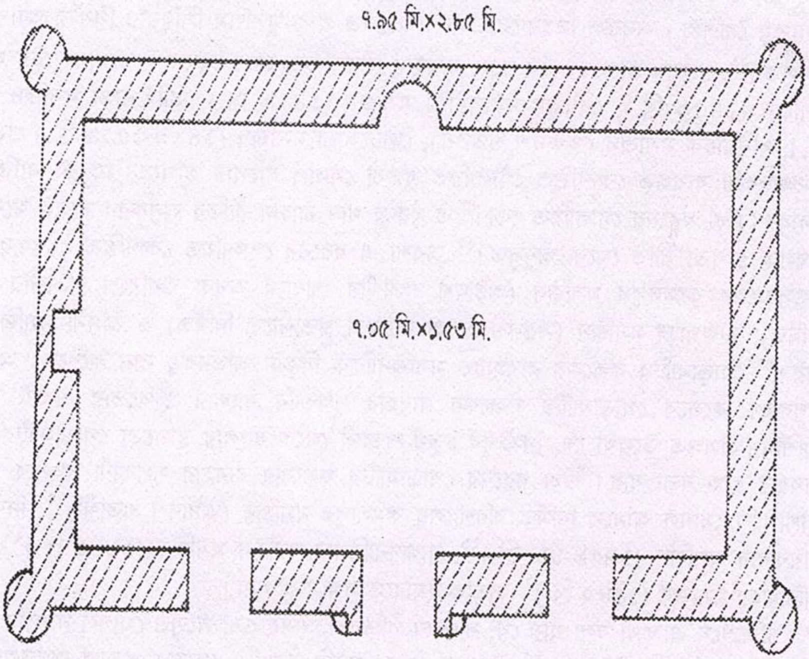
৭.৯৫ মি.×২.৮৫ মি.
৭.০৫ মি.×১.৫৩ মি.

ভূমি নকশা ১ : সেনরা মসজিদ

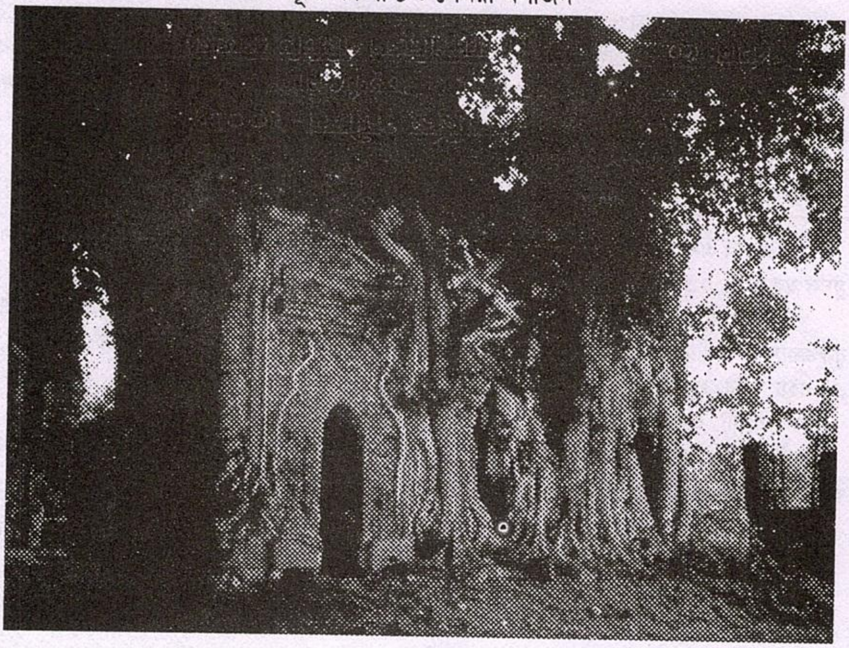

আলোকচিত্র ১ : সেনরা মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

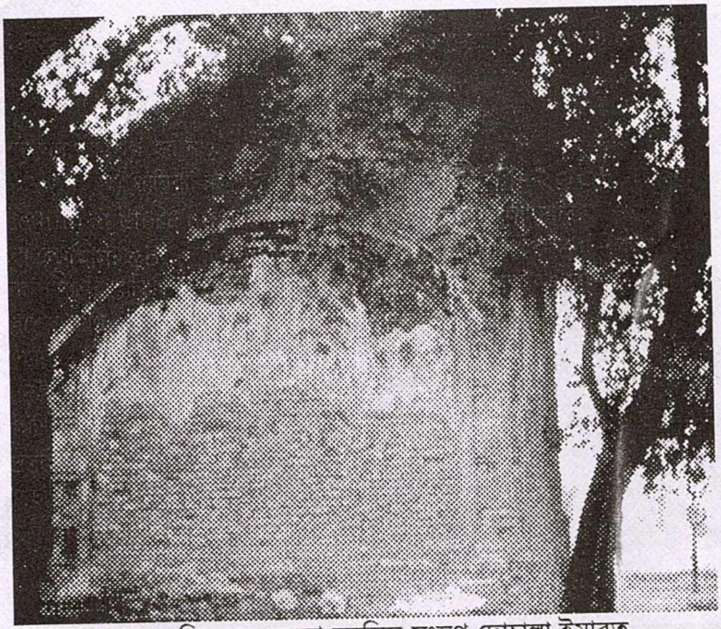

আলোকচিত্র ২ : সেনরা মসজিদ সংলগ্ন দোচালা ইমারত

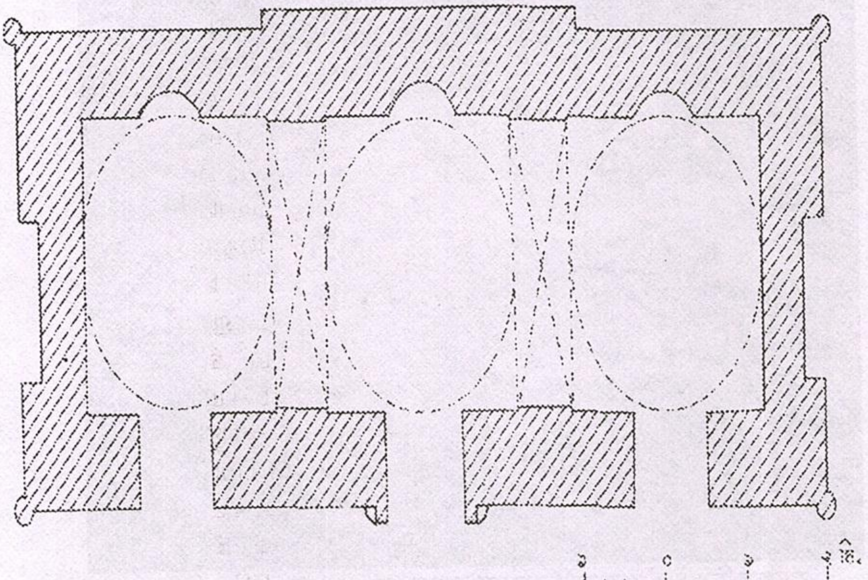

ভূমি নকশা ২ : হলিগনা ঈদগাহ মসজিদ

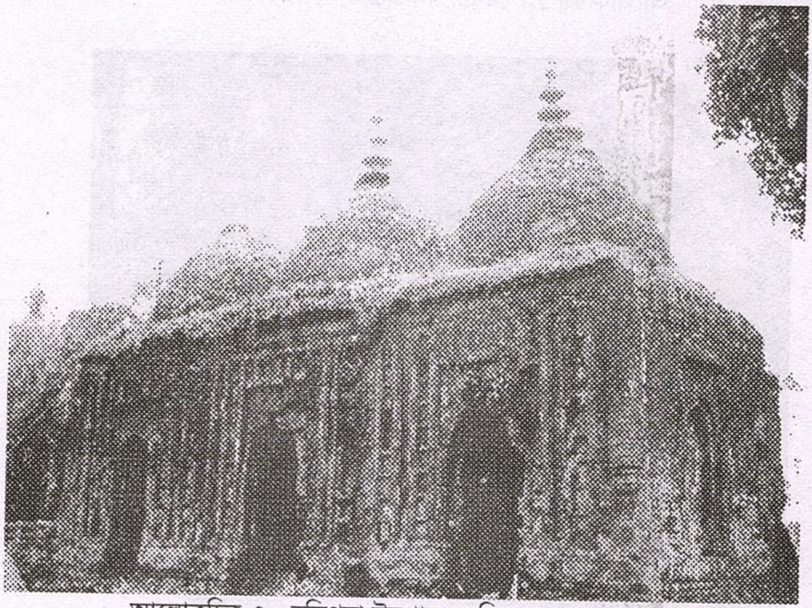

আলোকচিত্র ৩ : হলিগনা ঈদগাহ মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র ৪ : পোড়ামাটির ফলক নকশা (হলিগনা ঈদগাহ মসজিদ)্য

**ISSN 1561-798X**
**আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫**

# ঐতিহাসিক মির্জানগর : ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধান

আখতার জাহান দুলারী*

**Abstract:** Archaeologically Mirzanagar is one of the most interesting historical places of Keshabpur Upazila in the district of Jessore. Formerly it was the headquarter of the district. It seems to have derived its name from Mirza Safshikhan, the Faujdar or Military Governor, under Mughal rule. The ruins of palace, mosque, fort, etc. are still found here. The most remarkable testimony is the large masonry reservoir for bathing called 'Hammamkhana' which reminds the glory and the splendour of Mughal reign. The author tried to explore the chronological history of the place.

## পটভূমি

যশোর জেলার দক্ষিণের সর্বশেষ উপজেলা কেশবপুর বুড়িভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। এ উপজেলার ত্রিমোহিনী ইউনিয়নের এক নিভৃত গ্রাম মির্জানগর। ত্রিমোহিনী এক কালের খরস্রোতা বুড়িভদ্রা ও যমুনা নদী এবং কপোতাক্ষ নদের মিলন স্থল। মির্জানগরের ত্রিমোহিনী ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর। দেশি-বিদেশি বড় বড় জাহাজ ভিড়তো এখানে। মোগলদের প্রসাশনিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্যবাহী জাহাজ কপোতাক্ষ এবং বুড়িভদ্রা হয়ে নোঙ্গর করতো এখানে । বর্তমানে ত্রিমোহিনীতে বুড়িভদ্রা এবং যমুনার কোনো অস্তিত্ব নেই। সেখানে গড়ে উঠেছে বাজার, গ্রাম, নতুন জনপদ। মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ্ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০) যখন বাংলার সুবাদার, পারস্য রাজবংশদ্ভূত স্বীয় শ্যালকপুত্র মির্জা সাফসিকানকে যশোরের 'ফৌজদার' নিযুক্ত করেন। *Bangledesh District Gazetteers-Jessore*-এ এই 'ফৌজদার' পদটিকে 'District Governor' এবং 'Military Governor' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যশোর বলতে বর্তমানের জেলা যশোর নয়, অবিভক্ত যশোর জেলা। এ যশোর বাংলার বারভূঁইঞাদের অন্যতম প্রতাপশালী ভূঁইঞা প্রতাপাদিত্যের যশোর। মির্জা নাথান রচিত 'বাহারীস্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে এবং জেস্যুইট মিশনারিদের বিবরণে রাজা প্রতাপাদিত্যের সামরিক সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, মর্যাদা এবং ঐশ্বর্য সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ রয়েছে । ১৬০৭

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, পচামাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জাহাঙ্গীর কুলির স্থলে ইসলাম খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি মসনদে আলা মুসা খাঁ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য প্রতাপাদিত্যকে নির্দেশ দেন, সে যেন তার পুত্র সংগ্রাম আদিত্যকে দিয়ে চারশত রণতরীসহ শাহী নৌবহরে যোগ দেয় এবং ইতিমাম খাঁর সঙ্গে অবস্থান করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। যুদ্ধে বিশ হাজার পদাতিক, পাঁচশত রণতরী, পুত্র সংগ্রাম আদিত্যের রণতরীসহ এক হাজার মন বারুদ নিয়ে আন্দাল খাল হয়ে শ্রীপুর ও বিক্রমপুর যাবেন।[১] এই চুক্তিতে ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে তাঁর নিজ অধিকারে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীপুর ও বিক্রমপুর জেলার রাজস্ব মঞ্জুর করেন। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে একটি সম্মানসূচক পোশাক, একটি তরবারি, মণিমুক্তা খচিত তরবারির বেল্ট, মণিমুক্তা খচিত কর্পুরদান, পাঁচটি উচ্চজাতের ইরাকি ও তুর্কি ঘোড়া, একটি নর ও দুটি মাদী হাতি এবং একটি দামামা উপহার দেন।[২]

ভারতচন্দ্র রায় (১৭০৭-১৭৬০) তাঁর অন্নদা মঙ্গল কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে (রচনা কাল ১৭৫২) মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যশ ও সৈন্য বাহিনীর উল্লেখ করেছেন এভাবে:

যশোর নগরধাম    প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ
নাহিমানে পাতশায়    কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত-ভূপতি দ্বারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর    প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী
ষোড়শ হালকা হাতি    অযুত তরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।[৩]

প্রতাপাদিত্য ছিলেন স্বাধীন জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজ্যসীমা ছিল বর্তমান নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরাসহ যশোর, সাতক্ষীরা (সাতটি উপজেলাসহ), বর্তমান খুলনা, বাগেরহাট, এবং বাকেরগঞ্জ জেলা সমন্বয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে।[৪] প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল প্রথমে যমুনা ও ইছামতি নদীর মিলনস্থল ধূমঘাটে। সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা থেকে ৭-৮ কিলোমিটার দক্ষিণে মৌতলা গ্রামে জাহাজঘাটা নামক স্থানে প্রতাপাদিত্যের নৌ-দুর্গ, সাধারণ ব্যবহৃত কক্ষ, শয়ন কক্ষ, অফিস কক্ষ এবং হাম্মাম খানার ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে। এ স্থান জাহাজঘাটা নৌ-দুর্গ হিসেবে পরিচিত । পরবর্তীতে তিনি শ্যামনগরের ঈশ্বরীপুরে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

### যশোর নামের উৎপত্তি

যশোর নামের উৎপত্তির পেছনে অনেক ইতিহাস জড়িত। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী নির্মাণের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করার সময়ে একটি ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে একটি মূর্তি পাওয়া

---

[১] মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ২৩।

[২] মির্জা নাথান, পৃ, ২৩।

[৩] মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : খান অ্যান্ড ব্রাদার্স, ১৯৯৪), পৃ. ১৮১।

[৪] হাসান আলী চৌধুরী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৯), পৃ. ৩৩০।

যায়। রাজা বসন্ত রায় তান্ত্রিক মন্ত্রের পাঠ উদ্ধার করে স্থির করেন,' এই মূর্তি 'যশোরেশ্বরী কালী মূর্তি'। সেই থেকে ঈশ্বরীপুর এবং যশোর নামের উৎপত্তি ।[৫] সতীশচন্দ্র মিত্র বহু পূর্বের পণ্ডিত ও কুলাচার্যগণের উক্তিতে যশোর নাম ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করেন। যেমন পণ্ডিত রচিত কবিতায়, 'যশোহর পুরী কাশী দীর্ঘিকা মনিকর্ণিকা', 'ঘটক করিকায়' উল্লেখ আছে, 'সেনাপতি রুপা সা যশোহর সুরক্ষকা' অন্যত্র উল্লেখ আছে, 'রাজ বিপ্লবেন গৌড়াৎ যশোহরং সমাগতঃ।[৬] তবে বর্তমান যশোর জেলার নামের সাথে দেবীর নামে সাথে সম্পৃক্ত যশোরের কোনো মিল নেই। ঐতিহাসিকদের মতে, বর্তমান যশোর জেলা খান জাহান আলীর দেওয়া নাম। এ নামের উৎপত্তি ফার্সি শব্দ 'জসর' বা সেতু থেকে। যশোরের বার বাজার থেকে বাগেরহাট যাবার পথে ভৈরব নদীর ওপর পীর খান জাহান একটি সেতু নির্মাণ করেন। রশি দিয়ে তৈরি ঝুলানো সেতু বা 'জসর' থেকে যশোহর নামের উৎপত্তি ।[৭] মির্জা নাথানের বাহারীস্তান-ই গায়বী, মূল ফার্সি ভাষায় রচিত, এর বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ডে যশোরকে "জসর বা আধুনিক বানান 'যশোর' গৃহীত হয়েছে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।[৮]

## মির্জানগরে মোগল আধিপত্য বিস্তার

বাংলার স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ খান কররানীর রাজত্ব কালে (১৫৭২-১৫৭৬) শ্রীহরি নামক ব্যক্তির উপর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল ও রাজা মানসিংহসহ সম্রাট আকবর দাউদ খান কররানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে দাউদ ভীত হয়ে পলায়ন করে। তারপর সম্রাট আকবর মুনীম খানকে দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিজে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। মুনীম খান পলায়নরত দাউদ খানকে উড়িষ্যার তুকরাই নামক স্থানে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ পরাজিত করে।[৯] এ সময়ে দাউদ খানের বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্রীহরি রাজকোষের সমস্ত অর্থ-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে আসেন সুন্দরবন অঞ্চলে। সেখানে তিনি দুর্গ, রাজবাড়ি, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রচার করেন। এ সময়ে তিনি শ্রীহরি নাম পরিবর্তন করে নিজের নাম রাখেন বিক্রমাদিত্য।[১০] বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিমত দিয়েছেন, আনুমানিক ১৫৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাবা শ্রীহরি ছিলেন গৌড়ের রাজা দাউদ খানের বিশ্বস্ত মন্ত্রী। বিশ্বস্ততার জন্য দাউদ খান ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাকে যশোর এলাকার জমিদারি দান করেন এবং তাকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি দেন।[১১] দাউদ

---

[৫] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ. ৬০৬।

[৬] সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৮।

[৭] রেহমান শামস, "ঐতিহাসিক মির্জানগর" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, তারিখ : ১৩ই জুলাই, ১৯৯৭।

[৮] মির্জা নাথান, পৃ. ২৯৪। বিস্তারিত জানতে, এ.এফ.এম আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২), পৃ. ৪১৬-৪১৭।

[৯] হাসান আলী চৌধুরী, পৃ. ৩২৪।

[১০] আ. কা. মো. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি*, ২য় খণ্ড, মুসলিম যুগ (ঢাকাঃ শিশু একাডেমী , ১৯৮৭), পৃ. ৬০।

[১১] রেহমান শামস, পৃ. ৪১৬-৪১৭।

খানের মৃত্যুর পরে বিক্রমাদিত্য সম্রাট আকবরের কাছ থেকে জমিদার হিসেবে সনদ লাভ করেন ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর রাজ্যের রাজা হন প্রতাপাদিত্য। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপাদিত্য মোগলদের বশ্যতা অস্বীকার করে যশোর রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তার বিদ্রোহ দমন করার জন্য দিল্লী থেকে যশোরে রাজা মানসিংহকে পাঠানো হয়। এ সময়ে বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁ, সেনাপতি এনায়েত খাঁ এবং মির্জা নাথানকেও বিরাট বাহিনীসহ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৬১০-১৬১১ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হয় এবং মোগল বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। Sir James Westland তাঁর *Report on Jessor*-এ উল্লেখ করেন, "তাঁকে লৌহ পিঞ্জরে বন্দি করে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। বন্দি, পথে বেনারসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।" কিন্তু মির্জা নাথান এই তথ্যের সত্যতা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আকবরের মৃত্যুর পরেও প্রতাপাদিত্য জীবিত ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাহী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 'বাহারীস্তান-ই-গায়বী' প্রথম খণ্ড, ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় এম, আই, বোরাও প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর এই ঘটনাকে অস্বীকার করেন। যাই হোক, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যশোর অঞ্চল পুনরায় মোগল কর্তৃত্বে ফিরে আসে। এ সময় বাদশা জাহাঙ্গীর, এনায়েত খাঁকে যশোরের ফৌজদার করে পাঠান। এনায়েত খাঁ ছিলেন যশোর অঞ্চলের প্রথম ফৌজদার । তিনি সাতক্ষীরা জেলার ৫০ মাইল দক্ষিণে সুন্দর বনের নিকটবর্তী 'ধুমঘাট' যেখানে এক সময়ে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল, সেখানে বসতি স্থাপন করেন।[১২] জায়গাটি সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ার কারণে এক সময় জলমগ্ন হলে তিনি ধুমঘাট ত্যাগ করে কালিগঞ্জে এসে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। তাঁর নামানুসারে পরবর্তীতে এখানে এনায়েতপুর গ্রামের নামকরণ করা হয়। প্রথম দিকে এনায়েত খাঁ দক্ষতার সাথে শাসন কাজ পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে বিলাসবহুল জীবনযাপনের সাথে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত মাদক গ্রহণের ফলে শেষ জীবনে তিনি অস্থিচর্মসার জীবন-মৃত একজন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। এনায়েত খাঁর মৃত্যুর পর ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে যশোরে ফৌজদার পদে আসেন সরফরাজ খাঁ। বিভিন্ন কারণে সরফরাজ খাঁ ইতিহাস খ্যাত। বাক-কুশলী সরফরাজ খাঁ নিজের বাক-চাতুর্যের দ্বারা সহজেই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভুলিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করতেন। তাঁর চাটুকারিতার জন্য পরবর্তীতে প্রবাদ বাক্যের উদ্ভব হয়েছে 'সরফররাজবাজী' যার অর্থ 'তোষামোদি'।[১৩]

সরফরাজ খাঁর পর সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার সময়ে (১৬৩৯-১৬৬০) মির্জা সাফসিকান ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে যশোরের ফৌজদারের দায়িত্ব পান। এ সময়ে বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে মগ, ফিরিঙ্গি ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার সেই সাথে বর্ষাকালে 'ধুমঘাট' অঞ্চল জলমগ্ন হলে তিনি ধুমঘাট ত্যাগ করে ত্রিমোহিনীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজধানী হিসেবে এ স্থানকে বেছে নেওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। ত্রিমোহিনী থেকে নৌপথে দিল্লীর সাথে প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে এই

---

[১২] K.G. M. Latiful Bari, (ed.), *Bangladesh District Gagetteers* (Dhaka: Bangladesh Governor Press, 1978), p. 383.

[১৩] মিজানুর রহমান, "সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় ঐতিহাসিক নিদর্শন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ. ২০৯।

স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জায়গার তুলনায় এই জায়গাটি ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু। সর্বোপরি নদী বিধৌত অঞ্চল বলে কৃষিতে উন্নত এবং স্বাস্থ্যকর।

## নগরী পত্তন

সাধারণত মুসলিম শাসকগণ নিজ নামে নগরী বা রাজধানী স্থাপন করতেন। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মির্জা সাফসিকান ত্রিমোহিনীতে বিশাল এলাকা জুড়ে 'মির্জানগর' গড়ে তোলেন। এখানে তিনি রাজপ্রাসাদ, তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য সেনা শিবির, দুর্গ, মসজিদ, হাম্মাম খানা, অস্ত্রাগার, আবাসিক বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি গড়ে তোলেন। *Final Report On the Survey and Settlement Operations in the District of Jessore* থেকে জানা যায় Messrs, Rennel, Martin, এবং Rechards ১৭৬৪-১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, সেই মানচিত্রে মির্জানগর এবং ত্রিমোহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ নগর এবং কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর Mr. James Westland-এর লেখায় মির্জানগরের বিবরণ রয়েছে।[১৪] ঐতিহাসিক সতীশ মিত্র তাঁর *যশোর খুলনার ইতিহাস* গ্রন্থে এই নগরী ভ্রমণ এবং এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮১৫ সালেও মির্জানগর ছিল যশোর জেলার তিনটি প্রধান শহরের মধ্যে একটি।[১৫] এসব বিবরণ থেকে সহজে অনুমেয়, মির্জানগর ছিল ঐতিহ্যবাহী জনপদ।

১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মির্জা সাফসিকানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দিন ফৌজদার পদে আসীন হন। অবশ্য সৈফুদ্দিনের ফৌজদারিত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। পরবর্তী ফৌজদার নুরুল্লা খাঁ বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে কয়েকটি গ্রাম এক করে নতুন পরগণা তৈরি করেন। নুরুল্লা খাঁর নামানুসারে এ পরগণার নামকরণ করা হয় 'নূরনগর'। নূরনগরে কিছুদিন বসবাস করে নুরুল্লা খাঁ মির্জানগরে ফিরে আসেন এবং বুড়িভদ্রা নদীর তীরে মির্জা সাফসিকানের প্রাসাদ থেকে দেড়-দুই কিলোমিটার দক্ষিণে নতুন প্রাসাদ এবং দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে এদেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হলেও ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত যশোরে ফৌজদার পদ ছিল এবং এ সময় আশরাফ খাঁ ফৌজদারের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ১৭৬৫ সালে দিল্লী সনদ বলে রাজস্ব আদায় হওয়ায় এই ফৌজদার পদটির বিলোপ ঘটে।[১৬]

যশোরের ফৌজদারদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক কাল শাসন করেন নূরুল্লা খাঁ। তাঁর সময়ে সবচেয়ে বেশি জৌলুসপূর্ণ ছিল মির্জানগর। মির্জানগরকে কেন্দ্র করে এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসার হয়েছিল। বর্তমান ত্রিমোহিনীর পূর্বে সাতবাড়িয়া গ্রাম থেকে পশ্চিমে কপোতাক্ষ পর্যন্ত দক্ষিণে জাহানপুর এবং ভালুকঘর, উত্তরে চাঁদড়া, কাঁঠালতলা (বর্তমান বরণডালি ও সরসকাটি) গ্রামও ছিল মির্জানগরের আওতায়। নূরুল্লা খাঁ আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র এবং ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। এ কারণেই তিনি এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে শেষ জীবনে বিলাসিতা এবং অর্থ লিপ্সার কারণে

---

[১৪] K.G.M Latiful Bari (ed*), Bangladesh District Gagetteers-Jessore* (Dhaka: Bangladesh Governor Press, 1979 ), পৃ. ৭০।

[১৫] আ. কা. মো. যাকারিয়া, পৃ. ১৬২-১৬৩।

[১৬] এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, পৃ. ৪৭০।

আওরঙ্গজেবের বিরাগ ভাজন হয়ে পদচ্যুত হন।[২২] নুরুল্লা খাঁ ফৌজদার থাকার সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি চল্লিশা উপলক্ষে বিশাল যশোর রাজ্যের হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে দাওয়াত করেন। সে দাওয়াত পত্র লেখা হয় সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত শ্লোকটি ছিল নিম্নরূপ:

খোদা পাদারবিন্দদ্বয় ভজনপরঃপশ্চিমাস্য পিতা মে
শ্রুত্বল্লাল্লোতি বাণীং মুরশিদ নিকটে মর্ত্ত্যদেহং জহৌ সঃ
খাসী-মুর্গি-রহিতা কদু-কচু-ভবিতা মৎপিতুশ্চালসে খানা
শ্রীসেখো নুরনামা গলধৃতবসনঃ শুদ্ধি সম্পাদনীয়া ।[২৩]

অনুবাদ: 'আল্লার বান্দা আমার পিতা মুরশিদের নিকটে আল্লার নাম শুনে পশ্চিমাস্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর চল্লিশে উপলক্ষে খাসি-মুরগি বর্জিত কিছু কদু-কচু সংবলিত আহার জোগাড় করে আমি নুরুল্লা শেখ গলায় কাপড় দিয়ে বিনীতভাবে আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ করছি। আপনারা উপস্থিত হয়ে পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করলে কৃতার্থ হবো।' এ ঘটনা নুরুল্লা খাঁর সুপ্রশাসন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির স্বাক্ষর বহন করে।

ইংরেজ আমলে মির্জা পরিবারের অর্থ কষ্ট শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে জাঁকজমক ও জৌলুস কমে আসে। অবশ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এই পরিবারকে সামান্য কিছু মাসিক ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

### পরিত্যক্ত নগরীর বিলুপ্ত প্রায় নিদর্শন

নূরুল্লা খাঁর পরবর্তী বংশধর হেদায়েত উল্ল্যা চরম দুর্দশায় ভুগে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। উত্তরাধিকারীর অভাবে এ নগরী পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে। ইংরেজ শাসকগণ এর সংরক্ষণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে চব্বিশ বছর পাক শাসনামলেও এর ঐতিহ্য রক্ষায় কোনো নজরই দেওয়া হয়নি। ফলে অযত্নে, অবহেলায়, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং স্থানীয় মানুষের অসচেতনতার কারণে ক্রমেই বিলুপ্ত হতে থাকে এই নগরীর ঐতিহাসিক কীর্তি। প্রাকৃতিক নিয়মে ভেঙে পড়ে, ধসে যায় আর স্থানীয় মানুষ ইট খুলে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগায়। ক্রমেই মির্জাদের শেষ চিহ্নসমূহ ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায়। দূর থেকে লোকজন ধ্বংসস্তূপ দেখিয়ে বলে 'মির্জাদের নবাব বাড়ি' আর চারপাশ দিয়ে মাটি এবং আগাছায় আবৃত হাম্মাম খানার গম্বুজগুলোর মাথা দেখে স্থানীয় লোক বলতো,'নবাববাড়ির হামা খানা'। যদিও গ্রামের অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের হাম্মাম খানা সম্পর্কে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। হাম্মান খানা আসলে বিলাসবহুল গোসলখানা। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ নদী কিংবা পুকুরে গোসল করেই অভ্যস্ত। রাজা-বাদশাহ্দের গোসল নিয়ে বিলাসিতার খবর তাদের না জানারই কথা। তাই তো মনে করতো জমিদারগণ এখানে লোকজনদের ধরে নিয়ে এসে মেরে ফেলতো। হাম্মাম খানার কুপকে এখনো এ এলাকার সাধারণ মানুষ 'মৃত্যু কুপ' মনে করে।

এ অবস্থায় ১৯৯২ সালে মির্জানগরের বরণডালি গ্রামের উৎসাহী এক যুবক, আব্দুস সামাদ স্থানীয় কিছু মানুষকে একত্রিত করে গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে হাম্মাম খানার জঙ্গল পরিষ্কার এবং

---

[২২] এ.এফ.এম.আব্দুল জলীল, পৃ. ৪৬৯।

[২৩] মিজানুর রহমান, পৃ. ২১১।

কিছুটা খনন কাজ করে এর অবকাঠামো দৃশ্যমান করে তোলে। এ সময় জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে মির্জাদের প্রচুর ধন সম্পদ লুকানো আছে এই হাম্মাম খানার অভ্যন্তরে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসতে থাকে এই নব আবিস্কৃত কীর্তিটি দেখার জন্য। অবশ্য আব্দুস সামাদ জানান, তাঁর নেতৃত্বে খননকাজ পরিচালনার সময় মোটা লোহার চেইন লাগানো ৭-৮ কেজি ওজনের একটি বড় তালা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে তালাটি হস্তান্তর করা হয় বলে জানা যায়। ঐ সময় *দৈনিক পূর্বাঞ্চল*, *দৈনিক জন্মভূমি*, *দৈনিক জনতা*, *দৈনিক সংবাদ*, *দৈনিক কাফেলা*, *দৈনিক সুন্দরবন* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি হয়। অবশেষে পত্র-পত্রিকায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আশে-পাশের কিছু জায়গাসহ পুরাকীর্তির এই নিদর্শনটি অধিগ্রহণ করে।

## প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খনন

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খননের ফলে দেখা যায় এটি একটি চার কক্ষ এবং তিন গম্বুজ বিশিষ্ট সমসাময়িক নির্মাণ কৌশলে নির্মিত একটি মোগল স্থাপনা।[১৯] গম্বুজ শীর্ষে লাগানো গোলাকার কাঁচের সাহায্যে অভ্যন্তরে আলোর ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার নিদর্শন ঈশ্বরীপুর হাম্মাম খানা এবং জাহাজ ঘাটা নৌ-দুর্গ হাম্মাম খানায়ও রয়েছে। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা আয়তাকার এই ভবনের সর্ব পশ্চিমের কক্ষটিতে ৯ ফুট ব্যাসের একটি সুগভীর কূপ বিদ্যমান। এটি ছিল পানি সংরক্ষণের জন্য নির্মিত কূপ (Water reservior)। এই পানির উৎস ছিল বুড়ি ভদ্রা নদী। নদী থেকে এই কূপে পানির সংযোগ ছিল। কপি কলের সাহায্যে পানি কূপে ওঠানো হতো।[২০] এবং পাইপ সংযোগের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী চৌবাচ্চা বা বাথটাবে পানি সরবরাহ করা হতো। বুড়ি ভদ্রা নদী গতি পরিবর্তন করে বর্তমানে হাম্মাম খানা থেকে প্রায় ৫/৬ কিলোমিটার পূর্বে প্রবাহিত।

পূর্ব দিক থেকে পরপর তিনটি কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ অষ্টভুজ আকৃতির । প্রতিটি কক্ষের উত্তর এবং দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে কুলঙ্গি (Niche) রয়েছে। প্রথম কক্ষটির আয়তন ১৮.৮´×১৭´। এখানে আছে একটি চৌবাচ্চা। দ্বিতীয় কক্ষটির আয়তন ১২.২´×১০´ । এখানেও আছে একটি চৌবাচ্চা । পরের কক্ষটির আয়তন ১৮.৮´×১৮´। পূর্বের কক্ষ থেকে এই কক্ষে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ব্যবস্থা আছে। এই কক্ষটি উত্তর দক্ষিণে বিভক্ত এবং দুপাশে দুটি চৌবাচ্চা রয়েছে। দুটি চৌবাচ্চার মাঝে এক জন মানুষের বুক সমান একটি অর্ধ-দেয়াল আছে। সম্ভবত দুজন মানুষ একসঙ্গে গোসলের জন্য এমন ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান কালের বাথটাব এবং সুইমিং পুলের মতোই তৎকালীন বিলাসী জমিদারগণ এ ধরনের হাম্মাম খানা নির্মাণ করতেন। ঢাকার লালবাগ দুর্গ অভ্যন্তরেও এ ধরনের হাম্মাম খানার নিদর্শন রয়েছে। উল্লেখ্য, পুরার্কীতির দিক থেকে যশোর একটি সমৃদ্ধ জেলা। সমগ্র যশোর জেলায় মোট যতগুলো পূরাকীর্তি রয়েছে তার অধিকাংশই কেশবপুরে অবস্থিত। যশোর জেলার যেসব পুরাকীর্তি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণ করছে সেগুলো হলোঃ ১.ভরত ভায়নার বৌদ্ধস্তূপ, কেশবপুর; ২. মির্জানগরের হাম্মাম খানা, কেশবপুর ৩. মাইকেল মধুসূদনের জমিদার বাড়ি,

---

[১৯] *Bangladesh District Gazetteers-Jessore,* p. 70.

[২০] রুকুন উদ্দৌলাহ্ , "মির্জানগর, নবাবদের নিখোঁজ বসতি", *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ মার্চ, ১৯৯৭।

কেশবপুর; ৪. মাইকেল মধুসূদনের প্রতিকৃতি, কেশবপুর; ৫. সেখপাড়া জামি মসজিদ, কেশবপুর; ৬. হাজী মুহম্মদ মহসিন-এর ইমাম বাড়ি, যশোর সদর; ৭. চাঁচড়া শিবমন্দির, যশোর সদর; ৮. দমদম পীরের ঢিবি, মনিরামপুর; এবং ৯. কায়েম খোলা জামি মসজিদ, মনিরামপুর ।

মির্জানগরের এই হাম্মাম খানাটির সাথে ঈশ্বরীপুর হাম্মাম খানা এবং জাহাজঘাটা নৌদূর্গের হাম্মাম খানার নির্মাণ কৌশলের হুবহু মিল রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের ভাষ্য অনুসারে একদা এই হাম্মাম খানার পাশে একটি হেরেম খানাও ছিল এবং মির্জা সাফসিকান এখানে নর্তকীদের নিয়ে রাত্রিযাপন করতেন।

মির্জানগরের এই হাম্মাম খানাটি একটি দ্বিতল ভবন। বর্তমানে এর নিচ তলাটি ১০/১২ ফুট মাটির নীচে দেবে গেছে।[২১] ১৯৯৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যখন খননকাজ শুরু করে তখন যে ১৬ জন শ্রমিক এ কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মির্জানগরের অধিবাসী শেখ আব্দুল লতিফ। সম্প্রতি এ অঞ্চল সফরের সময়ে তিনি হাম্মাম খানার নিচ তলায় যাওয়ার যে সিঁড়ির দরজা দুটি আবিষ্কার হয়েছিল তা দেখান। দরজা দুটি বর্তমানে মাটির এক-দেড় ফুট উপর পর্যন্ত দৃশ্যমান থাকায় আপাত দৃষ্টিতে জানালা বলে মনে হয়।[২৪] প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই দরজা দুটির মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। বরাদ্দ স্বল্পতা এবং স্থাপনার মূল কাঠামোটি ধসে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভবনের নিচ তলা পর্যন্ত খনন কাজ করেনি। এ ধরনের দ্বিতল ভবনের নিচ তলা মাটির তলায় দেবে যাওয়ার নিদর্শন ঈশ্বরীপুর হাম্মাম খানা, উত্তরবঙ্গের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার হযরত সৈয়দ শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ (রঃ)-এর 'ত্বহা খানা' প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।[২৩] প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হাম্মাম খানার দক্ষিণ দিকে দুটি ফলকে এই হাম্মাম খানার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। একটিতে হাম্মাম খানার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, অপরটিতে পুরাকীর্তি সংরক্ষণের আইন সংবলিত বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। আমাদের দেশে, এমন অজপাড়া গাঁয়ে ইট-সিমেন্টের তৈরি ফলক সর্বস্ব বিজ্ঞপ্তি পুরাকীর্তি সংরক্ষণে কতখানি কার্যকর তা সহজে অনুমেয়। এর মধ্য দিয়েই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দায়সারা গোছের কর্তব্য সম্পন্ন করেছে। তাইতো ১৯৯৭ সালেও যেখানে বিদ্যমান ছিল মির্জাদের আবাসগৃহের অনেক খানি আজ সেখানে ইটের তৈরি দেয়ালের একটি খণ্ডাংশ ছাড়া আর কিছুই টিকে নেই।[২৪] হাম্মাম খানার গা ঘেঁসে গড়ে উঠেছে বসতবাড়ি এবং মুদিখানার দোকান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বাউন্ডারি ওয়াল না হোক, নিদেন পক্ষে পিলারের সাহায্যে শক্ত তারকাঁটার বেড়া দিলেও হয়তো বা মোগল আমলের এই পুরাকীর্তিটি হরিলুটের হাত থেকে খানিকটা হলেও রক্ষা পেত।

---

[২১] রুকুন উদ্দৌলাহ্।

[২৪] রুকুন উদ্দৌলাহ্।

[২৩] মাওলানা মোহাম্মদ আমিররুল ইসলাম, *গৌড়বঙ্গের জ্যোতি হযরত সৈয়দ শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রঃ)* ( ঢাকা: ১৯৯৬),পৃ. ৬৭।

[২৪] রেহমান শামস্।

## মির্জানগরের অন্যান্য কীর্তি

মির্জানগরের অদূরে ছিল কিল্লাবাড়ি দূর্গ । এর উত্তর ও পশ্চিমদিকে বুড়িভদ্রা নদী যা পরিখার কাজ করতো । দক্ষিণ দিকে ছিল মতিঝিল নামক বিরাট পরিখা।[২৫] এই দুর্গটি ছিল অস্ত্রাগার । দুর্গের প্রবেশ দ্বারের কাছে বহুকাল ধরে তিনটি লৌহ নির্মিত কামান অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল।[২৬] এর মধ্য থেকে Mr. Beaufort নামক যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর ১৮৫৪ সালে দুটি কামান নিয়ে যান।[২৭] একটিকে আগুনে গলিয়ে যশোর কারাগারের কয়েদীদের জন্য ডান্ডাবেড়ি তৈরি করা হয় এবং অন্যটিকে রাস্তা সমান করার রোলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরবতীতে এই কামানটি Sir James Westland নামক ব্যক্তি মাত্র তিন রুপিতে ক্রয় করেছিলেন বলে জানা য়ায়। তৃতীয় কামানটি বর্তমানে যশোর বাসটার্মিনালের নিকটবর্তী "বিজয় স্তম্ভ পার্কে" রাখা হয়েছে।

হাম্মাম খানা থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে এলে, বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ, জীর্ণ এক ধ্বংসস্তূপের মাঝে মসজিদের একটি অবকাঠামো পরিলক্ষিত হয়। জানা যায় এটি মির্জাদের একটি মসজিদের শেষ চিহ্ন, যার গা ঘেঁসে চার পাশে গড়ে উঠেছে অনেক ঘর-বাড়ি। James Westland এই নগরীতে অবস্থিত একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট বাসগৃহ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তা যথার্থ নয়। প্রকৃত পক্ষে এটি ছিল তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ।[২৮] উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৫০´×১৪´ ফুট। দেয়ালের প্রশস্ততা ছিল ৪ ফুট। মেঝে থেকে গম্বুজের উচ্চতা ছিল ২২ ফুট।[২৯] পূর্ব দেয়ালে ৩ টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে পবেশ পথ ছিল।[৩০] *Bangladesh District Gazetteers-Jessore-*এর Place of Interest অধ্যায়ে এই নগরীতে একটি মোগল আমলের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩১] সুতরাং উল্লিখিত ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে একমত হয়ে এটিই যে উপর্যুক্ত বর্ণনাকৃত মসজিদের ধ্বংসস্তূপ তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। ত্রিমোহিনী থেকে এক-দেড় কিলোমিটার পূর্বে সাতবাড়িয়ায় মির্জাদের আমলের আবাসিক বিদ্যানিকেতনের এক ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান। বর্তমানে এখানে গড়ে উঠেছে একটি মাদ্রাসা। মির্জাদের বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল ১ ইঞ্চি পুরু, ৮ ইঞ্চি এবং ১০ ইঞ্চি বর্গাকৃতির এক ধরনের ইট দিয়ে। এ অঞ্চলের কয়েক বর্গমাইলজুড়ে এখনো এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এই ইট, যা দেখে অনুমান করা যায় যে, এককালে এখানে মির্জাদের কোনো না কোনো ভবন ছিল।

---

[২৫] *District Gazetteers-Jessore*, p . 315.

[২৬] আসাদুজ্জামান আসাদ, (সম্পাদিত), *যশোর জেলার প্রত্নতত্ত্ব* ( ঢাকা: ১৯৮৯), পৃ. ২৩০।

[২৭] *District Gazetteers-Jessore*, p. 71.

[২৮] আসাদুজ্জামান আসাদ, পৃ. ২৩০।

[২৯] আসাদুজ্জামান আসাদ, পৃ. ২৩০।

[৩০] আসাদুজ্জামান আসাদ, পৃ. ২৩০।

[৩১] *District Gezetteers- Jessore,* p. 315.

## উপসংহার

বর্তমান খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা এক সময়ে যশোর জেলার সাবডিভিশন ছিল। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তির দিক থেকে জেলাটি এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। কেশবপুর উপজেলাকে এ জেলার পুরাকীর্তির ভাণ্ডার বললে অত্যুক্তি হবে না। সাম্প্রতিক সফরের সময় মির্জানগরের হাম্মাম খানাসংলগ্ন বর্তমান অধিবাসীদের নিকট ঐতিহাসিক এসব কীর্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে আবেদন রাখা হলে জনৈক গ্রামবাসী অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে জানান এসব জমিদারগণ দীর্ঘকালব্যাপী তাদের শোষণ করে, অত্যাচার করে, খাজনা আদায় করে, লোকালয় থেকে বহু দূরে গড়ে তুলেছে বিলাসবহুল হেরেম খানা এবং হাম্মাম খানা। আর ফুর্তি করেছে এলাকার মেয়েদের নিয়ে। অতএব জমিদারদের রেখে যাওয়া এসব ভাঙা ইটের স্তূপ রক্ষার জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। মূলত জমিদার এবং রাজা-বাদশাহ্দের প্রতি সাধারণ মানুষের অনুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এমনই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অব্যবহার এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের এই অনুভূতিই বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো দ্রুত হারিয়ে যেতে সাহায্য করছে। তাই শুধু সরকার নয়, শুধু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নয়, এসব পুরাকীর্তি তথা দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রত্নসম্পদ এবং পুরাকীর্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে।

**ISSN 1561-798X**
**আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫**

# নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : পূর্ববাংলার জীবন ও প্রতিবেশ

শেখ রজিকুল ইসলাম*

**Abstract:** A number of renowned literateurs of Bengali literature lived in some regions of East Bengal although they spent their later life in Kolkata. This life, by born simple but full of memories was ingrained in multidimensional aspects, inner agonies and optimistic attitude. Narendranath Mitra is one of them who was born, grew up and spent his boyhood days in the remote village of Faridpur of East Bengal. Though for livelihood and due to the division of India he started living permanently in Kolkata, the best inspiration for literary career was his first love ever memorable East Bengal. Consequently, a vast portion of his short stories and novels portrays his love of and affection for his motherland and memories of East Bengal. The present study is an attempt at exploring the love and memories of East Bengal in the short stories of Narendranath Mitra.

## ভূমিকা

সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানসের সংঘাত ও স্থিতি, তার বহুভুজ বিস্তৃতি-বিভঙ্গতা-বিপর্যয় এবং অন্তর্গূঢ় বেদনা, উজ্জ্বল আশাবাদ প্রভৃতি বিচিত্র প্রবণতা ও প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকারে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) ছোটগল্প সমরোত্তর 'পোড়ো জমিতে' 'ফাঁপা মানুষের' বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে শান্ত নির্লিপ্ত লিরিক সুরের তীক্ষ্ণ স্বাক্ষর। স্বকালের রাজনীতি-ধর্মনীতির দ্বন্দ্ব-দেশভাগ, আর্থিক সমস্যা ও সঙ্কট, আদর্শ ও বাস্তবের অন্তর্বিরোধ-সংশয় ইত্যাদি বিচিত্র অভিজ্ঞানের বিপ্রয়োগ সমাহার সত্ত্বেও জীবন সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাস এবং অখণ্ড-অপরাজেয় মানবতার নিগূঢ় উপলব্ধি তাঁর গল্পকে করেছে দীপ্র, শুদ্ধতম এবং অনিঃশেষ ঋদ্ধিমান। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমবেদনার সঙ্গে নির্লিপ্তি, খুঁটিনাটি দেখার চোখ, অলঙ্কার ও বাহুল্য বর্জিত চমৎকার ভাষা, মানুষের সঙ্গে মানুষের বহুকৌণিক সম্পর্ক তুলে ধরার ক্ষমতা – এ সমস্তই তাঁকে সেরা গল্পকারদের অন্যতম করেছে।[১] মানবতাবোধের সারৎসার এবং সহজাত হৃদয়ধর্মের ব্যঞ্জনা দিয়ে

---

* ড. শেখ রজিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[১] শিবনারায়ণ রায়, "নরেন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর কয়েকটি গল্প", সমীর বসু (সম্পাদিত), *প্রসঙ্গ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র*'(কলকাতা : পদক্ষেপ, ২০০১), পৃ. ৩৩।

তাঁর গল্প পাঠককে অনায়াসে পৌঁছে দেয় সংবেদনার জ্যোতির্ময়লোকে।[2] স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাত্মবোধের উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই নিজেকে তিনি মুক্ত রাখতে পেরেছেন কালিক ভাব-উন্মাদনা, যৌনবিলাস, বিপ্লববাসনা এবং নৈরাশ্য-নৈঃসঙ্গ্যের অবক্ষয় আবর্ত থেকে। ফলে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংক্ষুব্ধকালের লেখক হয়েও তাঁর গল্প সহজেই হয়ে উঠেছে জ্যোতির্ময় চেতনালোকের শব্দসরণি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে পৃথিবীব্যাপী প্রচণ্ড ভাঙ্গা-গড়ার জটিল ও প্রত্যাসন্ন বিপর্যয়সম্ভব প্রতিবেশে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দীপ্র আর্বিভাব বাংলা সাহিত্যে। বাঙালির সামাজিক জীবনে তখন এক উদ্ভ্রান্ত পালাবদলের ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে রক্তাক্ত স্বাধীনতা ও দ্বিখণ্ডিত স্বদেশভূমি বাঙালির সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে দেখা দিয়েছে নানা বিহ্বলতা, সংশয়, অসঙ্গতি ও রিক্ত-আশ। সুপ্রচলিত বিধি-নিয়ম ভেঙে মানবিক মূল্য ও নীতিবোধ, পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্ভ্রম, সুকুমার প্রেম-ভালবাসা কিংবা ধর্মবোধের প্রত্যয় ও প্রমূল্য কোথাও শিথিল, কোথাও বা ধ্বংস হয়ে তৈরি হয়েছে নতুন সংস্কারের ধারা। বিশেষত জাতীয় জীবনের নানা বিপর্যয় ও সংক্ষোভের ফলে যুবচিত্তে দেখা দিয়েছে অবক্ষয়, অবিশ্বাস, অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতার ক্ষয়রোগ। আলোচ্য কালখণ্ডে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে আরো সহযাত্রী হয়েছেন সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), বিমল কর (জ. ১৯২১), রমাপদ চৌধুরী (জ. ১৯২২), গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), মহাশ্বেতা দেবী (জ. ১৯২৬) প্রমুখ গল্পকার, যাঁরা কল্লোল পরবর্তী সাহিত্যস্রোতকে পরিবর্তিত বাস্তব ও নতুন চিন্তাধারায় উজ্জ্বল করেছেন। নতুনতর জীবনচেতনা-বাস্তবতাবোধ, ক্ষয়-অবক্ষয়-অনিশ্চয়তার শিল্পব্যঞ্জনা উন্মোচনই হয়ে উঠেছে তাঁদের অন্বিষ্ট :

> শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিক যুগের অবসান, কল্লোলীয় বোহেমীয় পালার অবসান, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি মুগ্ধতার অবসান—এই পটভূমিতে এলেন তরুণ গল্পলেখকবৃন্দ। রক্ত আর শবদেহ মাড়িয়ে, মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জনের সাক্ষী থেকে আর্থিক বিপর্যয়ে ও দেশবিভাগের ধাক্কায় শেকলছেড়া নোঙরহীন নৌকার মতো তাঁরা জগৎ ও জীবনে, ব্যক্তি ও সমাজকে নোতুন চোখে দেখেছেন।[3]

স্বাধীনতা আন্দোলন, রক্তাক্ত স্বদেশভূমি, রাজনৈতিক অস্থিরতা-স্থবিরতা, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা ও সামাজিক বিপর্যয়সম্ভূত বিচ্ছিন্নতা-হতাশা-ব্যর্থতা-বিপন্নতা-নেতির আগ্নেয় উদ্ভাসে সকলেই আক্রান্ত হলেও নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণ স্থিতধী। বাইরের প্রলয়, যুগধর্মের বৈনাশিকতা, ক্ষয়রোগ কোনদিনই তাকে করেনি অস্থির-সন্দিগ্ধ। তাঁর চেতনা-উদ্বুদ্ধ লেখনী তাই কোন তাত্ত্বিক

---

[2] নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যুর ঠিক পরেই তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রণবেশ সেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, 'সমাজে শঠতা আছে ক্রুরতা আছে -তা আমি জানি, হিংসা-বিদ্বেষেরও অভাব নেই। মানুষের স্খলন-পতন ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু তা আমাদের গর্বের বস্তু নয়। যেখানে আনন্দ মহৎ শক্তিমান-সেখানেই আমাদের যথার্থ পরিমাপ'। উদ্ধৃত,অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, *নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য'* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি লিঃ, ১৯৯৪), পৃ. ৩৭।

[3] অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা* (কলকাতা : ডি. এস. লাইব্রেরী, ১৯৮২), পৃ. ৪৮১।

প্রেক্ষাপটে নয়, কোন দর্শনশাসিত শুদ্ধচারী পথে নয় বরং সহানুভূতি-সিক্ত আত্মিক দৃষ্টিকোণে, শাশ্বত শান্ত ও সংযমের নরম আলোয় নির্মাণ করেছে জীবন উপলব্ধির গভীর ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা।[৪] তিনি প্রথম থেকেই তাঁর প্রিয় মধ্যবিত্তের পটভূমি এবং চেনা মানুষগুলিকে টেনে নিয়েছেন আপন মমতায় এবং অর্জন করেছেন ঈর্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের জয়মাল্য।

## পূর্ববাংলা : অনুভূমিক আলেখ্য ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সমাজ বিকাশের ধারায় ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার অবস্থান সবসময়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ১৭৬৫ সালের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, ভূমিব্যবস্থা, শিক্ষা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, শিক্ষানীতি প্রবর্তন কলকাতা, মাদ্রাজ, মুম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি বড় নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও কলকাতাই প্রেসিডেন্সি ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও নগর হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।[৪ক] অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ কূল ঘেষে অবস্থিত নদীমাতৃক পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শহরকে বাদ দিলে বিশাল গ্রাম সমুদ্র নিয়ে গড়ে উঠেছে যে ভূখণ্ড তার সমাজমানস প্রধানত গ্রামীণ এবং অর্থনৈতিক চরিত্রে কৃষিপ্রধান। আকুল আর উদাস করা নিসর্গ, ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি, লৌকিক সংস্কৃতি, প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের উৎপাদন পদ্ধতি এবং তারই পাশাপাশি প্রবহমান সময়ের নানা পরিবর্তনশীলতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—সবমিলে বৃহত্তর জনজীবনের স্পন্দিত উপস্থিতি আবহমানকাল ধরেই গ্রামকেন্দ্রিক। ফলে পূর্ববাংলার বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী শিক্ষা ও কর্মসূত্রে এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেশভাগের কারণে কলকাতা অভিমুখী অভিবাসী হলেও তাদের জন্ম, বাল্য ও কৈশোরের স্বপ্নময় দিনের স্মৃতি পূর্ববাংলার কোন না কোন গ্রামে। তাঁদের মানসক্ষেত্র তাই বারবার ফিরে গেছে পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে—দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়েছে চিরাচরিত গ্রামীণ জীবন, সমাজ ও প্রতিবেশ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন নদীমাতৃক পূর্ববাংলার পললসমৃদ্ধ শ্যামল প্রান্তর ফরিদপুর জেলার এক প্রান্তিক পল্লী ছায়াঢাকা-ছায়াঘেরা, শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনের লীলাভূমি সদরদি গ্রামে। শিশুকাল, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের দুরন্তময় বেড়ে ওঠার সময়টা কেটেছে এই গ্রামে। গ্রাম থেকে দুমাইল দূরে থানা শহর ভাঙ্গায় হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে। এরপর কয়েকটি চাকুরি বদল করার পর ১৯৫২ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সাব-এডিটরের স্থায়ী চাকুরি গ্রহণ করেন।[৫]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানসগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা কেটেছে পূর্ববাংলার ফরিদপুরের সদরদি গ্রামেই। গ্রামের নিরুপদ্রব পরিবেশ, পূর্বদিকের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছের সারি, সুপারি বন, আম কাঁঠালের বাগান, পশ্চিমে কুমার নদী, খাল-বিল-ডোবা, থৈ থৈ সীমা হারানো বর্ষার জল তাকে আকর্ষণ করেছে নিরন্তর। এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান গভীর সম্প্রীতির

---

[৪] প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, "নরেন্দ্রনাথ মিত্র : মমতা সমৃদ্ধ জীবনরস বোধে ঋদ্ধ", অরুণ সান্যাল (সম্পা.), *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৬৫৬।

8 K B.B. Misra, *The Indian Middle Classes* (Bombay: 1961). পৃ. ৭৫।

[৫] অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, *নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৭।

সঙ্গে বসবাস করেছে —নানা শ্রেণী, নানা পেশার মানুষ তাঁর মনে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে :

> চাষী মুসলমান যেমন ছিল তেমনি ছিল ধোপা-নাপিত, কামার কুমার ব্যবসায়ী সাহা সম্প্রদায়, জেলে জোলা আরো বহু রকমের বৃত্তিজীবী। এদের প্রতিটি ব্যক্তি, কি প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যে আমার যোগাযোগ ছিল তা নয়। কিন্তু এই পটভূমি কখনো জ্ঞাতসারে কি কখনো অজ্ঞাতে আমার চিত্তভূমিকে এক বিশেষ ধরণের রূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৬]

পূর্ববাংলার এই সব সম্প্রদায়, পরিবেশ এবং বিভিন্ন ধাঁচের চরিত্ররাজি নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসের একটা বড় অংশ—সংস্থাপিত হয়েছে আপন চেনামহল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশভাগের জন্য তিনি জন্মভূমি ছেড়ে কলকাতায় একেবারে স্থায়ী হলেও স্মৃতি তখনও শৈশব অতিক্রান্ত অতীতের নানা সুখ-দুঃখে ভরপুর। শহুরে মধ্যবিত্ত ভাড়াটে জীবনযাত্রার স্পর্শে নতুন অভিজ্ঞতা ও পরিবেশে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও তিনি গ্রামজীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে বহন করেছেন সর্বক্ষেত্রে। আজীবন মন্থন করেছেন পূর্ববাংলার শান্ত-নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবন। গ্রামের ভদ্র ও ভদ্রেতর সম্প্রদায়, চাষাবাস, হিন্দু-মুসলমানের নানা পালা-পার্বণ; তাদের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ নিয়ে তাদের অন্তরঙ্গ জীবনকে নিয়ে তিনি অসংখ্য সাদা-কাগজের নেগেটিভে ফুটিয়ে তুলেছেন নানা কাহিনী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মুখ্যত নাগরিক মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের দরদি শিল্পী হলেও কঠিন আর কোমলের অসম্ভবপর সহাবস্থানে ঋদ্ধ তাঁর শিল্পাত্মা। একদিকে তাঁর হৃদয়ের আর্দ্রতা, আর একদিকে জীবনের রুক্ষতা মিলে তিনি চেনা জগৎ ও চেনা ভালবাসার চিরন্তন লেখক—আশ্চর্যরূপে ঘরোয়া জীবনের প্রতি আকর্ষণ, সকলের প্রতি টান, গ্রাম-গঞ্জ-নগর-বন্দর-মানব সংসারের সর্বক্ষেত্রের তিনি রূপকার। বিশেষত পূর্ববাংলার পল্লীর অন্তরঙ্গরূপ, একান্ত চেনাজানা জগৎ, অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া জীবন, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, মানসিকতাই তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাসের প্রেরণা হয়ে উঠেছে। যে সমাজে তিনি বড় হয়েছেন সেই সমাজের অনুপুঙ্খ চিত্র বিধৃত হয়েছে তাঁর প্রথম প্রকাশিত দুই গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' ও 'হলদেবাড়ি'সহ অন্যান্য গ্রন্থের বেশ কিছু গল্পে এবং 'দ্বীপপুঞ্জ' (১৩৪৯) এবং 'সুখ দুঃখের ঢেউ' (১৩৬৫) প্রভৃতি উপন্যাসে।

## নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প ও পূর্ববাংলা

শিল্পী মাত্রেই তাঁর আপন পরিবেশের পূর্ণ নির্যাস গ্রহণ করে তার মধু-ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন পূর্ববাংলার গ্রামীণ পরিবেশে। তাই গ্রাম বাংলার অন্তরঙ্গ রূপ তাঁর গল্পে বারবার ফিরে এসেছে। বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্কর ঠিক যে অর্থে পরিবেশ-সচেতন লেখক, নরেন্দ্রনাথ বরং তার চেয়ে বেশি পরিবেশ অনুধ্যায়ী লেখক। বিভূতিভূষণের লেখায় নিশ্চিন্দিপুর ও তার প্রকৃতিচিত্র একটা স্থায়ী আসন দখল করে আছে—কিছুতেই তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তারাশঙ্করও তেমনি বীরভূমের পটভূমিতে যতটা জীবন্ত, অন্যকোনো পরিবেশে ততটা নয়। নরেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আশ্চর্য পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে,

---

[৬] নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "আত্মকথা" *গল্পমালা* - ২ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশিং লি., ১৯৯১), পৃ. ৭।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পরিবেশ-চিত্রণে ঘটেছে পালাবদল—প্রথমে গ্রামীণ পরিবেশ, পরে নগর পরিবেশ।[৭] পূর্ববাংলার গ্রামীণ পরিবেশের জন্য তাঁর মনের গভীরে একটা সুপ্ত বেদনাবোধ আজীবন জাগ্রত ছিল যা তাঁর বহু গল্পে বিধৃত হয়েছে। তিনি জন্মের বিশ বছর পর আমৃত্যু কলকাতাবাসী হলেও তাঁর জন্মভূমির উজ্জ্বল স্মৃতি সবসময় ধারণ করেছেন গভীর মমতায় :

> আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি পল্লীগ্রামে। তার পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদী কুমার। এই নামটি আমার কানে বড় মধুর লাগে। শব্দটির ধ্বনির জন্যে। নামের মত এর রূপটিও স্নিগ্ধ-শান্ত। বর্ষায় এই নদী প্রতি বছরই প্লাবিত হত। খাল বিল ভরে যেত। কিন্তু দু-একবার বন্যার বছর ছাড়া গৃহস্থের ওঠানে কখনো জল উঠতো না। তেমনি সারা বছরই নদীতে জল থাকত। চৈত্র কি বৈশাখ মাসে এ জল কোমরের নিচে নামত না। পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেষে চাষী গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেই শস্যক্ষেত। ধান পাটের সুবজ সমুদ্র। বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়র।[৮]

লেখকের আত্মকথনে বর্ণিত জন্মস্থান চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও শৈশবের স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন। বিভাগপূর্ব পূর্ববাংলার পল্লীর মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং অন্ত্যজ প্রান্তিক (কৃষাণ, কামলা, ছুতার, গাছি, জেলে, মাঝি, ফকির) শ্রেণীর জীবন এবং উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সমাজ গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বেশ কিছু গল্পের বিষয়বস্তু ও পটভূমি। "রস" (১৩৫৪), "পালঙ্ক" (১৩৫৯), "সোহাগিনী" (১৩৬৪), "ভুবন ডাক্তার" (১৩৫৮), "বন্যা" (১৩৬২), "পুনশ্চ" (১৩৫২) প্রভৃতি গল্পেলেখক তাঁর নিবিড় অভিজ্ঞতা, কল্পনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি গভীর স্মৃতিময়তা, মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন ও প্রতিবেশকে ফ্রেমবদ্ধ করেছেন।[৯] বিশেষত পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের একটা বড় স্থান দিয়েছেন তার গল্পে। যা তাঁর আগের হিন্দু লেখকদের পক্ষে সম্ভবত অজ্ঞতা বা অবহেলা হেতু সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি অনায়াসে মুসলমান সমাজের 'আজলফ' (নিচু শ্রেণীর মুসলমান) এবং গরিব মুসলমানদের বেছে নিয়েছেন। পূর্ববাংলার একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন পেশার এই মুসলিম নারী-পুরুষদের এমন যত্নে পুঙ্খানুপুঙ্খ ফুটিয়ে তুলেছেন যা হিন্দু লেখকদের মধ্যে বিরল।[১০]

---

[৭] অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, *নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৫-১৬।

[৮] নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "আত্মকথা", *গল্পমালা* - ২, পৃ. ৭।

[৯] গল্পগুলিকে প্রকাশসালের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়নি—শিল্পমানের ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

[১০] শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে গহর, "মহেশ" গল্পে গফুর মিঞা মুসলমান চরিত্র হলেও এখানে মুসলিম সমাজের বিশেষ দিকগুলো পাওয়া যায় না। প্রবোধ সান্যালের 'হাসু বানু' উপন্যাসে মুসলমান সমাজ কিছুটা প্রাধান্য পেলেও কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু দেশভাগ, হতাশা, হাহাকার ও ছিন্নমূল হওয়ার সমস্যা। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের গল্পে অবশ্য মুসলমান কৃষক, রাজমিস্ত্রি, সর্প ব্যবসায়ী, মাঝি ইত্যাদি চরিত্র জীবন্ত। যদিও মুসলমান সমাজের বাস্তবচিত্র সেখানে কম। হিন্দু সমাজের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মুসলমান সমাজের যে পার্থক্য তাতে নরেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তাঁর জানাটা এতই বাস্তবসম্মত ছিল যে কখনোই মনে হয় না যে, এ জীবন তাঁর অপরের কাছে শোনা। এদের জীবনযাত্রা তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, *নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৭।

## ১

"রস" গল্পটিতে মুসলমান সমাজ-জীবনের নিবিড় আধারে পূর্ববাংলার গ্রামীণ সমাজজীবনচিত্র ও প্রতিবেশ-পরিকল্পনা মূল পটভূমি হিসেবে গৃহীত। গল্পের কাহিনী অংশটি বড় নয়। কিন্তু যেটুকু আছে তার মধ্যে একটি পেশাগত সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, প্রেম-ভাবনার দ্বন্দ্ব ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন নিয়ে প্লটের অনুপম ঘন রূপটি গড়ে উঠেছে। রস অর্থে সুধা এবং গরল। দুই বৈপরীত্যকে ধরে আছে ছোট্ট রস শব্দটি। রস কখনও উত্তেজক, কখনও তৃষ্ণানিবারক স্নিগ্ধতার দ্যোতক। কখনও সে মেটায় ক্ষুধা, কখনও আচ্ছন্ন করে নেশায়।[১১] কাহিনীর মধ্যে ঘটনা আছে, গল্পের বাঁধুনি আছে, তা আকারে ঈষৎ দীর্ঘ হলেও অতিরিক্ত মনে হয়নি। গল্পকারের চেনা জানার গণ্ডির মধ্যেই গল্পের উপাদান গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তাকে তিনি হৃদয়রসে জারিত করে নব রূপ দিয়েছেন।[১২] এই গল্পের উৎস বা নেপথ্য সম্পর্কে লেখকের অভিমত প্রণিধাণযোগ্য :

> এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূর্বদিকে ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুর গাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কিষাণ সেইসব খেজুর গাছের মাথা চেঁছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখত। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে করে, বড় বড় মাটির হাড়িতে করে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করতেন আমাদের মা-জ্যেঠিমারা।[১৩]

গল্পের কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে মোতালেফ, মাজু খাতুন আর ফুলবানু—তিনজনের মধ্যে টানাপোড়েন, আসক্তি ও ভালবাসা, রূপাসক্তি ও জীবিকার দ্বন্দ্ব। নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য-কৈশোরের চেনা-জানা পরিবেশ থেকে আহৃত পটভূমি থেকে গল্পটি লিখেছেন। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে তাঁর জন্মস্থান সদরদিসহ বৃহত্তর ফরিদপুর-যশোর অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র সারি সারি খেজুর গাছের প্রাচুর্য ছিল। এখনো কিছু কিছু অঞ্চলে তার অবশেষ চোখে পড়ে। এই অঞ্চল জুড়ে খেজুর গাছের বিস্তৃতি এবং তা থেকে উৎপন্ন লোভনীয় স্বাদের গুড়ের পাটালি অখণ্ড বঙ্গে রসনা বিলাসীদের অতি প্রিয় ছিল। বিশেষত ফরিদপুরের খেজুরের গুড়ের সুখ্যাতি এমনই ছিল যে বাংলা গানে-কবিতায় তা স্থান করে নিয়েছে।[14] আলোচ্য গল্পে শীতকালে গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি-পরিবেশ, মানুষের

---

[১১] সুনীল কুমার নন্দী, "নানা বিভঙ্গে রস", সমীর বসু (সম্পা.) *প্রসঙ্গ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র*, পৃ. ৩৫।

[১২] গল্পের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজেই মন্তব্য করেছেন, ' লেখকের গল্পগুলির উৎস নিয়ে হয়তো আপনাদের কারো কারো মনে কৌতূহল আছে। আমার নিজের তেমন খুব একটা কৌতূহল নেই। গল্পের নেপথ্যে যে গল্প থাকে তা না শোনাই ভালো, না শোনাই ভাল। আমার মনে হয় তাতে আসল গল্পের রসহানি ঘটে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখি। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার আনাগোনা কখনো রাজপথে কখনো সুড়ঙ্গপথে। কখনো সেই পঙ্করেখা চোখে দেখা যায়, কখনো বা তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গোচরতাই লেখকের নিজের পক্ষে বিস্ময়কর। এতেই তার সৃষ্টির আনন্দ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "গল্পলেখার গল্প", *গল্পমালা* - ১, পৃ. ৯-১০।

[১৩] তদেব, পৃ. ১০।

[14] দুই বাংলার জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী মান্নাদের একটি বিখ্যাত গানে ফরিদপুরের খেজুরের গুড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। গানটি হলো—'সেই ঢাকা মেল নেইতো আর, নেই পদ্মার ইস্টিমার ...' গানটির গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং সুরকার নীতা সেন। এছাড়া রস গল্পের কাহিনী নিয়ে পরবর্তী-কালে

জীবনযাপন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে। বিশেষত খেজুরগাছ কেন্দ্রিক পেশাজীবী 'গাছি' সম্প্রদায়ের জীবনযাপন, সুখ-দুঃখ-সমস্যা, তাদের মনোগত গূঢ়াচার-প্রবৃত্তি সমস্তই গল্পকারের অনুপুঙ্খ অনুভবে-বর্ণনায়, নিবিড় মানবিক মমতায় এবং নির্মোহ শৈল্পিক দৃষ্টিকোণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কয়েকটি বিদ্যুৎ-চমক বক্তব্য :

> ১. অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মায়ের দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হয়।[১৫]
>
> ২. রসের হাড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে। তবু যেন মন ভরেনা, কেমন যেন খালি খালি মনে হয় দুনিয়া।[১৬]

পূর্ববাংলায় বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কৃষক এবং নানা পেশাজীবী সম্প্রদায়ের আধিক্য লক্ষণীয়। নরেন্দ্রনাথের বাল্যে ও কৈশোরে কাছ থেকে দেখা এই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি তাঁর "রস" গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। মুসলমান 'আজলফ' শ্রেণীর 'গাছি' সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনের অন্তরঙ্গ রূপটি উপস্থাপনে তাঁর দরদি চিত্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্মের বিবাহ সংক্রান্ত বিধি বিধানের ক্ষেত্রে যে একটা পার্থক্য রয়েছে তা এই গল্পে বিদ্যমান। এই গল্পের কাঠামোটিই নির্মিত হয়েছে মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ এবং সহজে তালাক দেওয়ার রীতি নিয়ে মানুষের জৈব কামনা ও স্বার্থপরতার চিত্র-সংবলিত সমাজ-জীবন। বিশেষত মুসলমান সমাজের পুরুষের মত নারীরও যে বারবার বিয়ে করতে কোনো সামাজিক বাধা নেই, তা কেবল স্বীকৃত নয়, আপন ইচ্ছাধীনও অনেকটা। নারীর এ ধরনের স্বাধীন মনোভাব যেমন লক্ষণীয় তেমনি বিয়েতে কনের পিতাকে পণ দিতে হয় সামাজিক মান-মর্যাদা লক্ষ্য করে। এতে নারী বিপন্নতা বা উপেক্ষিতা থেকে যেমন রক্ষা পায় তেমনি নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে মুক্তি পায় বলে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যও অর্জন করতে সক্ষম হয়।

জীবন পরিবর্তনশীল, সেখানে কোনো কিছুর স্থায়িত্ব নেই। তাই সম্পর্কগুলোও ভেঙেচুরে বদলে যেতে থাকে। মোতালেফ, মাজু খাতুন এবং ফুলবানু—তিনজনেই একাধিকবার ঘর করেছে বিভিন্ন জনের সঙ্গে। এ যে এক বিরামহীন অন্বেষণ। কর্মঠ ও বাকপটু মোতালেফের জীবনে দুই নারী যেন দুই রসের আধার। ফুলবানু উচ্ছল—'যেন রসে টলমল করছে সর্বাঙ্গ'। অন্যদিকে মাজুর দ্বৈতরূপ যেন 'নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়'।[১৭] শেষ পর্যন্ত তার মনে খেজুর রসের লাভজনক আকর্ষণ ও নারীদেহ লাবণ্যের সব ভোলানো মোহের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তারই চরমোৎকর্ষ গল্পটির উপজীব্য। প্রেম ও প্রয়োজনের সংগ্রামে মোতালেফের মতো স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে প্রেম ক্ষণিক স্বপ্ন, বরং জীবিকার্জনই মুখ্য দাবি—এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।[১৮] গল্পকার সরলভাবে মোতালেফের মতো স্বার্থপর ও নীতিজ্ঞানহীন

---

বলিউডে নির্মিত হয় হিন্দিছবি 'সওদাগর'। অমিতাভ বচ্চন অভিনীত এই ছবিটি সেই সময়ে যথেষ্ট ব্যবসা সফল হয়েছিল।

[১৫] নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "রস", *গল্পমালা* ১, পৃ. ৬৭।

[১৬] তদেব, পৃ. ৭৫-৭৬।

[১৭] তদেব. পৃ. ৬৬, ৬৯।

[১৮] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা ছোটগল্পের ধারা* (কলকাতাঃ ১৩৬৫), পৃ. ৭।

ব্যক্তির চিত্তে এক প্রকৃত ভালোবাসার অমৃত সরস প্রস্রবণের মুখ খুলে দিয়েছেন। যে ভালোবাসা শরীর সর্বস্ব নয়, রূপকামনার মুখ্যতাই যার প্রধান কথা নয়, যে ভালোবাসা নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবন-যাপনে, পরস্পরের সহায়তায় কর্মপ্রাণতায় উদ্ভূত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। "রস" নামটি এখানে তাই দুই নারীকে ঘিরে নর-নারীর চিত্তে গভীর এক মানসবন্ধনের করুণ মধুর সরসতার দিকে ইঙ্গিত করেছে।

## ২

"পালঙ্ক" পূর্ববাংলার গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা গল্প। দেশবিভাগ পরবর্তী পূর্ববাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পের কাহিনী। দেশবিভাগের পর অধিকাংশ সম্পন্ন হিন্দুই পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হলেও সম্পন্ন গৃহস্থ বৃদ্ধ রাজমোহন তার ভিটে-মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন পূর্ববাংলায়। কয়েক ঘর নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত সোনাপুর নামের এই গাঁয়ে রাজমোহন 'ধলাকর্তা' নামে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করছেন। অন্যদিকে তার শিক্ষিত পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনি দেশভাগের আগে থেকেই কলকাতায় বসবাস করছে। তার পুত্রবধূ কলকাতার বেলেঘাটা থেকে এক পত্রে বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত পালঙ্কখানি বিক্রি করে সেই টাকা কলকাতায় তাদেরকে পাঠাতে লিখেছে। এই পালঙ্ক বিক্রি নিয়েই আবর্তিত হয়েছে এ গল্পের কাহিনী।

দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত "পালঙ্ক" গল্পটি নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাওয়ার যোগ্য। বাঙালির সামাজিক জীবনে তখন এক উদ্‌ভ্রান্ত পালাবদলের ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে রক্তাক্ত স্বাধীনতা ও দ্বিখণ্ডিত স্বদেশভূমি বাঙালির সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে এনেছিল পর্বত প্রমাণ সমস্যা ও সঙ্কট। বিশেষত পূর্ববাংলা ছেড়ে হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ায় সেখানে সৃষ্টি হয় প্রবল উদ্বাস্তু সমস্যা। যেকোনভাবে, যেকোনো মূল্যে শুধু প্রাণটা সম্বল করেও অনেকে চলে গেছে ওপারে।[১৯] "পালঙ্ক" গল্পে সোনাপুর গ্রামের পাড়া-পশি বাড়ুয্যেরা, মুখুয্যেরা, রাহারা, সাহারা, কুণ্ডুরা, নন্দীরা সকলেই বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গিয়েছে এবং ওপারে গিয়ে এতদিনে তারা বেশ গুছিয়েও নিয়েছে। কেবল যায়নি বৃদ্ধ রাজমোহন রায়। অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমে অর্জিত তার বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে কিছুতেই যাবেন না তিনি। যদিও তার চারপাশে কেবল মুসলমান ও জলচল নয় এমন জাতের ক'ঘর হিন্দু, তবুও নিঃসঙ্গতা ও জাতধর্মের নীলরক্তের আভিজাত্য নিয়ে একাই রয়ে গেছেন তিনি। গল্পকারের ভাষায় :

> হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তার কেউ নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনীর বিচ্ছেদ—দুঃখের কথা মনে

---

[১৯] ঐতিহাসিকদের মতে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে উদ্বাস্তু স্রোতের একমাত্র কারণ দাঙ্গা নয়। তবে ১৯৪৯-৫০ -এর শীতকালে পূর্ব-বঙ্গের কোনো কোনো জেলায় হিন্দুদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত নেমে এসেছিল। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হিন্দু, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণী ও বর্ণের হিন্দুরা সে সময়েই দেশ ছেড়ে পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছিল নিছক প্রাণভয়ে। কিন্তু বেশিরভাগ পূর্ব-বঙ্গীয় হিন্দুর পশ্চিমযাত্রার কারণ, বিশেষত মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হ্রাস, পুরনো আমলের সামাজিক মর্যাদা হানির আশঙ্কা, ছোটখাট ব্যাপারে বিব্রত হওয়া ইত্যাদি। অনিল সিংহ, "পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা", *ঈশান*, জানুয়ারি, ১৯৯৮।

> পড়ল। কেউ যেন তার থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্যপুরীতে এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।[২০]

আত্মীয়-পরিজন ছাড়াই একাই নিঃসঙ্গ পড়ে আছেন বৃদ্ধ রাজমোহন পূর্ববাংলায়। আজন্মলালিত মাটি, প্রকৃতি ও পরিবেশের টানে এক সজল আবেগে জীবনকে, রক্তের সম্পর্ককে তুচ্ছ করেও পড়ে আছেন শূন্য বাড়িঘর আঁকড়ে। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের মতই বিশাল বাগ-বাগিচাসহ তার বাড়িটি। দেড়মাইল দূরে কুমারপুরে রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লিখে তিনি এই বিষয়-সম্পত্তি করেছেন। এখন তার চারিদিকে দরিদ্র মুসলমানদের বসবাস। তারাই রাজমোহনের জমা-জমি চাষাবাদ করা, ধান কাটা, পাট কাটা, কামলা খাটা প্রভৃতি কাজের সঙ্গী। কিন্তু এই সময়ে পুত্রবধূ অসীমার পত্র রাজমোহনের কাছে এক অমোঘ সওয়াল। বাগ-বাগিচা বিক্রি নয়, ঘর-বাড়ি বিক্রি নয়, এমনকি তাকে কলকাতা যেতেও বলা নয়, পালঙ্ক বিক্রির নির্দেশ তাকে একেবারে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। ফলে নাতি নাতনিদের কষ্ট তাকে বিচলিত না করে বরং সীমাহীন অভিমান-শূন্যতা তার কষ্টকে আরো দ্বিগুণ করে দিয়েছে। আর তাই পুবের শূন্য খাঁ-খাঁ ঘর খানা দেখে ইষ্টমন্ত্রের বদলে তার পালঙ্কখানাকেই বারবার মনে পড়ছে।

অন্যদিকে মকবুল তার সারাজীবনের সঞ্চয় পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গাই কেনার বদলে, ঘর সারাবার বদলে কিনেছে পালঙ্কটি—যেন একরাশ স্বপ্ন যা অগোচরে তার শিরায় রক্তের প্রবাহের সঙ্গে মিশে আছে। মকবুল মজুরশ্রেণীর দরিদ্র এক দুধ বিক্রেতা হলেও অযাচিত লটারির সুযোগ যেন এসেছে তার জীবনে। দরিদ্র মকবুলের সমস্ত ঘরখানাই প্রায় জুড়ে রয়েছে পালঙ্কটি। ওপরে গদি নেই, তার বদলে একটা মাদুর, ছেঁড়া ময়লা কাঁথা এবং ওয়াড়হীন তেলচিটচিটে দুটো বালিশ। নীচে আছে গেরস্থালি জিনিসপত্র।

গল্পে পূর্ববাংলার এই অঞ্চলের বর্ষাকালীন জীবন ও প্রকৃতির খামখেয়ালির সঙ্গে মিশে আছে দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন দুঃখময় জীবন-যাপন। 'চারিদিকে জল, চারিদিকে জঙ্গল, তিনদিকে খাল, একদিকে নদী। ... কোনটিতে জল উঠছে। আর কোন বাড়ি জলের ওপরে জেগে রয়েছে। এক একটি বাড়ি যেন এক একটি দ্বীপ।[২১]'এই সময়ে এই অঞ্চলে মজুরশ্রেণীর খুব কষ্ট। কাজের অভাব এবং দ্রব্যমূল্য তাদের জীবিকা সংস্থানের পথকে আরো দুরূহ করে তোলে। পালঙ্ক কিনে মকবুল পড়ে যায় আরো বিপদে, তার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। বলা যায় রাজমোহনের আশ্রিত সে। জমিতে মজুরগিরি করা, পাটের সময় পাট কেটে ধুয়ে মেলে দেওয়া, ধানের সময় দলের সঙ্গে ধান কাটা, ঘরামিগিরি করা, বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করা, জ্বালানির জন্য কাঠ চেরাই করে দেওয়া ইত্যাদি কাজে মকবুলই ছিল ভরসা। কিন্তু পালঙ্ক সংক্রান্ত টানা-পোড়েনে মকবুলের সঙ্গে রাজমোহনের ভীষণ দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

শেষ পর্যন্ত পালঙ্ক নিয়ে জেদাজেদির পরিণামকে গল্পকার বড় কোমল, বড় সুন্দর করে নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। হেরে গেছে হিন্দু-মুসলমানের রেষারেষি-জেদাজেদি; শেষ হয়েছে দুই অসম শ্রেণীর অহংবোধ, বিরোধিতা, শত্রুতা। জিতেছে ভালোবাসা। রাজমোহনের ভালোবাসা পাত্রান্তরিত হয়েছে। দ্বিখণ্ডিত দেশের বিভাজনরেখার ওপর দাঁড়িয়ে ধনী রাজমোহন অনুভব করেছেন দরিদ্র মুসলমান দিনমজুর মকবুলই তার আপনজন—দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া পুত্র-

---

[২০] নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "পালঙ্ক", *গল্পমালা ১*, পৃ. ২৪৭।

[২১] তদেব, পৃ. ২৪৮।

পুত্রবধূ নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ধর্ম, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীভেদ ভুলে পারস্পরিক সমানুভব আকাঙ্ক্ষা তথা অসাম্প্রদায়িক মানবতার প্রীতি-সংযোগ কামনা ইত্যাদির প্রতীক হয়ে ওঠেছে পালঙ্কটি—মৃদুকণ্ঠে এই কথাটিই বলতে চেয়েছেন গল্পকার।

## ৩

পূর্ববাংলার গ্রামীণ পটভূমিকায় রচিত গল্প "সোহাগিনী"[২২]তে বিধৃত হয়েছে প্রেম এবং প্রেমভঙ্গের করুণ ও বিপদময় পরিণতির বাস্তবনিষ্ঠ আলেখ্য। গল্পকারের একান্ত পরিচিত মধ্যবিত্ত পরিবারের গণ্ডির বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্কের কথা অন্বিত হয়েছে গল্পটিতে। নিজের গল্পের প্রবণতা সম্পর্কে গল্পকারের সরল এবং অনায়াস স্বীকারোক্তি :

> প্রীতি প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বারবার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি। ... ... সে ভালোবাসা হয়তো সংকীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালেবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।[২৩]

"সোহাগিনী" তেমনি এক ভালবাসার গল্প। সামাজিক দিক থেকে তা প্রথাবিরুদ্ধ, অনেকটা নিষিদ্ধ, কিন্তু হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তার উত্তরণ ঘটেছে ধ্রুপদী ট্রাজেডিতে।[২৪]

"সোহাগিনী" গল্পের পটভূমি পূর্ববাংলার একটি গ্রামাঞ্চল। এটি ফরিদপুর জেলার বিশেষ একটি অঞ্চল, যেখানে গল্পকার নরেন্দ্রলাল মিত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২৫] গল্পকারের দরদি হাতের স্পর্শে এই অঞ্চলের মানুষজন, তাদের জীবন-যাপন, প্রকৃতি-নদীনালা, মাঠঘাট, ফসল সবই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বিভাগ-পরবর্তী কোন এক সময়ের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে বিভাগ-পূর্ব পূর্ববাংলার এই অঞ্চলের জীবনচিত্র, হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় সম্পর্কের পটভূমি। গল্পে পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ মতি মিঞা, তেইশ-চব্বিশ বছরের মবদুল এবং চল্লিশ বছরের বিহারী মণ্ডল তিনজনে কোমর জলে চণ্ডীপুরের ভরা মাঠে লক্ষ্মী দীঘা ধান কাটছে আর নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে। এই কাজে একই সঙ্গে দুই মুসলমান, এক হিন্দু—তিনজনেরই একই শ্রম, একই পরিস্থিতি, অন্নের জন্য একই লড়াই। গল্পকারের নিরাবেগপূর্ণ ভাষায়—

---

[২২] গল্পটি প্রথমে "তুফানী" নামে *দেশ*, পূজা সংখ্যা ১৩৬৪ তে প্রকাশিত হয়। পরে *পত্রবিলাস* গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার সময় "সোহাগিনী" নামকরণ গৃহীত হয়। উদ্ধৃত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *গল্পমালা -১*, পরিশিষ্ট দ্র.।

[২৩] *গল্পলেখার গল্প*, পৃ. ১১।

[২৪] শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়, "ভালোবাসার গল্প : সোহাগিনী", সমীর বসু (সম্পা.), *প্রসঙ্গ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র*, পৃ. ৪০।

[২৫] গল্পে বর্ণিত হয়েছে নৌকা বাইচ শেষে সকলে যখন ঘরে ফিরছে তখন কাপুইড়া সদরদির মোল্লাদের ঘাটের কাছে দুই নৌকার ঠোকাঠুকি লেগে 'কাইজা' বেধে যায়। উল্লিখিত 'সদরদি' গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্মস্থান —শৈশব, কৈশোর স্মৃতিবিজড়িত গ্রামের নাম। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "সোহাগিনী", *গল্পমালা -১*, পৃ. ৩৯৬।

> বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে, পেটে ক্ষিদের আগুন। তবু কারো হাত কামাই নেই, মুখ কামাই নেই। দুবছর বাদে এবার ধানের খন্দ ভাল হয়েছে। কেটে ঝেড়ে তুলতে না পারলে বউ ছেলে খাবে কি। খাওয়া-পরায় বড় কষ্ট। ... গোছে গোছে ধান কেটে রাখছিল নৌকায়। ধান তো নয়, সোনা, কোথায় লাগে এর কাছে বাবু ভুঁইয়াদের পরিবারের গলার সোনা, কানের সোনা।[২৬]

কিষাণের জীবনের শরিক না হয়েও গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র কী অণুবীক্ষণী দৃষ্টি দিয়ে অল্পকথায় তুলে এনেছেন তাদের জীবন চিত্র, সুখ-দুঃখ। সোনালী বর্ণে ঝলমল মাঠের ধান কাটতে কাটতে তারা ভুলে যায় দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলতে তারা গল্প করে। কেননা এই অবস্থায় 'কিষাণরা গল্প বড় ভালোবাসে'।

মতিমিঞার বর্ণনায় বিভাগপূর্ব সময়ের পূর্ববাংলায় হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় সম্প্রীতির চিত্র উঠে এসেছে। একই গ্রামে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান বসবাস করেছে, যেন 'একই সুন্দরী মাইয়া মানুষের সুর্মা পরা দুই চোখ।' মতির বাবা রজ্জাক সিকদার আর তুফানীর বাবা বদন চৌকিদার তেমনি বসবাস করেছে পাশাপাশি—সুখে দুঃখে, ঈদ-পার্বণে মিলেমিশে। তবে—

> ঝগড়াঝাটি হত। গালাগালও দিয়ে দু'পক্ষই দু-পক্ষের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করত। কিন্তু মিলমিশ হতেও বেশি দেরি লাগত না। দুজনের গলায় গলায় ভাব ছিল। ... তারা প্রায় একই ধরনের চাষী গৃহস্থ। একসঙ্গে মাঠে খাটত, বর্ষার সময় এক নৌকায় হাটে যেত। তাদের চালচলন শোয়াবসা সব একরকম ছিল।[২৭]

এমনই হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাঁধা ছিল বিভাগপূর্ব পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন। বিভিন্ন পালা-পার্বণ, ঈদ-মহরম উপলক্ষে তারা একত্র হয়েছে, ভাগাভাগি করে নিয়েছে তাদের হাসি-আনন্দ-উচ্ছ্বাস। তেমনি ভাদ্র মাসে সংক্রান্তির দিনে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে কুমার নদীতে যে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়েছে তা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অংশগ্রহণে রীতিমত উৎসবে পরিণত হয়েছে। মতিমিঞার কথায় :

> সেবার নদীতে খুব নৌকা হয়েছিল। পঞ্চাশ ষাটখানাতো হবেই। আর সেই বাইচ দেখবার জন্যে বিশ পঁচিশ খানা গাঁয়ের লোক জড় হয়েছিল কুমার নদীর তীরে। তীরে মানে নৌকায়। ... ... গাঙে জল বইলা কিছু নাই, সব নৌকা; বন্দরে বাড়িঘর দোকানপাট বইলা কিছু নাই। সব কালা কালা মাথা। পঞ্চাশ হাটের মানুষ আইসা এক ঘাটে জোটছে।[২৮]

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অজস্র টানাপোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাত ও সংগ্রামের কাছে ম্রিয়মাণ মানুষের অসামান্য প্রীতি ও ভালবাসার উচ্চারণ গল্পকারের প্রতিশ্রুতি। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বর্ণনা, প্রেমের রস ও মর্মান্তিক পরিণতি সব মিলে "সোহাগিনী" গল্প হয়ে উঠেছে পূর্ববাংলার স্মৃতিময় বিষাদের কথকতা।

---

[২৬] তদেব, পৃ. ৩৯০।

[২৭] তদেব, পৃ. ৩৯।

[২৮] তদেব, পৃ. ৩৯৫-৯৬।

## ৪

"ভুবন ডাক্তার" (১৩৫৮) পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত একটি চরিত্রের আত্ম-উন্মোচনের কাহিনী। দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসের মূল চরিত্র রাসকলনিকফের জীবনে অপরাধ, অপরাধবোধ, অপরাধ স্বীকৃতি ও অপরাধ স্খালনের পর্যায়গুলি যেমন ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে এ গল্পেও তেমনি মূল চরিত্র ভুবন ডাক্তারের চারিত্রিক অধঃপতন, অপরাধ-সংগঠন, অপরাধ-স্বীকৃতি এবং সবশেষে কঠিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির এক ক্ষুদ্র ধারাবাহিক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।[২৯] এখানে গল্প নয় গল্পের পাত্রে পরিবেশিত হয়েছে পাপস্খালনের কাহিনী।

গল্পে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার গ্রাম-প্রকৃতি ও গ্রামীণ সমাজজীবন। পল্পকারের শৈশবস্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমি, তাঁর গ্রাম (সদরদি মৌজা) উঠে এসেছে কাহিনীতে। বিভাগোত্তর কালে তখনও কেউ কেউ কলকাতাবাসী হলেও তাদের জমাজমির অবশেষ পূর্ববাংলায় রয়েছে। সেইসূত্রে কখনও কখনও তারা পূর্ববাংলায় জন্মভূমির মাটিতে ফিরে এসেছে। গল্পকথক কলকাতাবাসী হয়েও তেমনি পূর্ববাংলায় তার গ্রামে এসেছে, 'ফরিদপুর জেলার এই কাসিমপুর গ্রামে দু'চার বিঘে জমি আমাদের আছে। তা কোনোদিনই ভোগে আসে না। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ভাবছি ছাড়িয়ে দিয়ে আসবো।'[৩০] এরপর গল্পের সূত্রপাতরূপে বিধৃত হয়েছে গ্রাম বাংলার ছবি :

> ১. ছোট ছোট খাল গেছে এঁকে বেঁকে। একটা থেকে একটা, তার থেকে আর একটা। দুই দিকে ঝোপ। কোথাও কোথাও বাঁশের ঝাড়, সুপারির বাগান, গাব, শ্যাওড়া আর আগাছার জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু'চারখানা করে বাড়ি।[৩১]
>
> ২. খানিকবাদে ভুবন ডাক্তারের বাড়িতে আমরাও পৌছলাম, কিন্তু নৌকা ভিড়বার জায়গা নেই ঘাটে। শুধু ঘাট নয়, বাড়ির চারিদিকে ছোট ছোট কালো কালো সব ডিঙি নৌকা। বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের গঞ্জগুলিতে যেমন হাট মেলে এও প্রায় তেমনি।[৩২]

গল্পে বিধৃত হয়েছে পূর্ববাংলার তৎকালীন গ্রামীণ মুসলিম সমাজজীবনের যৌথ পারিবারিক জীবনের এক দুষ্টক্ষতযুক্ত ছবি। কাসিমপুর গ্রামের সেখ পাড়ার একনম্বর শয়তান, কুচক্রী জনাই খাঁ তার মৃত ভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার মানসে তার ভাইঝি নুরুন্নেসার সঙ্গে জোর করে তার বিবাহিত ছেলের বিয়ে দিতে চায়। সে রাজি না হওয়ায় ভুবন ডাক্তারের সহযোগিতায় তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এ কাজে ডাক্তারকে রাজি করাতে জনাই খাঁ তাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এমনিভাবে বিভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলার গ্রামীণ মুসলিম সমাজ জীবনের নিখুঁত ছবি উপস্থাপিত হয়েছে এ গল্পে।

---

[২৯] পরমেশ আচার্য, *ছোটগল্প মুসলমান সমাজ : সমীক্ষা* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১৭১।

[৩০] তদেব, পৃ. ১৭১।

[৩১] তদেব, পৃ. ৯৩।

[৩২] তদেব, পৃ. ৯৩।

৫

বর্ষাকালে প্রকৃতির সংহার মূর্তি এবং দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত "বন্যা" (১৩৬২) গল্পে বিধৃত হয়েছে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শৈশবস্মৃতি জড়িত সদরদি গ্রাম এবং গ্রামের পার্শ্ববর্তী কুমার নদীর প্রবহমান চিত্র। গল্পে বন্যাক্রান্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের সীমাহীন দুর্দশা ও লাঞ্ছনার বর্ণনার পাশে আট বছরের ফুটফুটে মেয়ে ময়নার অপঘাত করুণ মৃত্যুর বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। পাশাপাশি প্রকৃতি-সৃষ্ট এই বিপদ থেকে উত্তরণ পেতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াস-চেষ্টাও গল্পে উদ্ধৃত হয়েছে।

এই গল্পের মুখ্য ভূমিকায় আছে মানুষ নয়, সংহার মূর্তিময় প্রকৃতি। গল্পকার নিরাবেগ ভাষায় বন্যার প্রলয়ঙ্কর রূপ চিত্রিত করেছেন :

> তালগাছের মাথায় উঠে চেয়ে চেয়ে বন্যার রূপ দেখে আইনুদ্দিন। কোথাও এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন নেই। সব জলে জলাকার, সব একাকার হয়ে গেছে। কইডুবি, সাইমুসাদি, তালকান্দি, চরকান্দি, চাঁদের কান্দির সঙ্গে তাদের পুব-সদরদি, পশ্চিম সদরদিও জলের মধ্যে তলিয়ে রয়েছে। ডুবে গেছে বাইশ সদরদির মৌজা। আর মানুষ সেই ডুবন্ত পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে ঘরের চালে, গাছের ডালে, ডিঙিতে ডিঙিতে, তালগাছের ডোঙায়, কলাগাছের ভেলায়। মাছের মত জলচর হয়ে রয়েছে বাইশ সদরদির হিন্দু-মুসলমান।[৩৩]

গল্পকার তার জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও শৈশবের স্মৃতি মিশিয়ে বন্যার ছবি এঁকেছেন। তিনি আমৃত্যু কলকাতাবাসী হলেও গল্পের মধ্য দিয়ে সুযোগ পেলেই তার জন্মভূমি, শৈশব-বাল্যের স্বপ্ন-স্মৃতি ফিরে ফিরে এসেছে। এ গল্পেও জলে ভাসা সদরদি গ্রামপুঞ্জ এবং কুমার নদী চিত্রণের মধ্য দিয়ে তাঁর জন্মভূমির প্রতি একান্ত ভালোবাসা প্রবাহিত হয়েছে।

৬

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনেক গল্পের পটভূমি পূর্ববাংলার গ্রাম-জীবন ও সমাজ ছাড়িয়ে কখনো জেলা শহর বা কখনও মহকুমা শহর, অনুমান করা যেতে পারে তা ফরিদপুর অথবা ভাঙ্গা। "পুনশ্চ" (১৩৩৫) এমনি এক জেলা শহরের কাহিনী। আনারসের চালান নিয়ে জেলা শহরে এসেছে এক যুবক মহাজন কাঞ্চন মিঞা। ব্যবসার অবসরে সন্ধ্যায় তার প্রয়োজন একটু রসের খোরাক—একটি সুন্দর মুখের পণ্য নারী। এই কাজে সে তার কর্মচারী জৈনুদ্দিনকে নিযুক্ত করে। জৈনুদ্দিনকে নিয়েই এই গল্পের বিস্তার। যুবক মহাজনের জন্য 'সুন্দরমুখ' একটি 'জহরৎ' খুঁজতে বেরোয় জৈনুদ্দিন। খুঁজতে খুঁজতে এক পণ্য নারীর মুখে জৈনুদ্দিনের চোখ একেবারে আঁটকে যায়। এ মুখ তার অতিপরিচিত বরু বিবি ফাতেমা। তখনই তার মনে পড়ে যায় ফেলে আসা দিনগুলো, বিশেষত সাত বছর আগের দুর্ভিক্ষের সময়।

স্মৃতি-বিদারক প্রেমের কাহিনীতে প্রেমের রস ও মধুর পরিণতিঋদ্ধ এ গল্পে উঠে এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী খাদ্যাভাব এবং ৪৩-এর দুর্ভিক্ষে পূর্ববাংলাসহ গোটা বাংলার দুরবস্থার চিত্র :

---

[৩৩] নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "বন্যা", *গল্পমালা*- ২, পৃ. ২৮৪।

> যুদ্ধের দরুণ গৃহস্থালীর খরচা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তাঁত আর খোলা হল না, তার বদলে দুই বউকে দুই ঢেকি পেতে দিল জৈনুদ্দিন। ফি হাটে ধান কিনে আনে, দুই বউকে পাল্লা দিয়ে চাল ভেনে দিতে হয়। সেই চাল বিক্রির পয়সায় চলে সংসার। ... ... তারপর এলো সেই দেশ-জোড়া দুর্ভিক্ষ। হাটে বাজারে ধান মিলে না, ফতেমা আর সকিনা দুজনেই বেকার। ... বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। চেয়ে চিন্তে যেখান থেকে যা পায় সব সকিনা আর তার ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ায় জৈনুদ্দিন। শুকিয়ে শুকিয়ে ফতেমা অস্থিসার হয়। নড়ে বসবার শক্তি থাকে না।[৩৪]

শহরে শহরে লঙ্গরখানা খোলা হয়, সেখানে কঙ্কালসার, মৃতপ্রায় মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। অবহেলিত-বিতাড়িত ফতেমা তিনদিন লঙ্গরখানার সামনে মড়ার মতো পড়ে থেকে অবেশেষ শহরের অন্ধকার গলিতে পণ্য নারীতে পরিণত হয়।

## ৭

গল্প যে কেবল বয়স্কদের উপভোগের জন্য তা নয়, মানুষ শৈশব থেকেই গল্পের মধ্য দিয়ে পেতে শুরু করে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের স্বাদ; নিজের কল্পনাকে বিস্তৃত করে দিয়ে সেই কল্পনার চোখে সত্যের মূর্তি গড়ে তোলে শিশু। তাই শিশুমনের উপযোগী, তাদের ভাললাগা-মন্দলাগা নিয়ে গড়ে উঠেছে শিশু সাহিত্য। শিশু সাহিত্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র যথেষ্ট সফলতা দেখালেও শিশুসাহিত্যিক হিসেবে হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা অশাপূর্ণা দেবী যে আসন লাভ করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তবে বাংলা সাহিত্যে শিশু সাহিত্যের এই উর্বর সময়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ শিশু-কিশোরদের উপযোগী গল্পের উৎস হিসেবে অবলম্বন করেছেন তাঁর নিজেরই হারিয়ে যাওয়া বাল্যকালের পূর্ববাংলার স্মৃতিময় জীবনের একঝলক বাতাস, যা ছড়িয়ে পড়েছে গল্পগুলোর শরীরে। গল্পগুলোর ভঙ্গি প্রায় একই রকম, ঘটনার ঈষৎ হেরফের থাকলেও স্বাদের বৈচিত্র্য তেমন কিছুই নেই। একই পরিবেশ ও একই মানসিকতা গল্পগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পগুলোতে বাস্তবতা এবং সত্যতা গুণ সৃজনে রয়েছে অসামান্য আন্তরিকতা। গল্পে ব্যবহৃত নাম এবং চরিত্রগুলো গৃহীত হয়েছে গল্পকারের বাল্যজীবন থেকে। 'পল্টু' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিজেরই ডাকনাম এবং 'অনাথ' তাদের বাড়ির ভৃত্য। তাই গল্পগুলো একসঙ্গে পড়লে মনে হতে পারে যে লেখাগুলো তাঁর আত্মজীবনীর কৈশোর পর্বের কয়েকটি পরিচ্ছেদ।[৩৫] "অনাথের কীর্তিকলাপ" (১৩৬৭), "ময়ূরপঙ্ক্ষী" (১৩৬৯), "নষ্টচন্দ্র" (১৩৭০), "হালখাতা" (১৩৭৪), "কানা বসিরের ঘোড়া" (১৩৭৫), "মধুচক্র" (১৩৭৭), "মোহন বাঁশি" (১৩৮০), "হারান মাস্টার" (১৩৭১), "বাটি চালান" (১৩৭২) প্রভৃতি গল্পে ধরা পড়েছে গল্পকারের গ্রামজীবনের কথা। পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনযাত্রার নানা দিক, উৎসব-পার্বণের বর্ণনা, বর্ষাকালে যাতায়াতের জন্য নৌকার আবশ্যিকতা, দুষ্ট ছেলেদের নানা দুরন্তপনার চিত্র, গ্রামীণ সংস্কারের নানা কীর্তি, গ্রামীণ জীবনের সরল আতিথেয়তা—সবমিলে সৌহার্দ্যপূর্ণ এক মধুময় জীবনের ছবি গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে।

---

[৩৪] নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "পুনশ্চ", *গল্পমালা* -২, পৃ. ২১।

[৩৫] অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, *নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৫৯-৬০।

"অনাথের কীর্তিকলাপ" গল্পে বিবৃত হয়েছে বাড়ির ভৃত্য অনাথের বিভিন্ন আচরণ, তার কার্যকলাপ। গল্পকার তাঁর সাবলীল বাগ্‌বিস্তারে একজন ভৃত্যের সজীবতাময় ভূমিকায় গল্পটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' গল্পে আশ্চর্য সজীব হয়ে উঠেছে পূর্ববাংলার বর্ষাকালের নিবিড়-সজীব চিত্র। 'নষ্টচন্দ্র' গল্পে নষ্টচন্দ্রের রাতে কতিপয় দুষ্ট ছেলেরা অন্যের বাগান থেকে চুরি করার দুঃসাহসিক অভিযান গল্পকারের নিবিড় বর্ণনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

"হালখাতা" ও "কানা বসিরের ঘোড়া" গল্পে ধরা পড়েছে উৎসব ও পার্বণ উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। "হারান মাস্টার" গল্পে বর্ণিত হয়েছে এক বৃদ্ধ মাস্টার মশায়ের ক্লাসে ছেলেদের নানারকম দুষ্টুমি করে তাকে উত্যক্ত করা। গ্রাম-জীবনে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাঁড়-ফুঁকের একটা জীবন্ত জগৎ আছে। নানান ওঝা-গুনিনের সেখানে কদর আছে—আছে রমরমা ব্যবসা। "বাটি চালান" গল্পে বিধৃত হয়েছে তেমনি এক লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসের জগতের নিবিড় চিত্র।

## উপসংহার

বাস্তবের অভিজ্ঞতার সংস্পর্শজাত মানব-মনের নানা স্মরণীয় মুহূর্তের অনুভবকে গাঢ়তর-গভীরতর করে তোলাই ছোটগল্প রচনার নিবিড় প্রেরণা—এই মূলকথাটি বার বার অনুসৃত হয়েছে গল্পকারের জীবনে। ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুটি আবিষ্কারের মতো গল্পের প্লটের জন্য দেশ-দেশান্তর, পাহাড়-জঙ্গল না হাতড়েও অনায়াসে-অবলীলায় আশে-পাশের আটপৌরে জীবনযাপন বা সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়—নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অসামান্য নৈপুণ্যে উপস্থাপিত গল্পগুলো তার সুন্দর নিদর্শন। সাধারণভাবে যা একান্তই গতানুগতিক তার মধ্য থেকে নির্যাস সংগ্রহ করেছেন নিজস্ব নৈপুণ্যে। মমতাসমৃদ্ধ সাহিত্যবোধ এবং মনের সুস্নিগ্ধ কমনীয়তাকেই তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে 'মরূদ্যানের' চিরকালীন আশ্রয়ে পরিণত করেছেন একথা কেবল তাঁর বিষয়বস্তুতে নয়, গঠন বা ফর্মের ক্ষেত্রেও অনবদ্য। বিশেষত 'গল্পের শেষ হয়ে যাওয়া আর অকথিত অন্তিম অর্থটির হঠাৎ ঝলকিত হয়ে ওঠা, দুই-ই যেখানে একসঙ্গে ঘটে—সংশয় নেই, প্রশ্ন নেই, ব্যাখ্যা নেই, বাক্য নেই এই আর্টে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সিদ্ধি অবিসংবাদিত।'[৩৬]

সাধারণ মানুষের দিনযাপন থেকে মুক্তোর মতো গল্প আহরণ করেছেন নরেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তার সমকালীন গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁকে রবীন্দ্রনাথ, চেকভ ও মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩৭] তবে সমসাময়িক লেখকদের চেয়ে তিনি ভিন্ন হতে পেরেছিলেন দুটি কারণে।

---

[৩৬] সত্যেন্দ্রনাথ রায়, "নিঃশব্দ প্রবেশ নিঃশব্দ প্রস্থান : কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র", *দেশ*, ১৫, নভেম্বর, ১৩৭৫, পৃ. ১৯১। প্রবন্ধটি পরবর্তীতে লেখকের *শিল্প-সাহিত্য দেশকাল* (কলকাতা : ১৯৮১), গ্রন্থে সংকলিত।

[৩৭] নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে তাঁর আরো কিছু চমৎকৃত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য 'এত মাপা এলাকায় চলাফেরা, এত অল্পসল্প উপকরণ, তবু তাই দিয়েই বাংলার গল্প-সাহিত্যে তিনি ঘটিয়েছেন অসাধ্যসাধন। বুনে চলেছেন প্রেমেন্দ্র-মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ—মধ্যগগণে তখন কিন্তু এত সূক্ষ্ম কুর্শিকাটায় ? তাঁর মতো নিপুণ হাত তাঁর সমকালীন খুব বেশি লেখকের ছিল না, বিনাদ্বিধায় বলতে পারি।' সন্তোষকুমার ঘোষ, "গল্পে সুচার্গ সূক্ষ্মতা ছিল যে অসামান্য শিল্পীর", *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১৪ মার্চ, ১৯৮৩, পুস্তক পরিচয়, দ্র.।

প্রথমত, ভাষা ও আঙ্গিকের মধ্যে কোনো জটিলতা না রেখে গল্পটি বিবৃত করেন অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে, অনায়াস দক্ষতায়। দ্বিতীয় কারণ, গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রগুলো গৃহীত হয়েছে আমাদের চারপাশের চেনাজানা পরিবেশ থেকে—চেনাজানা আপনজনের মধ্য থেকে।[৩৮] এই সহজ গ্রহণযোগ্যতা সর্বস্তরের পাঠকের কাছে তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল। কলকাতা বসবাসকালে নরেন্দ্রনাথ মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প লিখলেও মাঝে-মধ্যে হঠাৎ ফিরে গেছেন গ্রামীণ জীবনের কাহিনীতে। গ্রামীণ জীবনের গল্প লিখতে সাহায্য করেছে তাঁর পূর্ববাংলার বাল্যস্মৃতি। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত সদরদি মৌজার গ্রামগুলির কথা, গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষজন, তাদের আঞ্চলিক ভাষা এবং আবহ এমন নিপুণভাবে উঠে এসেছে যে এই গল্পগুলি তার নগর জীবনভিত্তিক অনেক গল্পের তুলনায় খরশান।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প-ভাষায় একটি অনায়াস দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন একটি রুচির ছাপ সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পূর্ববাংলার জীবন ও পরিবেশনির্ভর গল্পগুলোতে তাই স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রগুলির মুখে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যময় ভাষা। যে মানুষগুলোর কথা তিনি "রস", "পালঙ্ক", "সোহাগিনী", "বন্যা" ইত্যাদি গল্পে বলেছেন তাদের তিনি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন। তাদের ভাষাও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। "পালঙ্ক" গল্পের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক রাজমোহন এবং দরিদ্র দিনমজুর মকবুল যে প্রায় একই ভাষায় কথা বলে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন : "রাজমোহন দুর্বল জড়িত স্বরে বললেন; 'হ আমি। পালংখানা তুই বেইচা ছাড়লি হারামজাদা ? আমারে না জানাইয়া বেইচা ফেললি।' মকবুল অন্ধকারে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেডা কইল আপনারে'।"[৩৯] যেখানে যে বাক্য ও শব্দাবলী ব্যবহার করলে গল্পটির সংহতি বিনষ্ট হবে না এবং স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে সেখানে সেই ভাষাই তিনি ব্যবহার করেছেন। চিত্রকল্পগুলিতেও একইভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর ভাষার দক্ষতা। কিন্তু আঞ্চলিকতা দোষ কোথাও ঘটেনি। এখানে স্বভাবতই টমাস হার্ডি ও তারাশঙ্করের কথা মনে আসে এবং সেই সঙ্গে একথাও মনে হয় যে নরেন্দ্রনাথ কোথাও তাঁদের অনুকরণ করেননি। এখানেই নরেন্দ্রনাথের মৌলিকতা।[৪০] আর তাই চরিত্রচিত্রণ, পরিবেশনির্মাণ, সমাজবাস্তবতা, ভাষা ব্যবহারে অনায়াসদক্ষতা সব মিলে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প সৌহাদ্যপূর্ণ এক জীবনের ছবি।

---

[৩৮] শরদিন্দু কর, "সাধারণ পাঠকের চোখে নরেন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প", সমীর বসু (সম্পা.) *প্রসঙ্গ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র*, পৃ. ৮৭।

[৩৯] নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "পালঙ্ক", *গল্পমালা -১*, পৃ. ২৫৬।

[৪০] শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়, "ভালবাসার গল্প : সোহাগিনী", সমীর বসু (সম্পা.), *প্রসঙ্গ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র*, পৃ. ৪০।

**ISSN 1561-798X**
**আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫**

# বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচিন্তা : আত্মোপলব্ধির প্রয়াস

সৌভিক রেজা[*]

**Abstract :** Buddhadeva Bose,who is recognised as one of the most influential poet of his time; poetry was his main concern. He lived the life of a poet. His poetry in a sense can be considered the emotional transmutation in its totality.He has brought in the idiom of spoken language with consummate skill.His poetry was simple,sensuous and passionate,but his mind and medium have developed steadily.His poems were expressions of feeling and mood.Buddhadeva Bose was one of the most important critics of the modern Bengali poetry. He composed his poetical-thoughts magnificently with a enjoyable and delightful prose.He reacted strongly against so called propaganda-literature.He had some general theory of his own.The nature of poetry,the essence of poetry was the main concern of Buddhadeva Bose.The aim of this essay is to interpret what Buddhdeva Bose meant by his poetical thoughts.

## ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে-কয়জন কবির অবদান সর্বাগ্রে স্মতর্ব্য,তাঁদের মধ্যে কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র কবিতা নির্মাণের ভিতর দিয়েই নয়,সেইসঙ্গে পত্রিকা-প্রকাশ ও সম্পাদনা,কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ-রচনায় নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রেখে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় নতুন ও নিজস্ব একটি ঘরানা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কাছে কবিতা সাহিত্যের নিছক একটি শাখামাত্র ছিলো না; বরং তিনি মনে করতেন, কবিতা হচ্ছে—একজন সৃজনশীল প্রতিভার আন্তর-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। বলা যায়,সে-কারণেই কবিতাকে রাজনৈতিক প্রচারমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, তাকে রাজনেতিক মতাদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবার ক্ষেত্রে তিনি তীব্র বিরোধিতা করে গেছেন আজীবন। এই প্রসঙ্গে এইটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিরিশোত্তর আধুনিক কবিদের

---

[*] ড. সৌভিক রেজা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এমন একজন ব্যক্তি, যিনি অন্য-কিছু নয়,শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চায় আত্মনিবেশ করেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে অধ্যাপনা থেকে সাংবাদিকতা—জীবিকার প্রয়োজনে অনেককিছুতেই যুক্ত তিনি ছিলেন ঠিকই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যেই স্থিত ছিলো তাঁর অবিচল আর অখণ্ড মনোযোগ। সাহিত্য, বিশেষভাবে কবিতা, ছিলো তাঁর আত্মোপলব্ধির অনন্য স্মারক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অম্লান দত্ত এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন:

> বুদ্ধদেব...মনে করতেন শিল্প,সাহিত্য,ও কবিতা অন্য এক চিরায়ত জগৎ সৃষ্টি করতে পারে যেটা পচনশীল নয়,মরণশীল নয়। ধার্মিক যেমন ঈশ্বরের দিকে তাকান মুক্তির জন্যে,বুদ্ধদেব তেমনি পচনশীল-মরণশীল পরিবেশে দাঁড়িয়ে কবিতার দিকে তাকিয়েছেন একধরনের মুক্তির জন্যে।[১]

শুধুই কবিতা লিখেই নয়, *প্রগতি* (১৩৩৪-১৩৩৬), *কবিতা* (১৩৪২-১৩৬৭)-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে দিয়েও তিনি সাহিত্যের প্রতি,কবিতার প্রতি তাঁর সেই মুক্তির দায় যেন পরিশোধ করতে চেয়েছেন।

## বুদ্ধদেব বসুর মানসগঠন

বুদ্ধদেবের মানস-গঠনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা তিনি নিজেই বহুবার অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর কালের আধুনিক কবিদের তুলনায় বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চার,বিশ্লেষণের পরিমাণ অনেক বেশি। অবশ্য এটিও সত্যি যে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে,বিশেষ করে কবিতায়,রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথেরই কাছে লেখা এক চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন: 'আমার কাছে আপনি দেবতার মত।আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি'।[২] শুধু কৈশোর বা যুবা বয়সেই নয়,বুদ্ধদেবের এই রবীন্দ্র-মুগ্ধতা তাঁর পৌঢ় বয়সেও অটুট ছিলো।১৯৬২ সালে রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বকবি ও বাঙালি' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখছেন:

> পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম...হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর তুল্য ক্ষমতা ও উদ্যম ভাষার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে,এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল:এবং ভাষাব্যবহারের দক্ষতায়,কবিতা ও গদ্যরচনার যুগপৎ অনুশীলনে,বহু ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় ও রূপকল্পের সার্থক প্রযোজনায়—সব মিলিয়ে,অন্য দেশে বা কালে,তাঁর সমকক্ষ ক-জন আছে বা কেউ আছেন কিনা,তা আমি অন্তত গবেষণার বিষয় বলে মনে করি।আমি যেহেতু বাঙালি,উপরন্তু সাহিত্যে সচেষ্ট,আর যেহেতু আমার কৈশোরকালে রবীন্দ্রনাথে নিমজ্জন ঘটেছিলো,তাই আমার কাছে এ-সব কথা তর্কাতীত।...রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবনে এমনভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন,এত বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর দ্বারা আমরা অনবরত সংক্রান্ত, যে...চিন্তার মাল্যচন্দনে আজ আবৃত তিনি,এক বিগ্রহ।[৩]

---

[১] অম্লান দত্ত, "বুদ্ধদেব বসু : বৈপরীত্যে সাযুজ্যে", *বৈদগ্ধ :* বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা (কলকাতা), ১৯৯৯, পৃ. ১৯।

[২] "রবীন্দ্রনাথকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি," *চিঠিপত্র, ষোড়শ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৫), পৃ. ১৬৫।

[৩] বুদ্ধদেব বসু, *সঙ্গ:নিঃসঙ্গতা:রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতা: এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৯১), পৃ. ২০৬।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেবের এই অনুরাগের, শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ হচ্ছে, একজন সৎ কবির স্বকীয় মর্যাদা বোধকে রবীন্দ্রনাথ সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। আর সাহিত্যিক-উত্তরাধিকারী হিসেবে বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে তাঁর কবি-জীবনের শুরু থেকেই আয়ত্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। কোনো কবি যদি এই আত্মসচেতনতা অর্জন করতে না-পারেন,তবে তাঁর সাহিত্যিক-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য—এইটি বুদ্ধদেব বসু তাঁর পূর্ববর্তী কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক,যতীন্দ্রনাথ বাগচী—প্রমুখ কবিদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। যে-কারণে শুধু বুদ্ধদেব বসুই নয়,তাঁর সমকালের জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী ,সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে—এরা সকলেই তাঁদের কব্যচর্চার ক্ষেত্রে এই আত্মসচেনতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। কারণ এঁরা এইটি অন্তত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ,আত্মসচেতন কবিমাত্রেই তাঁর মৌলিক কাব্যকৃতিকে প্রকাশ করবার সামর্থ্য রাখেন। প্যাটমোর(Coventry Patmore)-কে লেখা এক চিঠিতে কবি হপকিন্স(Gerard Manley Hopkins)বলেছিলেন:

> every true poet,I thought,must be original and originality a condition of poetic genius;so that each poet is like a species in nature...and never recur.[৪]

একজন কবির কাব্যকৃতির এই মৌলিক-নির্মাণের জন্যে,কবির কাব্যানুচিন্তনের মৌলিকতাও ভীষণভাবে জরুরি। এইটি ঠিক যে কবিতা কবির মৌলিক দর্শনের অভিব্যক্তি নয়;আবার তাই বলে,তাঁর জীবনের, অভিজ্ঞতার উৎসারণও নয়। বরং কবিতা, কবির সামগ্রিক উপলব্ধিকে আত্মস্থ করেই অভিব্যক্ত হয়। সে-কারণেই কবির কাব্যানুচিন্তনের গতিবিধি সম্বন্ধে, পাঠকের অন্তত,একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। বুদ্ধদেব বসু প্রখরভাবেই আত্মসচেতন যেমন ছিলেন, তেমনি এই সচেতনতার ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে প্রণোদিত করেছিলো রোমান্টিক কাব্য-চেতনা। যে-রোমন্টিকতার প্রতি তাঁর আজীবন পক্ষপাত ছিলো।এখানে বলে নেয়া দরকার যে রোমান্টিকতা,বুদ্ধদেব বসুর কাছে, নিছক একটি কাব্যিক চেতনা কিংবা সাহিত্য-আন্দোলন ছিলো না। এইটি ছিলো তাঁর ভাষায় :'মানুষের একটি মৌলিক,স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি।'[৫] চত্তবৃত্তি একজন কবির মৌলিক কাব্যচেতনারই একটি নির্বিভেদ উপাদান। এই দিকটির খেয়াল রেখেই বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন:

> তারই নাম রোমান্টিকতা,যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে,স্বীকার করে নেয়—শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়,নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে;তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত,অনিশ্চিত,অবৈধ,অন্ধকার ও রহস্যময়, যা কিছু গোপন,পাপোন্মুখ ও অকথ্য,যা কিছু গোপন,ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়— সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে,সন্দেহ নেই,মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।[৬]

---

[৪] Gerard Manley Hopkins, *Selections*(Edited by Graham Storey),(London : Oxford University Press,1967), pp.165-166.

[৫] বুদ্ধদেব বসু, *শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা* (কলকাতা:দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ,১৯৮৮),পৃ.৪

[৬] তদেব, পৃ. ৪-৫।

বুদ্ধদেবের কাছে রোমান্টিকতা ছিলো সাহিত্যচর্চার উদ্দীপ্ত প্রেরণা; যে-কারণে *কবিতা* পত্রিকার (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১,নজরুল-সংখ্যা)এক সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন:

> বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা—এ-সমস্ত জিনিশকে যাঁরা 'রোমান্টিক' ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখেন,তাঁদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা নিতান্তই অবৈধ।[৭]

যা কিছু সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে বা সাহিত্যচর্চার জন্যে ক্ষতিকর—তারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব ছিলেন সবসময়ই সোচ্চার। সাংবাদিকতার পেশাকে তিনি সবময়ই সাহিত্যচর্চার জন্যে ভীষণরকম ক্ষতিকর 'কাজ' বলে স্বীকার করে এসেছেন,যদিও তিনি নিজেও এই পেশায় যুক্ত ছিলেন। নরেশ গুহকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলছেন:

> সম্প্রতি আমি স্থির করেছি স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় লেখার কাজ ছেড়ে দেবো। ওতে ...আমার ভিতরের প্রভূত লোকশান হয়েছে...অথচ ছেড়ে দিলে সাংসারিক দিকে আপাতত ক্ষতির আশঙ্কা খুব।...সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু। সাবধান![৮]

সাংবাদিকতার পাশাপাশি দলীয়-রাজনীতির প্রতিও তাঁর ছিলো বিষম বিতৃষ্ণা;এর কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক আনুগত্য একজন লেখকের সাহিত্যবোধের স্বকীয়তাকে চরমভাবে বিনষ্ট করে। গত শতকের চল্লিশের দশকে যখন বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রগতি-পন্থার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতামত,বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিলো, তখনও বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজস্ব সাহিত্যানুচিন্তন থেকে সরে আসেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংঘাতময় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও তিনি তাঁর নিজস্বধর্মে অবিচল ছিলেন। অনুবর্তী সেই অস্থির সময়ের স্মৃতিচারণ করেছিলেন তিনি এইভাবে :

> নানা রঙের নিশেনের তলায় আশ্রয় নিলেন আমাদের খ্যাত এবং অখ্যাত অনেক কবি-সাহিত্যিক। যা ছিলো ধারণায় অতি উদার তা পরিণত হলো কঠিন এক-একটি মতবাদে;ঐ প্রগতি ব্যাপারটা হয়ে উঠলো একটি ট্রেডমার্ক...সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় তফাৎ ঘুচে গেলো। আমি আছি দর্শকের ভূমিকায় দূরে...অনেক অপব্যয় ও আবেগের অনেক ব্যর্থতা পেরিয়ে ধীরে ধীরে আমার অনুভূতি হলো যে সব গতি ও প্রগতি ও পতন ও বিতর্কের পরে অবশেষে কোনো-এক গভীর রাত্রে নিজের মধ্যে নিবিষ্টতা ভালো।[৯]

এখানে খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই কবি ইয়েটস্ (W.B.Yeats)-এর একটি কবিতার কথা আমাদের তখন মনে পড়ে;যেখানে তিনি বলেছিলেন:

---

[৭] *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা:২*, মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত (কলকাতা:প্যাপিরাস, ১৯৮৮), পৃ. ৭৪।

[৮] "বুদ্ধদেব বসুর চিঠি" *কলকাতা*, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা (কলকাতা: প্রতিভাস, ২০০২), পৃ. ১৯।

[৯] বুদ্ধদেব বসু, *আমাদের কবিতাভবন* (কলকাতা: বিকল্প প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৩১-৩২।

> I Think it better that in times like these
> A poet's mouth be silent,for in truth
> We have no gift to set a statesman right;
> He has had enough of meddling who can please
> A young girl in the indolence of her youth,
> Or an old man upon a winter's night.[10]

**প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্মিলন**

ইয়েটস্ যে-কারণে বলেছিলেন,যুদ্ধ বা হানাহানির সময় কবিদের জন্যে নিজেদের মুখ বন্ধ রাখাই উত্তম;সেই একই কারণে বুদ্ধদেব বসু, নিজের মধ্যে নিজেকেনিবিষ্ট রাখবার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কেননা,রাজনীতিকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন বা রাজনীতি যাঁরা পরিচালনা করেন,তাঁদেরকে সঠিক পথে চালাবার কোনো ক্ষমতা সাহিত্যিকদের নেই।কাজেই তাঁদের উচিত নিজের কাজ নিজের মতো করে করবার সামর্থ্য অর্জন করা। বুদ্ধদেব বসু কবিতার শক্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই এ-রকম ভাবতে পারতেন:

> কবিতা থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে না,চাঁদে যাবার যান তৈরি হবে না...কবিতা নিজেই মূর্ত,মূর্ত না-হলে সে কবিতাই হলো না।...স্বনির্ভর বলে,কবিতার একটু সুবিধে আছে;যেমন জগৎকে বদলাবার তার শক্তি নেই তেমনি অন্য কিছুও পারে না তার বিকার ঘটাতে;... যুগে-যুগে তার মৌল মহিমা প্রতিভাত হয়;অন্তত কোনো-কোনো অপ্রস্তুত পাঠক,প্রতি যুগে,হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে তাকে, যেন এইমাত্র কবিতার জন্ম হলো,তার আগে কিছুই ছিলো না।...তার সঙ্গে তর্ক চলে না,তা আমাদের উপযোগের অধীন নয়,আমাদের সেবা করে না সে,দখল ক'রে নেয়।[১১]

তার মানে ঠিক এইটিও নয় যে বুদ্ধদেব বসু প্রগতি-বিরোধী ছিলেন বা একেবারেই রাজনীতি-বিমুখ ছিলেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের বেলায়,বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে,তিনি কোনোরকম আপোষ করেননি। একইরকম আপোষহীন ছিলেন ব্যক্তি-মানুষের অধিকার সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রেও। কবির এই মানবিকবোধ কতোখানি তীব্র, গভীর ও বিস্তৃত ছিলো সেইটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যখন তিনি বলেন:

> সবচেয়ে ভালো...এমন কোনো ব্যবস্থা করা,যাতে আমরা নিজেদের বাঙালি বলে অনুভব করতে পারি...আর সর্বোপরি ভুলে না যাই যে আমরা মানুষ এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্রের কলে তৈরি পুতুল নই।[১২]

---

[১০] W.B. Yeats,"On Being Asked For A War Poem", *Collected Poems* (London: Macmillan, 1984), p.145.

[১১] বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ-সংকলন* (কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশনস, ১৯৯১), পৃ. ২৩৫।

[১২] তদেব, পৃ. ২২৫।

সেইসঙ্গে এই সত্যটিও তিনি চরমভাবে স্বীকার করতেন:

> মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে,এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই তার মনুষত্বের পরম অভিজ্ঞান।[১৩]

অভিজ্ঞানের সেই স্মারক-চিহ্ন পাবার আকুলতা থেকেই কবি বলেন:

ঋজু পথে আমাদের চলা। পিঁপড়ের কর্মঠ মিছিল
ব'য়ে চলে প্রকাণ্ড পোকার শব,শৈশব,যৌবন পার হয়ে;
এমনকি যুগ থেকে যুগান্তরে টেনে নেয় নথিপত্র,স্বাক্ষর,দলিল;

তাই ক্রমে বুড়ো হ'য়ে ঝ'রে পড়ে মানবের অগণ্য সন্ততি।
কিন্তু কেউ ফিরে যেতে চায় যদি,তার পথ তোমারই হৃদয়ে—
কেননা কেবল তুমি জানো সেই সূক্ষ্ম,বাঁকা,চেষ্টাহীন গতি।
(স্মৃতির প্রতি:২/ *যে-আঁধার আলোর অধিক* )

ফরাসি-কবি বোদলেয়ারের ধরনে তিনিও ব্যক্তি-মানুষের প্রগতিতে আস্থাশীল ছিলেন। যে-কারণে তাঁকে যা বলতে শুনি,তার অনেকটাই যেন,কবি বোদলেয়ারেরই কথার প্রতিধ্বনি:

> সত্যকার প্রগতির অর্থ নৈতিক প্রগতি,এবং তা সাধিত হতে পারে শুধু ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে।...কোনো সংঘবদ্ধ উপায়ে,কোনো সামাজিক প্রগতির দ্বারা তা সাধিত হতে পারে না,তা সম্ভব শুধু ব্যক্তির দ্বারা।[১৪]

অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু নিজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই— কী জীবনে, কী সাহিত্যে,ব্যক্তি-মানুষকেই তিনি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়:

> ব্যক্তিগতভাবে, প্রত্যেককে আলাদা ক'রে দেখলে,মানুষের মধ্যে...আমরা দেখতে পাই বুদ্ধির দীপ্তি,শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের আভাস,তার সংস্পর্শে পাই প্রাণের উজ্জীবন। কিন্তু যেখানে ভিড়,,যেখানে একই উদ্দেশ্যে–কি একই উদ্দেশ্যহীনতায়–অনেকে জড়ো হয়েছে,সেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে;সব মিলে শুধু একটা বিশাল মানবতার পিণ্ড যেন কোনো যান্ত্রিক কৌশলে নড়াচড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ক্লান্তি আসে।[১৫]

ব্যক্তিগতভাবেও বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন,কবিতা-নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা কবির জন্যে আশীর্বাদস্বরূপ। এইটি তো অস্বীকার উপায় নেই যে,শিল্প-সাহিত্য একান্তভাবেই ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব নির্মাণ। সম্মিলিতভাবে,জোট বেঁধে কবিতাচর্চা করা যায় না।সে-কারণেই বুদ্ধদেব বসু,কবির দিক থেকে, নির্জনতাকে,নিঃসঙ্গতাকে কবিতাচর্চার নিয়ামক শক্তি হিসেবে সবসময়ই

---

[১৩] বুদ্ধদেব বসু , *শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা*, পৃ. ২৩।

[১৪] তদেব, পৃ. ২০।

[১৫] বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ-সংকলন*, পৃ. ২৫৪।

বিবেচনা করেছেন। তাঁর বিবেচনায় নিঃসঙ্গতা কখনো-কখনো মানুষকে দুঃখ দেয় বটে; কিন্তু আবার সেইসঙ্গে তা বেঁচে থাকার অবসন্নতাটুকু দূর করে জীবনের মাধুর্যও যেন বাড়িয়ে দেয়। কবি যদি তাঁর নিঃসঙ্গতাকে সহ্য করতে পারেন,যদি তাকে সৃষ্টিশীলতায় অভিব্যক্ত করতে পারেন,তবে তাঁর কাব্যের ভাব-বিন্যাস পাঠকের জন্যে একাধারে চিত্তহারী, মনোগ্রাহী ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বুদ্ধদেব বসুর মতে নিঃসঙ্গতার মানে সঙ্গহীন, সঙ্গীহীন অবস্থা নয়; বরং মনকে একান্তভাবে নিবিষ্ট করবার উপায়কেও তিনি নিঃসঙ্গতা হিসেবে বিবেচনা করতেন। যে-কারণে নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সৃষ্টিশীলতার নিরন্তর প্রেরণা। আর তাঁর মতে, কবিতা হচ্ছে সেই সৃষ্টিশীল প্রেরণার শিল্পময় প্রকাশমাধ্যম। কবিতা রচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেখানে প্রেরণাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন;বিপরীত দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু প্রেরণায় ছিলেন বিশ্বাসী।

'সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রেরণার পাশাপাশি কবির নিঃসঙ্গতাকে, নিষ্ক্রিয়তাকে কবিতা-কর্মের জন্যে জরুরি উপাদান বিবেচনা করে বলেছিলেন:

> কবিরা তাঁদের নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গময় করে তুলতে পারেন,আবার মহানগরীর জনতার মধ্যে নির্জন হয়ে চলাফেরা করার কৌশলও তাঁদের জানা আছে।...কবিকর্মের এই ভূমিকার মধ্যে আমি...আর-একটা কথা যোগ করতে চাই: সেটা নিষ্ক্রিয়তা।...যে শক্তির নিজের ক্রিয়া নেই কিন্তু অন্যের ক্রিয়া গ্রহণের জন্য উন্মুখ,ঐ বিশেষণ তারও প্রতি প্রযোজ্য। এবং এই অবস্থাটা কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয়,কেননা তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বে নারীর অংশ নিয়ে থাকেন,ভাব-সত্তাকে গ্রহণ করেন,ধারণ করেন,জন্ম দেন—তার বীজ কোথা থেকে পড়ে কেউ জানে না। এইজন্যে মেয়েদের পক্ষে যেমন অন্তঃপুরের আড়াল,কবিদের পক্ষেও নিঃসঙ্গতার একটা আব্রু দরকার—দৃশ্যত সেটা সজনেই হোক বা বিজনেই হোক।[১৬]

বুদ্ধদেবের এই কাব্যানুচিন্তনের অসাধারণ কাব্যিক প্রকাশ দেখতে পাই "প্রকোষ্ঠ" শীর্ষক কবিতায়,যেখানে তিনি বলেছেন :

সব বিরেচক ব্যর্থ,কষ্ট তার অনুচ্চারণীয়।...
শুকনো জিভে স্বভাবত অসম্ভব কুটুম্বসুধা;
অতএব বন্ধুহীন,আত্মীয়ের ঈষৎ অপ্রিয়।
অথচ,সে বলে,এও নষ্ট নয়:তাকে ভগবান
প্রকোষ্ঠের আহ্নিক আসনে নাকি কদাচিৎ দেখা দিয়ে যান।
(*মরচে-পড়া পেরেকের গান*)

---

[১৬] বুদ্ধদেব বসু, *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ১৪।

শুধু একা বুদ্ধদেব বসুই নন, সৃষ্টিশীল কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-শিল্পী মাত্রেই নিসঙ্গতাকে, নির্জনতাকে উপভোগের চেষ্টা করেছেন, তাকে তাঁদের সৃষ্টিশীল কর্মের উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিৎশে(Friedrich Nietzsche)বলছেন:

> My humanity is a constant self-overcoming.But I need solitude—which is to say,recovery,return to myself,the breath of a free,light,playful air.[১৭]

রিলকে (Rainer Maria Rilke) এক তরুণ কবিকে (Franz Xaver Kappus) লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে বলেছিলেন:

> Love your solitude and bear with sweet-sounding lamentation the suffering it causes you.[১৮]

দেখা যাচ্ছে যে, শুধুই একাকীত্বকে নয়,পাশপাশি দুঃখকে ভালোবাসারও তাগিদ দিয়েছিলেন এই কবি। সেইসঙ্গে এইটিও বলতে ভোলেননি:

> Your solitude will be a hold and home for you even amid very unfamiliar conditions and from there you will find your ways.[১৯]

একজন তরুণ কবিকে প্রতিকূল পরিবেশে যা সবসময় সহায়তা করে,সেইটি হচ্ছে তার নিজস্ব একাকীত্বের বোধ। রিলকে গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন যে শিল্প সবসময়ই অন্তহীন একাকীত্বের ফলাফল। একমাত্র ভালোবাসা,আন্তরিকতাই পারে তাকে কোনো-না-কোনোভাবে স্পর্শ করতে। এই বিশ্বাস থেকেই রিলকের মতো কবি বলতে পারেন:

> Works of art are of an infinite loneliness and with nothing so little to be reached as with criticism.Only love can grasp and hold and be just toward them.Consider yourself and your feeling right every time with regard to every such argumentation,discussion or introduction;if you are wrong after all,the natural growth of your inner life will lead you slowly and with time to other insights.[২০]

মানের (Thomas Mann) বিখ্যাত নভেলার *(Death In Venice)* প্রধান চরিত্র মানবজীবনের নিঃসঙ্গতা,নির্জনতা সম্পর্কে তার নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেছে এইভাবে :

---

[১৭] Friedrich Nietzsche, *Ecco Homo*[trans. by Walter Kaufman],(New York: Vintage Books, 1989), p. 233.

[১৮] Rainer Maria Rilke, *Letters To A Young Poet* [trans. by M.D. Herter Norton], (New York: W.W.Norton ,1993), p. 39.

[১৯] Ibid, p. 40.

[২০] Ibid, p. 29.

> Solitude gives birth to the original in us,to beauty unfamiliar and perilous—to poetry.[২১]

আমরা বুঝতে পারি যে, নিঃসঙ্গতাকে বুদ্ধদেব বসু কখনো ভয় পাননি;বলা যায়, নিঃসঙ্গতা তাঁকে কখনোই ক্লান্ত,পীড়িত করতে পারেনি। কেননা, তাঁর জীবন ছিলো একজন বিশুদ্ধ কবির জীবন;যিনি সাহিত্যকে একধরনের ব্রত হিসেবে,নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই তিনি নিজের আত্মসচেতনতার বোধকে নিরন্তর খুঁজে চলেছিলেন—এইটি বুদ্ধদেবের স্বধর্ম। যে-কারণে বলেছিলেন:

> মনের গভীরতম স্তরে,আমরাও সুখ,শান্তি ও স্থিতির উপরে অন্য কিছুকে মূল্য দিয়ে থাকি,আমরাও চাই কোনো-এক পরম ও নামহীন সুখ,কোনো-এক চরম নামহীন দুঃখ; এবং যা আমরা জীবনে পাই না, কিংবা যা চাইবার সাহস হয় না আমাদের,সেইসব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই জীবনের বাইরে খুঁজে বেড়াই আমরা; কেউ ধর্মে,কেউ দর্শনে,কেউ সাহিত্যে। যারা নিছকভাবে বাঁধা রাস্তায় জীবন কাটায়,পায়ে-পায়ে সব নিয়ম মেনে চলে,বেআইনি,যুক্তিরহিত,অকথ্য ও অনির্বচনীয়ের দ্বারা কখনো ক্লান্ত হয় না,শুধু তাদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হলে সাহিত্যের কোনো প্রয়োজন থাকতো না।[২২]

বুদ্ধদেবের এই বক্তব্য থেকে,আমরা দ্বিধাহীনভাবে বুঝে নিতে সক্ষম হই যে, সাহিত্য,বিশেষভাবে কবিতা,তাঁর কাছে ছিলো এক স্বনির্ভর শিল্প-মাধ্যম;যা কিনা তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধের সঙ্গে ভীষণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তাঁর ভাষায়:এই সামঞ্জস্য মানেই সম্পূর্ণতা,তৃপ্তি।[২৩] সামঞ্জস্যের এই বোধ তাঁর মধ্যে ছিলো বলেই বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে,দার্শনিক মতবাদ থেকে সার্থক কবিতার ব্যবধানকে স্বীকার করে নিতে তাঁর এতোটুকুও বাধেনি;বরং এইটি স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব বসু একজন সচেতন কবির চৈতন্যকে, তাঁর আত্মজিজ্ঞাসাকে,আত্মোপলব্ধিকে এতোটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে পেরেছিলেন। বোদলেয়ারের মতো বুদ্ধদেব বসুও সে-কারণেই চেয়েছিলেন :

> মানুষ দুঃখী,কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী;মানুষ পাপী,কিন্তু সে জানুক সে পাপী;মানুষ রুগ্ন,কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন;মানুষ মুমূর্ষু,এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু;মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী,এবং সে জানুক সে অমৃতাক্ষী।[২৪]

---

[২১] Thomas Mann, "Death In Venice" , *The Thomas Mann Reader* [Edited by Joseph Warner Angell] (New York: Alfred A. Knopf, Inc.,1960), p.81.

[২২] বুদ্ধদেব বসু ,*সঙ্গ:নিঃসঙ্গতা:রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ৫৮।

[২৩] তদেব, পৃ. ১২।

[২৪] বুদ্ধদেব বসু,*শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, পৃ. ৩১।

তবে তিনি সেইসঙ্গে এইটিও বুঝতেন যে,নিজেকে বুঝতে পারা,নিজের চৈতন্যের দ্বারা নিজেকে পরিচালনা করা, সবসময় সব মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিশেষভাবে যারা, বুদ্ধদেব-কথিত 'বাঁধা রাস্ত্বায় জীবন কাটায়'—এই গভীর সত্যটি মেনে নিয়েই তিনি বলেছেন:

> সকলে জানবে না,জানতে পারবে না বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।[২৫]

এইভাবেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যচেতনাকে এক মানবীয় চৈতন্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দেখতে চেয়েছেন। এর পাশাপাশি এইটিও আমাদের মনে রাখা উচিত হবে যে : না-কবিতাকে, না-সেই চৈতন্যকে কবি কখনোই কোনো-একটি নির্দিষ্ট 'থিওরি' দ্বারা বিশ্লেষণ করতে চাননি। কেননা, কবিতা তাঁর কাছে ছিলো, বহুবাঞ্ছিত ও অতি দুর্লভ সামঞ্জস্যের প্রতিমূর্তি। এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি সার্থক কবিতার ভিতরে একইসঙ্গে মিশে থাকে একজন কবির চৈতন্য ও প্রচেষ্টা । সে-কারণে তিনি মনে করতেন:

> এমন কোনো থিওরি হতে পারে না,যা সব কবির বা সব কবিতার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।[২৬]

বুদ্ধদেবের মতো একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবির পক্ষে কোনো-একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বে কবিতাকে সমর্পণ করা ছিলো এক অসম্ভব ব্যাপার। তিনি গভীরভাবেই এইটি বিশ্বাস করতেন যে,কবিতা লেখার মানেই হচ্ছে শুদ্ধতমভাবে একজন কবির নিজেরই কাছে নিজের ফিরে আসা। আর এই ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত তাঁর আত্মোপলব্ধির অনির্বচনীয় আস্বাদন। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি কবিতায় এইভাবে বলতে পরেছেন:

> শুধু তা-ই পবিত্র ,যা অতি ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
> নরম,আচ্ছন্ন আলো;হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার
> লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার;
>
> তাই বলি,জগতেরে ছেড়ে দাও,যাক;সে যেখানে যাবে;
>
> হও ক্ষীণ,অলক্ষ্য,দুর্গম,আর পুলকে বধির।
>
> (রাত তিনটের সনেট:১/ *যে-আঁধার আলোর অধিক* )

কবির ক্ষেত্রে ,এই ব্যাপারটি কখনোই এমনি-এমনি বা আপনা থেকে ঘটে না। এর জন্যে কবিকে পরিশ্রম করতে হয়, প্রয়োজন হয় তাঁর অধ্যাবসায়ের । বুদ্ধদেবের মতে,একজন লেখকের জন্যে ধৈর্য ও পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আর কবিতা হচ্ছে, কবির 'সচেতন প্রয়াসের ফলাফল,এবং কিছুটা দৈবেরও দান'।[২৭] এখানে আমরা আরো-একটি বিষয় দেখতে পাই:সেইটি এই যে,কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু প্রেরণা এবং দৈবের উপর বিশ্বাস রেখেও পরিশ্রম,প্রযত্ন কিংবা নিরন্তর অধ্যাবসায়ের দিকটিকে একবারে উপেক্ষা করেননি। তাঁর মতে :

---

[২৫] তদেব, পৃ. ৩১।

[২৬] বুদ্ধদেব বসু, *কবিতার শত্রু ও মিত্র* (কলকাতা: এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৯৭), পৃ. ৩৮।

[২৭] তদেব,পৃ. ৪১।

> কবিতা লেখাটাও একটা কাজ—খাটুনির অর্থে,'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা'র অর্থে কাজ—আর তার জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হয়। কেমন করে প্রস্তুত হতে হবে তা অন্য কেউ বলে দিতে পারবে না, সেখানেও শুধু নিজেরই মন নির্ভর।[২৮]

এখানেও আমরা দেখতে পাই যে বুদ্ধদেব বসু কোনো 'নির্দিষ্ট থিওরি'-কে নয়,বরং কবির আত্মচৈতন্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন;তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেছেন কবির ব্যক্তি-চেতনাকেই। যা কিনা কবির নিয়তি-নির্বন্ধের পাশাপাশি তাঁর সচেতন উদ্যমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। পুরো ব্যাপারটিকে, বুদ্ধদেব বসু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণসহ,অত্যন্ত সহজভাবে বিবৃত করেছেন :

> কোনো-কোনো কবিতা লিখে উঠতে আমার সময় লেগেছে পাঁচ থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত। এই কথাটায় একটুও অত্যুক্তি নেই,কেননা 'লেখা' বলতে শুধূ কাগজের উপর কলম চালানোকেই বোঝায় না;আদি কল্পনা ও তৈরি লেখাটার মধ্যে,কোনো অজ্ঞাত কারণে,কখনো-কখনো মস্ত ব্যবধান ছড়িয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন,অনেক নতুন বিন্যাস ঘটে কবির জীবনে,অনেক আহরণ ও বর্জন ও সমন্বয়—কিন্তু সেগুলির সঙ্গে অলিখিত ও অপেক্ষমান কবিতাটির সম্পর্ক কী, কেমন ক'রে সেটিকে তা পুষ্টি দেয় ও জন্মের জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলে,সেই প্রক্রিয়াটি ঘটে সচেতন ও অচেতন মনের সীমান্তরেখায়—কবি তার কিছুটা মাত্র টের পান,বাকি অংশ অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন থাকে।[২৯]

## উপসংহার

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যানুচিন্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আহরণ ও বর্জন ও সমন্বয়ের যে-সূত্রটি বিস্তারিতভাবে বলতে চেয়েছেন, সেইটি কবিতার ক্ষেত্রে যেমন,তেমনি মানব জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।একজন আত্মসচেতন মানুষও একইভাবে আহরণ-বর্জন-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে। একজন কবির গড়ে-ওঠার সূত্রটিও অনেকটা তেমন। সেখানে এইসব গ্রহণ-বর্জনের পাশাপশি প্রস্তুতির যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে প্রতিভা আর কঠোর পরিশ্রমের । বুদ্ধদেব বসু মনে-প্রাণে এইটি বিশ্বাস করতেন যে পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রতিভা,কবিতা-নির্মাণের ক্ষেত্রে, একেবারেই মূল্যহীন। বলা যায়,এইভাবেই জীবনকে কবিতার সঙ্গে,কবিতাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কোনোকিছুকেই শুধু বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং সমগ্রতার মধ্যে দিয়ে সামঞ্জস্য নির্মাণের চেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি। যে-সমগ্রতার মূল উৎস ছিলো তাঁর স্বদেশ,স্বদেশের সংস্কৃতি আর তার ঐতিহ্য; যে-ঐতিহ্য তাঁর চেতনায় আত্মোপলব্ধির পাশাপশি আত্মজিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে।এই আত্মোপলব্ধি, এই আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই

---

[২৮] তদেব,পৃ. ৩৪।

[২৯] তদেব,পৃ.৪৩

আলোকিত হয়েছে এমন একজন কবির নিজস্ব চৈতন্য। যে-কবির কাছে জীবন ও কবিতা ছিলো সমার্থক; বলতে পারি,একই চৈতন্যের নানারকম প্রসারণ। যিনি বিশ্বাস করতেন, কবিতার পক্ষেই মানব-জীবনের যাবতীয় অসাঞ্জস্যকে, বিরোধকে একটি সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে বিস্তার ঘটানো সম্ভব। যে-সামঞ্জস্যের মানে হচ্ছে—মানব-জীবনে সম্পূর্ণতার একটি বোধ নির্মাণ করা,সম্পূর্ণতার একটি ক্ষেত্র তৈরি করা। সেইসঙ্গে আমরা এইটিও বুঝে নিতে সক্ষম হই যে, বুদ্ধদেব বসুর মানসতা ছিলো জীবনের শ্রেয়োবোধের দিকে।যে-শ্রেয়োবোধের কাব্যিক প্রকাশ ছিলো আধুনিক কবিতার নতুন জগৎ নির্মাণের প্রচেষ্টায়;যে-কবিতা আধুনিক হয়েও চিরকালীন। এখানেই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচিন্তার স্বকীয় বিশিষ্টতা।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ প্রসঙ্গ

সরিফা সালোয়া ডিনা*

**Abstract:** In literary term myth is a story which is not true but truth lies inside the story. It is a term of complex history and meaning and is a means to communicate with history and culture. This is why myth is largely used in modern literature. Myth makes a literature comprehensible and makes the hidden truth out. Shamsur Rahman's use of myth in his poetry shows this fact. Rahman uses western and eastern myth such as Greek and Indian in a superb way. His myth is mixed with the contemporary social condition–man's fight for power, establishment, his feelings and emotions and so on. In his poems western mythical figures like Telemachus, Daedalus, Samson, Icarus, Electra, Achilles and Indian figures and stories like Chand Saudagar, Marich, Khandabdahan, Jatugriha, Kalkut, Valmiki, Dhritarastra, Draupadi, Shikhandi, etc. have been used. All such use of myths has enriched Rahman's poetic creations.

## প্রাক্কথা

'রূপে-রসে উজ্জ্বল ও বিচিত্র' আধুনিক বাংলা কবিতার যাত্রা শুরু তিরিশ ও তিরিশোত্তর কালে। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখের কবিতায় তিরিশের যে নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছিল তার পরিবর্তিত ধারাক্রম সূচিত হয়েছিল চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশের দশকে; বাংলাদেশের শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) কবিতায়। বৈচিত্র্য ও আত্মানুসন্ধানের জটিল পথ পরিভ্রমণে শামসুর রাহমান প্রত্যক্ষ করেছেন পৃথিবীব্যাপী প্রবল নেতির উত্থান, যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়, মারী-মন্বন্তর, স্বাধিকার-স্বাধীনতা, উৎপীড়ন-নৃশংসতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। পৃথিবীতে সৃষ্ট এসব নেতি থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেননি বরং তা উপলব্ধির বন্ধনে বেঁধে বদলে ফেলেছেন কাব্য প্রকরণ—কাব্যশরীর, ভাষা-ছন্দ-শিল্পকৌশল। এই পরিবর্তিত শিল্পকৌশল ও কাব্যভাবনার কারণেই শামসুর রাহমান আজ তিরিশি উত্তরাধিকার-শ্রেষ্ঠ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও প্রগতিশীল কবি শামসুর রাহমান মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত। দীর্ঘ সময়ের কাব্যচর্চায় তাঁর কবিতা বৈচিত্র্যময় বিষয়াবলির সমাবেশে ঋদ্ধ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিটি সংগ্রাম, সমকালীন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উত্তুঙ্গ ঘটনা নিজস্ব মহিমায় তাঁর কবিতায় উপস্থাপিত। সে কারণে বলা চলে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শামসুর রাহমান ক্রমশ অন্তর্জীবন ও আত্মমগ্নতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে হতে পেরেছিলেন সমাজমুখী, সামষ্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এমনকি সামষ্টিকবোধে উত্তরিত হয়ে তিনি সমাজবিমুখ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। এসব বিষয় প্রকাশে তাঁর ভাষার পরিচর্যা ছিল উল্লেখযোগ্য

---

* ড. সরিফা সালোয়া ডিনা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মাত্রায় লক্ষণীয়। ভাষা ও বিষয় পরিচর্যা করতে গিয়ে নগরমনস্ক কবি শামসুর রাহমান কাব্যে সংযোজন করেছেন প্রতীক-উপমা-চিত্রকল্প। এসবের ধারাক্রমে 'মিথ' বা পুরাণ প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে অভিনব ও যথার্থ শিল্পশৈলীতে চর্চিত ও পরিচর্যিত।

### মিথের সংজ্ঞার্থ

মিথ (Myth) শব্দটি মূল গ্রীক শব্দ মুথোস (Muthos) থেকে আহৃত। সাহিত্যের পরিভাষায় মিথ এমন এক কল্পকাহিনী—যাতে সত্য অন্তর্নিহিত। এটি একটি সামষ্টিক অভিধা, সমাজ-সংস্কৃতির মৌল উপাদান এবং সমাজ-ইতিহাস ও সংস্কৃতিগত যোগাযোগের অন্যতম উপায়। মিথ একটি জাতির কল্পনাসৃষ্টিতে যেমন সক্রিয় থাকে, তেমনি মানুষের জ্ঞানের ব্যাখ্যায় থাকে সজীব-অনুভূতিশীল। প্রাচীনকাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবহমান কাহিনী, বিশেষ কোনো জাতির আদি ইতিহাস ও এ সম্পর্কিত ধারণা এবং নৈসর্গিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-অতিকথা-কাল্পনিক বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে ধারণা মিথ বহন করে।

> In classical Greek, "mythos" signified any story or plot, whether true or invented. In its central modern significance, however, a myth is one story in a mythology – a system of hereditary stories which were once believed to be true by a particular cultural group, and which served to explain (in terms of the intentions and actions of deties and other super natural beings) why the world is as it is and things happen as they do, to provide a rationale for social customs and observances, and to establish the sanctions for the rules by which people conduct their lives.[১]

বলা যায়, মানবজীবনের আত্মিক অমিত সম্ভাবনার সংকেত চাবি মিথ।

### মিথের স্বরূপ

প্রধান মিথতাত্ত্বিক জোসেফ ক্যাম্পবেল মিথের কাজকে অতীন্দ্রিয় কাজ, মহাজাগতিক মাত্রা, সমাজতাত্ত্বিক ও যুক্তিতর্ক বিষয়ক প্রভৃতি চারটি ধরনে উল্লেখ করেছেন। এক. পৃথিবী বিস্ময়কর, ব্যক্তিও বিস্ময়কর—এ রহস্য উপলব্ধিতে ব্যক্তির ভেতরে সঞ্চারিত হয় ভীতি-শিহরন। এটাই মিথের অতীন্দ্রিয় কাজ। দুই. ব্রহ্মাণ্ডের রূপ পরিস্ফুট করতে বিজ্ঞান এমন সব উপায় অবলম্বন করে যাতে আরো রহস্য সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর না থাকায় মিথ হয়ে ওঠে সবটা বলার মূল অবলম্বন। তিন. কোনো বিশেষ সামাজিক নিয়মকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মিথ স্থানভেদে বিভিন্ন রকম। বর্তমান বিশ্বে মিথের এই সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা ভীষণ জনপ্রিয়। চার. কিভাবে যে-কোনো পরিস্থিতিতে মানবিক জীবনযাপন করতে হয় – মিথ তা শিক্ষা দেয়।[২]

---

১. M.H. ABRAMS, *A Glossary of Literary Tearms* (INDIA : Prism Book PVT Ltd., sixth edition, 1993), P:121-122

২. জোসেফ ক্যাম্পবেল, *মিথের শক্তি* (খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত) (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃঃ বিস্তারিত পাঠের জন্য ৩৮-৩৯

এসব বিবেচনায় শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ প্রসঙ্গটি বিবেচ্য। শামসুর রাহমানের মিথচেতনা তাঁর সমকালের প্রতিবেশ-পৃথিবীর চেতনালগ্ন। জাতিসত্তার গভীরে মানবিকবোধের উজ্জ্বলতায়, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার সূত্রে, প্রেমচেতনা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি মিথকে গ্রথিত করেন সমকালসূত্রে। মিথ যে যোগাযোগের অন্যতম উপায়, প্রত্যেক সমাজের সাংস্কৃতিক মৌল উপাদান থেকে তা স্পষ্ট হয়। শামসুর রাহমানের কাব্যে মিথের ব্যবহার তারই পরিচয়বাহী। তাঁর কবিতায় পাশ্চাত্য-প্রাচ্য তথা গ্রীক মিথ ও ভারতীয় পুরাণের সর্বোত্তম ব্যবহার লক্ষণীয়।

## শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ

কবিতার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জটিল বাতাবরণে শামসুর রাহমান যে আঙ্গিক সৌন্দর্য নির্মাণ করেন তাই চিনিয়ে দেয় তাঁর রচনার ক্রিয়া—কৌশল। এ কারণে তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে প্রতীকী আধারে। এসব প্রতীক-উপমা-চিত্রকল্প শব্দের অর্থের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে প্রায়শ জায়গা করে নিয়েছে বিস্তৃত পরিসরে। বলা যায়, বিষয়ও প্রতীকায়িত হয়েছে বারংবার শামসুর রাহমানের কবিতায়। এসব ক্ষেত্রে মিথের প্রতীকায়ন সবচেয়ে সফল। শামসুর রাহমান সচেতনভাবে ও গভীর অভিনিবেশে তাঁর কবিতায় মিথের ব্যবহার ঘটিয়েছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০) থেকে শেষাবধি তার সচেতন বহিঃপ্রকাশ। মিথের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও বর্তমান কালের যে যোগসূত্র বা সেতু তৈরি হয় তার আলোকেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলতে পারেন কালজ্ঞান ভিন্ন কবির গত্যন্তর নেই। শামসুর রাহমানও এর ব্যতিক্রম নন। যদিও *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থে কবি উচ্চারণ করেন:

> আমাকে জড়ায় সত্য, অর্ধসত্য কিংবা প্রবচন,
> তবু জানি কিছুতে মজে না মন বাতিল পুরাণে।
>
> ('পুরাণ'/*বিধ্বস্ত নীলিমা*)

উচ্চারণ সত্ত্বেও কবি বার বার মিথ বা পুরাণে আশ্রয় খুঁজেছেন। তাঁর কাব্যালোচনায় তা স্পষ্ট হয়। তবে প্রতীচ্য পুরাণ ব্যবহারেই তিনি অধিক সিদ্ধহস্ত। তাই ভারতীয় পুরাণের ব্যাপক ব্যবহারে না গিয়ে গ্রীক মিথের শরণাপন্ন হয়েছেন কবি শামসুর রাহমান। গ্রীক মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেন সদর্প বক্তব্য। যেমন:

> রাত্রির পীড়নে উড়ে উন্মথিত আমি নক্ষত্রের ঝড়ের মতো
> শব্দপুঞ্জ থেকে ছিঁড়ে আনি কবিতার অবিশ্বাস্য শরীর
> —সৌন্দর্যের মতো রহস্য-ঢাকা, নগ্ন আর উন্মীলিত।
>
> আমার সেই নির্মাণে মাননীয় পক্বকেশ পণ্ডিত
> হন্তদন্ত হয়ে খোঁজেন গ্রীক পুরাণের উল্লেখ,
>
> ('কাব্যতত্ত্ব'/ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

## শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রতীচ্য মিথ

*নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের 'টেলেমেকাস' কবিতায় উত্থাপিত হয়েছে গ্রীক মিথের টেলেমেকাসের সম্পূর্ণ কাহিনী। কবিতা-শরীরে স্থান পেয়েছে পিতার জন্য টেলেমেকাসের হাহাকার-অপেক্ষা। এ অপেক্ষার যেন শেষ নেই। টেলেমেকাস অসহায়, পিতার দীর্ঘ

অনুপস্থিতিতে জননী জন্মভূমি বর্বর হায়েনার দখলে নিষ্পেষিত। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ইথাকা নগরী বিধ্বস্ত, অথচ অপেক্ষমাণ, বর্বরদের আক্রমণে বাসগৃহ তছনছ, খাদ্য-ভাণ্ডারে সংকট। সে কারণে বর্ণিল মানসিক প্রস্তুতিতে ইথাকা নগরী তথা টেলেমেকাস প্রস্তুত, শক্তিমান বীরযোদ্ধা পিতা অডিসিউসের আগমনের অপেক্ষায়:

> ইথাকায় রাখলে পা দেখতে পাবে রয়েছি দাঁড়িয়ে
> দরজা আগলে, পিতা, অধীর তোমারই প্রতীক্ষায়।
> এখনো কি ঝঞ্ঝাহত জাহাজের মাস্তুল তোমার
> বন্দরে যাবে না দেখা? অস্ত্রাগারে নেবে না আয়ুধ
> আবার অভিজ্ঞ হাতে? তুলবে না ধনুকে টঙ্কার?

('টেলেমেকাস'/*নিরালোকে দিব্যরথ*)

মিথের ব্যাখ্যানুযায়ী বলা যায়, টেলেমেকাস অডিসিউস ও পেনিলোপীর পুত্র। অডিসিউস তার শিশুপুত্র টেলেমেকাসের প্রতি মায়াবশত ট্রয়যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে কৌশলের আশ্রয় নিলেও তিনি ব্যর্থ হন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধশেষে অনেক ঘটন-অঘটনের পর নিজ দেশ ইথাকায় ফেরার কিছুকাল পরেই অপর পুত্র টেলেগোনাসের হাতে নিহত হন। গ্রীক পুরাণের অন্যতম সাহসী বীর, কৌশলী, বাগ্মী অডিসিউসের পুত্র টেলেমেকাস হোমারের অডিসি মহাকাব্যে কাহিনীর শুরুতে বীর কৌশলী নয় বরং ভীরু ও সরল প্রকৃতির যুবক হিসেবে চিহ্নিত; কাহিনীর শেষে সে পিতা অডিসিউসের মতোই বীর্যবান যুবক রূপে চিহ্নিত ও অভিষিক্ত। এই মিথ-কথার সামান্য অংশ 'টেলেমেকাস' কবিতায় উপস্থাপিত হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পিতৃহীন পুত্রের অসহায়ত্ব ও বিদেশি বর্বর দখলকারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এ কবিতার প্রাণ। 'টেলেমেকাস' ১৯৬৮-র অবরুদ্ধ ও সংক্ষুব্ধ বাংলার মাটি থেকে জন্মলাভ করা কবিতা, যদিও তিনি স্বদেশের মুখমণ্ডলে পাশ্চাত্য পুরাণের শিল্পিত মুখোশ পরিয়ে দিয়েছেন। এ মুখোশ পরিধান সম্ভবত শিল্প পরিচর্যা ও আত্ম-রক্ষার্থে, তবু কবিতাটির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সমকালীন বাংলাদেশের থমথমে পরিস্থিতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। তৎকালীন বাংলায় অনেক স্বদেশ-কেন্দ্রিক তথা দেশাত্মবোধক কবিতা রচিত হয়েছে, এ কবিতাটির মতো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবিতা আর তেমন নেই।[৩] কবির ভাষায় বীরের অবর্তমানে ইথাকা ও বাংলাদেশের পরিণতি এক; যেন দেশ দুটি একই দেশে পরিণত হয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা টেলেমেকাসরূপী স্বয়ং কবির।

*দুঃসময়ে মুখোমুখি* (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের 'স্যামসন' কবিতাতেও স্যামসনের জবানিতে কবির ক্রোধোদ্দীপ্ত বক্তব্য প্রকাশিত। শাসকের অত্যাচারে স্যামসন বন্দি, তার চক্ষু উৎপাটিত, কেশরাজি কর্তিত। তবুও সে দুর্দমনীয়, একদিন অবশ্যই সে পুনরুদ্ধার করবে তার স্বদেশ। গ্রীক মিথে স্যামসনকে উল্লেখ করা হয়েছে Dililah shore that of Samson কিংবা Blinded Tyrian Sun-hero Samson রূপে।[৪] সূর্য-সন্তানের কেশর কেটে তাকে ক্ষমতাহীন করে বন্দি করা হয়েছে। কিন্তু টেলেমেকাসের মতোই অপেক্ষমাণ স্যামসন আশাবাদী, একদিন তার সুদিন ফিরে আসবে। এ কবিতাতে শামসুর রাহমান স্যামসন মিথকে স্বদেশের পটভূমিতে স্থাপন করেছেন।

---

৩. হুমায়ুন আজাদ, *নিঃসঙ্গ শেরপা* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃ. ৭৯।

8. Robert Graves, *Greek Myths* (London: Cassell & Company, 1995), pp. 568, 610.

ক্ষমতাবলে জঙ্গী হে প্রভুরা ভেবেছো তোমরা,
তোমাদের হোমরা চোমরা
সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন?
...  ....  ....  ...
...  ....  ....  রক্তারক্তি
যতই কর না আজ, ত্রাসের বিস্তার
করুক যতই পাত্র-মিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।
...  ....  ....  ...
আমার দুরন্ত কেশরাজি পুনরায় যাবে বেড়ে,
ঘাড়ের প্রান্তর বেয়ে নামবে দুর্দমনীয়, তেড়ে—
আসা নেকড়ের মতো। তখন সুরম্য প্রাসাদের সব স্তম্ভ
ফেলবে উপড়ে, দেখো কদলী বৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের, সুনিশ্চিত করবো লোপাট
সৈন্য আর দাস-দাসী-অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।

('স্যামসন'/*দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

এ কবিতায় শাসকের নিপীড়নজাত এক বিদ্রোহী সত্তার উত্থান ঘটেছে। শামসুর রাহমানের এ কবিতায় স্বদেশ অবরুদ্ধ, স্বদেশবাসী বন্দি কিন্তু অন্তর্জ্বালায় রক্তাক্ত ও সংক্ষুব্ধ—বিস্ফোরণের অপেক্ষারত। বলা চলে, সমকালীন স্বদেশ-বাস্তবতা কবিতাটিতে সঞ্চারিত।

*বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* (১৯৭৭) কাব্যের 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি' কবিতায় কবি মূলত নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন মিথের আশ্রয়ে। এখানে মনোচারী কবি একবার বাস্তবে আরেকবার পরাবাস্তব জগতে পরিভ্রমণ করেছেন। কবির আকাঙ্ক্ষা বস্তুজগতে রূপ লাভ করে না। তাঁর অক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে রাত্রির সম্বোধনে। অসহায়ত্বও প্রকাশিত হয়েছে। গ্রীক পুরাণে প্রেম ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আফ্রোদিতির জন্ম সমুদ্রের ফেনা বা আফ্রোস থেকে। সে প্যারিসকে হেলেন অপহরণে সহায়তা করে। এর ফলে গ্রীকবাহিনী কর্তৃক হেলেন উদ্ধারে ট্রয়-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দশ বছরব্যাপী স্থায়ী যুদ্ধে আহত প্যারিস পরবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ যুদ্ধে দেবী আফ্রোদিতি প্যারিসকে উদ্ধার করতে গিয়ে আহতও হন। গ্রীক বীর ডায়োমিডিসের অস্ত্রাঘাতে আহত দেবীকে শামসুর রাহমান আখ্যা দিয়েছেন 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি'। কবির ব্যক্তিক বোধ-অক্ষমতা-অসহায়ত্বের প্রতীকী রূপায়ণ 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি' কবিতাটি। কবির ভাষায়:

ঘর কি সমুদ্র হ'তে পারে? নইলে কী ক'রে সেখানে
সহজেই আফ্রোদিতি আসে তার সমস্ত শরীরে
স্বপ্নের মতন ফেনা নিয়ে? যখন সে এলো ভেসে,
ঘরের দেয়াল মুছে গেলো ; গেলো উবে আসবাব।
...  ...  ...  ...
হে নিশীথ, আজ আমি কিছুই করতে পারবো না।

আমার মগজে ফণীমনসার বন বেড়ে ওঠে,—
দেখি আমি পড়ে আছি যুদ্ধধ্বস্ত পথে কী একাকী;
ভীষণ আহত আমি, নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি।

('নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি'/*বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*)

প্রতীকায়নেও কবিতাটি ঋদ্ধ। সদ্য স্বাধীন আফ্রোদিতি স্বরূপা কবির স্বদেশ তথা বাংলাদেশ সমকালীন সামরিক স্বৈরতন্ত্রে ধ্বস্ত—কবিতাটি এ বার্তার সার্থক বাহক।

*ইকারুসের আকাশ* (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় গ্রীক মিথ বা প্রতীচ্য পুরাণের প্রকাশ ঘটেছে। 'ইকারুসের আকাশ', 'ইলেকট্রার গান', 'ডেডেলাস' প্রভৃতি কবিতা বহন করছে গ্রীক মিথের প্রতীক-উপমা। এ গ্রন্থের নাম-কবিতা 'ইকারুসের আকাশ'–এ গ্রীক মিথের ভাব-গম্ভীর প্রতীকে ও সংহত উপস্থাপনে কবি আত্ম-উন্মোচন করেন। ব্যক্তির মহিমা কিংবা দুঃখময় পরিণতির তারুণ্যদীপ্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ এ কবিতা। গ্রীক মিথে ডেডেলাসের পুত্র ইকারুস পিতৃ-নির্মিত মোম লাগানো ডানায় ভর করে বন্দিত্ব মোচনের লক্ষ্যে পালাতে গিয়ে পিতৃ-আদেশ অমান্য করে। খুব উঁচু দিয়ে সূর্যের কাছাকাছি ওড়ার সময়ে সূর্যতাপে ডানার মোম গলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইকারুস। ইকারুসের উঁচুতে ওড়ার আনন্দের কারণ ও বিষাদময় পরিণতি কবি ব্যাখ্যা করেছেন এ কবিতায়। ইকারুসের আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ ও তারুণ্যের স্পর্ধা কবি-চেতনায় লীন। যেমন:

... ... ... ...
পালকের ভাঁজে ভাঁজে সর্বনাশ নিতেছে নিশ্বাস
জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার, যদি আমি এড়িয়ে ঝুঁকির আঁচ
নিরাপদ নিচে উড়ে উড়ে গন্তব্যে যেতাম পৌঁছে
তবে কি পেতাম এই অমরত্বময় শিহরন?
তবে কি আমার নাম স্মৃতির মতন
কখনো উঠতো বেজে রৌদ্রময় পথে জ্যোৎস্নালোকে
চারণের নৈসর্গিক, স্বপ্নজীবী সান্দ্র উচ্চারণে?

('ইকারুসের আকাশ'/*ইকারুসের আকাশ*)

ইকারুসের আত্মবলিদান মৃত্যুকে নির্দেশ করলেও তা রোমান্টিকতায় পর্যবসিত, তারুণ্যের প্রাণোন্মাদনায় ঝলমল ইকারুস কবিরই আত্মপ্রতিকৃতি যেন। একই চিত্র 'ডেডেলাস' কবিতায় পাওয়া যায়। ডেডেলাস মৃত পুত্রের জন্য হাহাকার করলেও শুধুমাত্র বিলাপ নয় ; সে সম্মান জানিয়েছে পুত্র ইকারুসের স্বাধীন সত্তাকে। ডেডেলাস শিল্পী, সাবধানীও বটে। কুশলী, উদ্ভাবনী কারিগরী খ্যাতি বন্দিত্ব মোচনে সে কাজে লাগায়, কৃত্রিম ডানা তৈরি করে পুত্রসহ পালায়। পিতার সাবধানবাণী উপেক্ষা করে সূর্যের কাছাকাছি ওড়ার আনন্দে বিভোর ইকারুসের মৃত্যু অনুভব করে ডেডেলাস পরম মমতায়। এ কবিতাতেও ডেডেলাস ও কবি শামসুর রাহমান একাত্ম। ডেডেলাস কবিতাটি তারুণ্যের জয়গান ও শিল্পের নান্দনিকতায় উচ্চকিত। যেমন:

কিন্তু সে তরুণ, চটপটে, ঝকঝকে, ব্যগ্র, অস্থির, উজ্জ্বল,
যখন মেললো পাখা আমার শিল্পীর ভরসায়,

গলো উড়ে উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে, বহুদূরে,
সূর্যের অনেক কাছে প্রকৃত শিল্পের মতো সব
বাধা, সতর্কতা
নিমেষে পেছনে ফেলে, আমি
শঙ্কিত অথচ মুগ্ধ রইলাম চেয়ে
তার দিকে, দেখলাম তাকে
পরিণাম বিষয়ে কেমন
উদাসীন, ক্রূর, রৌদ্রঝলসিত, সাহসী, স্বাধীন।

('ডেডেলাস'/*ইকারুসের আকাশ*)

এ কাব্যগ্রন্থের 'ইলেকট্রার গান' কবিতায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ক্রোধের প্রচণ্ডতা প্রকাশিত। এ কবিতাটিও 'টেলেমেকাস' কিংবা 'স্যামসনে'র মতো স্বদেশভূমিতে সংস্থাপিত। ইলেকট্রা যেন কবি, পিতা আগামেমনন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কের প্রতিভূ এবং মাইসিনি বাংলাদেশ রূপে কবিতাটিতে প্রতিভাসিত। গ্রীক মিথ অনুসারে ইলেকট্রা আগামেমননের কন্যা। আগামেমননের ট্রয়-যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে তার স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রা এজিস্থাসের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং দুজনে চক্রান্ত করে আগামেমননকে হত্যা করে। প্রাপ্তবয়স্ক ইলেকট্রা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে ভাই ওরেস্টেসের মাধ্যমে। ওরেস্টেসকে সহায়তা করে তার বন্ধু পাইলেডিস, পরে সে ইলেকট্রাকে বিয়ে করে। ইলেকট্রা প্রতিবাদী ও সাহসী চরিত্র। নিজগৃহে পিতৃহত্যার বেদনা-কান্না-আকুলতা 'ইলেকট্রার গান' কবিতায় প্রকাশিত। যেমনঃ

সেইদিন আজো জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।
বিদেশী মাটিতে ঝরেনি রক্ত; নিজ বাসভূমে,
নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাঁকে সহসা হেনেছে ওরা।

('ইলেকট্রার গান'/*ইকারুসের আকাশ*)

উপর্যুক্ত চরণগুলো স্পষ্ট করে তোলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ। সদ্য মুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাবলি এ কবিতার বক্তব্যে স্পষ্ট। যেমনঃ

আড়ালে বিলাপ করি একা একা, ক্ষতার্ত পিতা
তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।
এমন কি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ, তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়!

('ইলেকট্রার গান'/*ইকারুসের আকাশ*)

আগামেমননের কাহিনী যথার্থভাবে সংযোজিত ও প্রতীকায়িত হয়েছে বাংলাদেশের সমকাল-ঘটনাপুঞ্জ বিধৃত ইলেক্ট্রার গান কবিতায়। তবে কবি আশাবাদী, হতাশ্বাসে ডুবন্ত নন, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষমাণ।

সমকালিক যাত্রায় *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই* (১৯৮৫) কাব্যের 'এ্যাকিলিসের গোড়ালি' কবিতাটি একটু ভিন্ন। কবিতাটির নামকরণেই একিলিসের গোড়ালির মর্মকথা প্রতিভাসিত। গ্রীক মিথে বলা হয়েছে আয়োলকাসের রাজা পেলেউস ও সাগরপরী থেটিসের পুত্র একিলিস। থেটিস পুত্রকে আঘাতের অসাধ্য বীরে পরিণত করার নিমিত্তে স্টিক্স নদীতে ডুবিয়ে নেন কিন্তু অসতর্কতাবশত একিলিসের গোড়ালির টেনডন ভিজতে পারেনি। ফলে টেনডনে আঘাতসাধ্য একিলিস ট্রয়-যুদ্ধে প্যারিসের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। 'এ্যাকিলিসের গোড়ালি' কবিতায় এই মিথটি কবি গ্রহণ করেছেন ব্যক্তির প্রতীকায়নে। নিজের সাথে একাত্ম করেছেন একিলিসকে। চুয়ান্ন বছরের কবির স্বাস্থ্য ভালো, তারুণ্যের কবি রূপে পরিচিত, হজমশক্তির ব্যাঘাত ঘটে না তবুও যম ভ্রূকুটি হানে, যে কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে খুঁজে পেতে চায় কবির অস্তিত্বরূপী একিলিসের গোড়ালি। যেমন :

... ... ... ... যম
অসৌজন্যমূলক ভ্রূকুটি হেনে ঈশ্বরের স্তব্ধতার মতো
প্রাচীনতা নিয়ে হাসে, করে পায়চারী ইতস্ততঃ
ঈগলদৃষ্টিতে খোঁজে খালি
আমার ধ্বস্ত এ-অস্তিত্বের এ্যাকিলিসের গোড়ালি।
('এ্যাকিলিসের গোড়ালি'/*ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই*)

*হোমারের স্বপ্নময় হাত* (১৯৮৫) কাব্যের নাম কবিতাতেও কবির ব্যক্তিক চিন্তা প্রাতিস্বিকতা লাভ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর গ্রীক কবি হোমারের অমর সৃষ্টি *ইলিয়াড* ও *অডিসি*। হোমার সম্পর্কে প্রচুর মিথকথা প্রচলিত। যেমন, তাঁর জন্মভূমি হিসেবে সাতটি স্থানের নাম উল্লিখিত হয়, তিনি রাজকাহিনী রচনা করলেও জন্ম সম্ভবত নিম্নবিত্ত পরিবারে। শেষজীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। হোমার নামের একাধিক কবির উপস্থিতি এবং স্তোত্রমালা রচয়িতা হিসেবে হোমারের নামের প্রচলন। তবে ঐতিহাসিক হেরোডোটাস উল্লেখ করেন হোমারের শেষজীবনে অন্ধত্বের কথা, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল তাদের রচনায় উল্লেখ করেন হোমারের কাব্যরীতির অসাধারণত্বের কথা। 'হোমারের স্বপ্নময় হাত' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে কবির মনোচারী স্বভাব, বাস্তবতা-পরাবাস্তবতার যোগসূত্রে স্বপ্নলোকের আবহ এখানে প্রকট। আত্মকথন প্রায় স্বপ্নকথনে পরিণত এ কবিতায়। কবির লেখকসত্তার বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতাবোধ স্বপ্নাক্রান্ত। কবির আকাঙ্ক্ষা—তিনি কাব্য সৃষ্টি করতে চাইলেই গ্রীকপুরাণের আদিকবি হোমারের স্বপ্নকল্পনাময় হাত প্রসারিত হবে। উদাহরণ:

... ... ... এখন আমি নিজেকে
স্পর্শ করলে আমার ভেতর থেকে শত শত ময়ূর
বেরিয়ে এসে পেখম ছড়িয়ে দেবে উঠোন জুড়ে। যদি এখন
আমি খাতার শাদা পাতা স্পর্শ করি, তা'হলে সেখানে
বইবে অলকানন্দা, গড়ে উঠবে আর্ডেনের বন, লতাগুল্মে
ঝলসে উঠবে হোমারের স্বপ্নময় হাত।
('হোমারের স্বপ্নময় হাত'/*হোমারের স্বপ্নময় হাত*)

গ্রীক মিথের এমন যথোপযুক্ত ব্যবহার শামসুর রাহমানের কাব্যসুষমা বৃদ্ধি করেছে এবং বক্তব্য-বিষয় প্রকাশে সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণতা দান করেছে। সর্বোপরি বিশ্বসাহিত্যের আসরেও সৃষ্টি করেছে নন্দনতাত্ত্বিক জীবনবোধ।

## শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রাচ্য মিথ

গ্রীক মিথ বা প্রতীচ্য পুরাণ ব্যবহারে শামসুর রাহমান স্বচ্ছন্দ; প্রাচ্য পুরাণ ব্যবহারেও তিনি ঈর্ষণীয়। বহুল না হলেও তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা ধারণ করেছে প্রাচ্য তথা ভারতীয় মিথ-পুরাণ। প্রসঙ্গত ভারতীয় মিথের প্রযত্ন-পরিচর্যা সহজ সরল। দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের বিকাশ-অগ্রগতির সাথে এদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। বলা চলে, জীবনাচরণের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে ভারতীয় মিথের সংযোগ ঘটলেও গ্রীক বা পাশ্চাত্য বা প্রতীচ্য মিথের ব্যবধান এখানে সুস্পষ্ট। কারণ গ্রীক বা পাশ্চাত্য মিথের ধারক দেবদেবীদের সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার সম্পর্ক ছিল শূন্যের কোঠায়। সমালোচকের ভাষায়:

> প্রাচীন গ্রীক কিংবা রোমক সভ্যতায় দেবদেবীদের সাথে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের কোন সম্পর্ক ছিল না। আপোলো, জুপিটার কিংবা ভলকানকে নিয়ে যেসব মিথের অবতারণা অথবা প্রমেথেউস পার্সেউসকে নিয়ে রচিত ঘটনাবলী যেন শুধু ধ্রুপদী সাহিত্য ও ধর্মীয় ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার বিষয় ; অন্য কারোরই নয়। সাধারণ জীবন যাপনের সাথে তা বিন্দুমাত্র সম্পর্কশূন্য। ইউরোপীয় দেশগুলোর দেবতাদের রূপ আরো প্রচ্ছন্ন। একথা ক'জনাইবা জানে যে, বৃহস্পতিবার (Thursday) দিনটি সম্পর্কিত দেবতা Thor-এর সাথে কিংবা Wednesday নামের উৎপত্তি দেবতা Odin-এর নাম থেকে।[৫]

তবে শামসুর রাহমান লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। বিস্ময়করভাবে তিনি তাঁর কবিতায় গ্রীক মিথের পরিচর্যা করেছেন জীবনযাপনের সাধারণীকরণসূত্রে। ভারতীয় মিথের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মত শামসুর রাহমানও ভারতীয় মিথ তাঁর কাব্যে সম্পৃক্ত করে নতুন ইঙ্গিত প্রদানের চেষ্টা করেছেন এবং সে ইঙ্গিত একদিকে যেমন দেশকাল-সমাজ ও তার ধ্বংসকে প্রতীকায়িত করেছে তেমনিভাবেই ধারণ করেছে ব্যক্তিক জীবনবোধ ও তার সাফল্য-ব্যর্থতা। ভারতীয় পুরাণের প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ করি 'চাঁদ সদাগর' কবিতায়। *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* (১৯৮২) কাব্যের এ কবিতায় কবি প্রতিষ্ঠিত করেন ব্যক্তিক মহিমা, মধ্যযুগের চাঁদ সওদাগরের দুর্দমনীয়-দোর্দণ্ড-বিদ্রোহী মনোভাবে নিজস্ব প্রতিরূপকে। মধ্যযুগের চাঁদ সওদাগরের বিলাপে সাত পুত্রের মৃত্যু, বাণিজ্যতরীর মজ্জমানতা, বেহুলার আর্তনাদ – জীয়ন-মন্ত্র খোঁজার লক্ষ্যে যাত্রা, উন্মাদিনী জননী সনকার ধুলায় লুটানো, চাঁদ সওদাগরের জেদী-একরোখা স্বভাবের পরিচয়, সর্বোপরি হার না মানা, বশ্যতা স্বীকারে অপারগতা প্রভৃতি বিষয় এ দীর্ঘ কবিতায় ফুটে উঠেছে। উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

যতদিন হিন্তাল কাঠের
লাঠি আছে হাতে, আছে
ধমনীতে পৌরুষের কিছু তেজ, যতদিন ঠোঁটে
আমার মুহূর্তগুলি ঈষৎ স্পন্দিত হবে, চোখে

---

[৫] ভি.এস. নারাবান, 'ভারতীয় সাংস্কৃতি ঐতিহ্যে মিথ' তারেক আহমেদ অনূদিত, *নৃ* মিথ সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ৩০।

নিমেষে উঠবে ভেসে কোনো শোভাযাত্রার মশাল,
করবো না আন্ধারের বশ্যতা স্বীকার ততদিন,
যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ,
ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায়
ডিঙার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার,
গাঙ্গুড়ের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।

('চাঁদ সদাগর'/*উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৬) *মেঘনাদবধ কাব্যের* (১৯৬১) রাবণের বিলাপ ধ্বনির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় চাঁদ সওদাগরের বিলাপ। 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটি শামসুর রাহমানের অসামান্য সৃষ্টি। চাঁদ সওদাগর কিংবা বেহুলার ভাসান বিষয়ক মিথ-ব্যবহার বাংলার কবিদের ঐতিহ্য। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি বেহুলা মিথ ব্যবহারে দেখিয়েছেন অপূর্ব দক্ষতা। জীবনানন্দের বেহুলা 'বাংলা-প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যের স্নিগ্ধরূপময়তার বিভায়' উজ্জ্বল, বিষ্ণু দে'র বেহুলা 'গতিময়তা, সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের শক্তির আধার স্রোতস্বিনী'র সঙ্গে একাত্ম, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেহুলা 'বিপুলা পৃথিবীর মতোই প্রাণশক্তির অদম্য জাদু'র অধিকারী।[৬] অবশ্য শামসুর রাহমানের বেহুলা সেদিক থেকে নিস্প্রভ, কেবলই পতিভক্ত গৃহবধূ : জীয়ন-মন্ত্রে খোঁজে দয়িতের গলিত শরীর/আঁকড়ে তরঙ্গে নাচে সায়বেনে-নন্দিনী নাচুনী।

এছাড়া কবিতার শিরোনামে না হলেও কবিতাশরীরে নানাভাবে শামসুর রাহমান গ্রথিত করেন ভারতীয় মিথ-শব্দ-উপ্যাখ্যান। উদাহরণের মাধ্যমে তা তুলে ধরা যায়:

১. সমৃদ্ধির মায়ামারীচের
সংজ্ঞা-হরণ দারুণ আকর্ষণে
ধনিক যুগের গোধূলিতে ভাসি,
যূথছুট স্লান, নরমুণ্ডের বনে।

('ভালোবাসা তুমি'/*নিরালোকে দিব্যরথ*)

২. তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

('তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'/*বন্দী শিবির থেকে*)

৩. কোথায় ব্যাপক জতুগৃহে অনেকানেক ঘোড়া পুড়ে যায়।

('একটি দুপুরের উপকথা'/*উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

৪. বহু যুগ ধরে আমার ভেতরে যে কালকূট
সঞ্চিত তার নির্যাস বুঝি তোমার শিরা
করেছে ধারণ।

('তোমার সৃষ্টি ভিত্তিপাক'/*শিরোনাম মনে পড়ে না*)

---

[৬] বিস্তারিত পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য, বার্ণিক রায়, *কবিতায় মিথ* , ২য় সংস্করণ, (কলকাতা : পুস্তকবিপণি, ১৯৯৪),পৃ. ২৬-৩১

৫. ... যেন রত্নাকর
দস্যুর ভরাট কণ্ঠে বাল্মীকির স্বর, নবজাত, অনশ্বর।
('সোনার মূর্তির কাহিনী'/*শিরোনাম মনে পড়ে না*)

৬. ধৃতরাষ্ট্র শূন্যতা আলিঙ্গন করলো আমাকে।
('আমি এক ভদ্রলোককে'/*ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*)

৭. সে মুহূর্তে মনে হলো তুমি স্নিগ্ধ, প্রজ্ঞাপারমিতা,
('কবিতাপাঠ'/*এক ফোঁটা কেমন অনল*)

৮. যেদিন তোমার বস্ত্রহরণের পালা
শুরু হলো, তোমার চুলের মুঠি ধ'রে পৈশাচিক
উল্লাসে উঠলো মেতে মদমত্ত বর্বরেরা,
('দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে'/*দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)

৯. ... কারুর মুগুর দিকে তর্জনী দেখিয়ে,
সাত ঘাটে সাতটি শিখণ্ডী
খাড়া ক'রে মোক্ষলাভ হবে না আমার।
('ডুবসাঁতার'/*দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)

১০. এই পদ্য বিবর্ণ জিনস্‌-পরা ঋষ্যশৃঙ্গ,
('আমার অভদ্র পদ্য'/*অবিরাম জলভ্রমি*)

উদ্ধৃত কবিতার পঙ্‌ক্তিসমূহে ব্যবহৃত মারীচ, খাণ্ডবদাহ, জতুগৃহ, কালকূট, বাল্মীকি, ধৃতরাষ্ট্র, প্রজ্ঞাপারমিতা, দ্রৌপদী, শিখণ্ডী, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় মিথ-পুরাণের পরিচিত চরিত্র-আখ্যান। এসব চরিত্রআখ্যান শামসুর রাহমানের কবিতায় এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেন দু'ঘরের মধ্যবর্তী চৌকাঠ নেই, অবলীলাক্রমে তাকে অতিক্রম করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ-পুরাণকে কিভাবে আধুনিক জীবনের সাথে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায় তাঁর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শামসুর রাহমানের কবিতা।

## শেষকথা

'দ্য মিনিং অফ কনটেম্পরারি রিয়ালিজম' (১৯৫৮) গ্রন্থে গেওর্গ লুকাচ বলেছিলেন, আধুনিক লেখকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তাদের কেবলমাত্র এ বুর্জোয়া সমাজের হতাশা ও বিরক্তি নয় তারও বেশিকিছু প্রতিফলিত করা উচিত।[৭] সাহিত্যে সমাজ শুধু নয়, আরো বেশিকিছু প্রতিফলিত করা তাদের কর্তব্য। টি.এস. এলিয়ট বলেছেন:

> But the essential advantage for a poet is not, to have a beautiful
> world with which to deal: it is to be able to see beneth both beauty
> and ugliness; to see the boredom, and the horror and the glory.[৮]

---

[৭] টেরি ঈগলটন, *মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা*, নিরঞ্জন গোস্বামী অনূদিত, (কলকাতা : দীপায়ণ, ১৩৯৮), পৃ. ৭১।

[৮] উদ্ধৃত, ইমতিয়াজ হাসান, 'দ্বৈরথ ও সৌম্যের কবি : শহীদ কাদরী', *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১২/২০০৫), পৃ. ৩৩০।

শামসুর রাহমানের কাব্য-বিষয় উপস্থাপনে কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। কাব্যকলা নির্মাণে শামসুর রাহমানের চেতনাজগৎ প্রথমাবস্থায় অন্তর্লোকবাসী, পরবর্তীকালে তা হয়ে ওঠে বহির্জগতে স্থিত—জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রাম-রক্তপাতে যা আন্দোলিত ও পরিপুষ্ট। আর উভয়াবস্থায় কবির ভাষিক সংকেতের মৌল অবলম্বন প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিথ-পুরাণ। শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যে 'পাশ্চাত্য মিথকে ব্যবহার করেন আধুনিকে সংগুপ্ত রোমান্টিসিজমকে অবয়ববদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। নিজ আত্মভুবনের সঙ্গে স্বদেশ-সমকালের যে উত্থান-সংঘাত, দুঃখ-বিষাদ, জয়-পরাজয়ের বিজড়ন, তারও শোভাভূমি হয়ে ওঠে মিথপট'।[৯] এই শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব কিংবা এলিয়ট, ইয়েটস, বোদলেয়র, পাউন্ড, ডিলান টমাস-এর নিকট। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের কাব্যে ব্যবহার করেছেন মিথ-ভাষ্য। এঁদের মধ্যে ইয়েটস-এর প্রভাব শামসুর রাহমানে বেশি, কবি নিজেই নানাভাবে তা স্বীকার করেছেন। তাঁদের কাব্যবোধের সংশ্লেষ, আত্মকৃত জীবনবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, আত্মশুদ্ধি প্রভৃতির বিস্তৃত প্রকাশ শামসুর রাহমানে লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যজীবনের শেষাবধি প্রবহমাণ থাকে আত্মউন্মোচন ও আত্মানুসন্ধানের সচল প্রক্রিয়া। এ কারণেই শামসুর রাহমানের সত্তাসমগ্রে স্থিত সংকট-উত্তরণের উপায় প্রতীক-সংকেত-চিত্রকল্প সৃজন। মিথ-পুরাণের ভাষ্যে সে বিনির্মাণ শামসুর রাহমানের কাব্যসুষমাকে সমৃদ্ধ করেছে, সন্দেহ নেই।

---

[৯] বেগম আকতার কামাল, *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ৪৩।

**ISSN 1561-798X**
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# মেহেরপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস

ইয়াসমিন আরা সাথী[*]

**Abstract:** Language is not only the media for expressing feelings of mind but also social wealth. Every nation has own language. This language has two types: one is standard type and other is dialect. Dialect is the best media for expressing inward feelings of every indivisual. Meherpur is a small district of Bangladesh. Though the Dialect of Meherpur is near about to standard colloquial language it has some valuable characteristics in the area of language studies. The paper is an humble attempt to analyse the diaect and its social stratification.

## ভূমিকা

সব দেশের বা জাতির ভাষার একটি প্রমিত রূপ আছে, যা গ্রহণযোগ্য কিন্তু কৃত্রিম। ভাষার অকৃত্রিম রূপটি স্থিত থাকে অঞ্চল বিশেষে মানুষের কথ্যরূপে। অঞ্চল বিশেষে ভাষার স্বাতন্ত্র্য আছে, যে স্বতন্ত্র রূপ গড়ে উঠেছে একটি স্থায়ী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কথামালা দিয়ে, একেই আঞ্চলিক ভাষা এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষায় উপভাষা (Dialect) বলে অভিহিত করা হয়। কোনো আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন ভাষারূপের সমীক্ষাই হচ্ছে উপভাষাতত্ত্ব এই সমীক্ষায় ধ্বনি উচ্চারণ ও রূপমূলের পার্থক্যর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।[১]

বাংলাদেশে ১০/১৫ কিলোমিটার অন্তর ভাষা বদলায়, তারপরও বাঙালির যে প্রচলিত ভাষা বা চলিত ভাষা কিংবা শিষ্ট ভাষা তা গড়ে উঠেছে কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও হুগলীর কথ্য বাংলাকে কেন্দ্রকে, অর্থ্যাৎ একটি আঞ্চলিক ভাষা বা এলাকার ভাষা সমগ্র বাঙ্গালির গ্রহণযোগ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[২] মেহেরপুরের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মেহেরপুর নদীয়া জেলার একটি অংশ ছিল, এই মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক স্তর বিন্যাস সম্পর্কিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

## মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলকাতা ও নদীয়ার শিক্ষিতজনের ব্যবহৃত ভাষা আদর্শ চলিত বাংলার মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই নদীয়ার সঙ্গে মেহেরপুরের নিবিড় সংযোগ আছে।

---

[*] জুনিয়র লেকচারার, বাংলা বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, রাজশাহী ক্যাম্পাস।

[১] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* (কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭), পৃ. ১৫১।

[২] জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ, *কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ১৩।

মেহেরপুর মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৮৫৭ সালে তখন নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত এই মহকুমার ছিল চারটি থানা: করিমপুর, তেহট্ট, গাংনী এবং সদর মেহেরপুর।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বাঙালির প্রতিনিধিত্বহীন বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের নেতা স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের বিভক্তির ছুরিতে মেহেরপুর মহকুমা হয় ছিন্নভিন্ন। করিমপুর আর তেহট্ট থেকে গেল ওপারে, এপারে গাংনীকে গেঁথে দেওয়া হলো কুষ্টিয়া সদর মহকুমার সঙ্গে এবং মেহেরপুর নিজেও তার মহকুমা পরিচয় হারিয়ে কেবল একটি থানা হয়ে যুক্ত হয়ে রইল চুয়াডাঙ্গা মহকুমার সঙ্গে। ১৯৫২ সালে মেহেরপুর আবার মহকুমা পরিচয় ফিরে পায় গাংনী ও মেহেরপুর সদর থানাকে নিয়ে। বর্তমানে মেহেরপুরের সাথে মুজিবনগর উপজেলা সংযুক্ত হয়ে আরো একটি উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের ক্ষুদ্র এই জেলাটির ভাষার বৈচিত্র্যময়তা দেখে বিমোহিত হতে হয়। কেননা এ জেলার উত্তরে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানা, দক্ষিণে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর, দামুড়হুদা থানা পূর্বে কুষ্টিয়ার মিরপুর ও চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ৭১৬ বর্গকিলোমিটারের এই জেলাটির ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬২০ জন জনবসতির কথ্যভাষার বিভিন্নতা দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত পললভূমি হওয়ায় ৪৭'এর দেশভাগ এবং ৬৫'এর পাকভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বহু বাঙালি মুসলমান কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর থেকে এসে এ জেলায় আবাস গড়ে। ফলে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা সংযুক্ত হয়েছে নানান মাত্রায়।

তিনটি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত মেহেরপুর জেলার মধ্যে মেহেরপুর সদর থানার ভাষা বহুমাত্রিক, কেননা সদর থানাটি প্রশাসনিক দাপ্তরিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় বিভিন্ন বৃত্তিকেন্দ্রিক মানুষ এখানে বসতি গড়েছে, ফলে ভাষার ব্যবহারে শব্দার্থ, উচ্চারণ, টান, প্রলম্বন, স্বরক্ষেপের দীর্ঘতায় পার্থক্য দেখা যায়। মেহেরপুরের মানুষ মোটামুটি চলিত কথায় ঘরে বাইরে যে রকম কথ্য ভাষা ব্যবহার করে তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. মেহেরপুরের শিষ্ট বা মান্য চলিত ভাষা;
খ. হিন্দু সমাজের ভাষা;
গ. অভিবাসীর ভাষা; এবং
ঘ. বৃত্তিকেন্দ্রিক ভাষা।

*ক. মেহেরপুরের শিষ্ট বা মান্য চলিত ভাষা*

মেহেরপুরের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর ভাষাটি ক্রমশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। ভাষাটি গণমাধ্যমে ব্যবহৃত ভাষার কাছাকাছি। ভাষার নমুনাটি অনেকটা এরকম:

১। "জেমস হিল মেহেরপুরে নীলকুঠি তৈরী করি
গরিব চাষীদের ওপর যে অত্যাচার করিছিলু
তা মেহেরপুরবাসী কুনুদিন ভুলবি না, তাইতি
তো সবাই বোলে 'কাজের শত্তুর ঢিল জমির
শত্তুর নীল, জাতির শত্তুর হিল।"
২। পারে না সুচ গড়াতে যায় বন্দুকের বায়না দিতে।
৩। জমি নেই খামার চষি, ছেলে নেই ভাগ্নে পুষি।

(প্রচলিত প্রবাদ)

### খ. *হিন্দু সমাজের ভাষা*

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা ভিন্নতর হওয়ায় হিন্দু ধর্মালম্বীদের ভাষা ব্যবহারে কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। এমনকি মেহেরপুরের কিছু গ্রামের নামও হিন্দু দেবদেবীর নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন—শিবপুর, রাধাকান্তপুর, জগন্নাথপুর, দেবীপুর, বসন্তপুর, সিন্দূরকৌটা, রামনগর, কেশবনগর ইত্যাদি। ব্যক্তিগত জীবনে নামে, সম্বোধনে, আচারে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তারা নিজস্ব কিছু শব্দ ব্যবহার করে। যেমন—দিদি,বৌদি, জ্বী, আজ্ঞে, মা-কালির দিব্যি, ভগবানের সাক্ষী প্রভৃতি, তবে বর্তমানে ভাই, আম্মা,পানি ইত্যাদি শব্দ অনায়াসে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন:

> হায় ভগবান ! এত্ত বেলা হয়ি গেল চান করবু কখন। এখনও যে পানি পেলাম না।

### গ. *অভিবাসীর ভাষা*

৪৭-এর দেশভাগ এবং ৬৫-এর পাকভারত যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলিম সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, হাঁসপুকুর, গন্ধরাজপুর, তেহট্ট থেকে চলে এসে এ জেলায় বসতি গড়ে। এ সময়ের ব্যবধানে এই সকল অভিবাসীদের ভাষা ব্যবহারে নিজস্ব রীতিটি পরিবর্তিত হলেও কিছু নিজস্ব শব্দ তারা এখনো ব্যবহার করে। যেমন: পূর্বে তারা আজ্ঞে শব্দটি ব্যবহার করত, কিন্তু এখন জ্বী শব্দটি ব্যবহার করে। তাদের ভাষার নমুনা:

> কলিকালে আর কত দেখব, বেগুনের কেজি পুনেরো টেকা।

### ঘ. *বৃত্তিকেন্দ্রিক ভাষা*

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার যে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তার সিংহভাগ অংশ দখল করে আছে বৃত্তিকেন্দ্রিক ভাষা। এই পেশাজীবী শ্রেণী তাদের নিজস্ব শব্দ ব্যবহার করে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষাকে দিন দিন সমৃদ্ধ করছে। এর মধ্যে কৃষক, জেলে, স্বর্ণকার, কর্মকার, ফেরিওয়ালাসহ অন্যান্য বৃত্তির শব্দ ও ভাষা জানাটা খুব জরুরি।

*কৃষিকাজ সংক্রান্ত শব্দ:* নাঙোল, মুনিশ, ফাল, ভুঁই পাকানো, মাতাল, হ্যারো, শ্যালো, সপ (লম্বা মাদুর) নছিমন দড়ি, পাটকাটি (পাটকাঠি) বিচুলি (খড়) গুলা (ধান সংরক্ষণের গোলা), আড়া, নছিমন, করিমন, আলগামন (বর্তমানে গরুর গাড়ির পরিবর্তে এ সকল ইঞ্জিনচালিত যান কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে) ঢেরা (পাট কাটার যন্ত্র), পাতু (ধানের চারা) ইত্যাদি শব্দ মেহেরপুরের কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়।

*মৎস্য সংক্রান্ত শব্দ:* শিং, টেংরা, চ্যাঙ, ওকোল, গেরপুই পাকাল, তোড়া, বাওলি কোল, ডামোশ, ডাঙ্গশ, দহ, ফাঁসজাল, খ্যাপলাজাল, বেড়জাল, পোলো, ডুঙ্গা ইত্যাদি।।

*স্বর্ণ সংক্রান্ত:* মাকড়ি (কানের গহনা), আঁচলা, মানতাসা, বাজু, চুড়, সীতাহার, কণ্ঠহার, টায়রা, তুড়া (পায়ের নূপুর) আমলেট, মুকুট, কাতানি, প্লাস, যন্ত্রী, স্বর্ণা, ছোট হাতুড়ি, সাঁড়াশি ইত্যাদি। এছাড়াও করাতি (কাঠ চেরাই করাতওয়ালা) দাই (প্রসবকারী মহিলা) ঘরামি (ঘর ছাওনেয়ালা), পাড় দেয়া (ঢেঁকিতে লাথি মেরে ধান ভানা) হেঁসিল (রান্নাঘর) এসব শব্দ মেহেরপুরের গ্রামে গঞ্জে অহরহ ব্যবহৃত হয়।

## মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

### (ক) *ধ্বনিতত্ত্ব*

মেহেরপুরের ভাষার উচ্চারণরীতি সব এলাকায় হুবহু এক রকম নয়। উচ্চারণের পার্থক্য কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন: বল্লভপুর, ভবরপাড়া, মুজিবনগরের উচ্চারণের সঙ্গে নদীয়ার উচ্চারণের মিল অনেকখানি। আবার কাজীপুর, নওদাপাড়া, রামনগর, মোহাম্মদপুরের উচ্চারণে কুষ্টিয়ার উচ্চারণের প্রভাব রয়েছে। বারাদি, বলিয়ারপুর, দরবেশপুরের উচ্চারণে চুয়াডাঙ্গার প্রভাব রয়েছে। তবু মেহেরপুরের সব এলাকার উচ্চারণে যে মিলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রচলিত তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো:

স্বরধ্বনিমূল তালিকা

| | সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত | কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত | পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলকৃত |
|---|---|---|---|
| উচ্চ | ই ঈ | | উ ঊ |
| উচ্চ মধ্য | এ | | ও |
| নিম্নমধ্য | অ্যা | | অ |
| নিম্ন | | আ | |

স্বরধ্বনির অবস্থান

| স্বরধ্বনি | আদি অবস্থান | মধ্য অবস্থান | অন্ত্য অবস্থান |
|---|---|---|---|
| ই | ইন্দুর | বিচছিরি, ওছিলা(অজুহাত) | কাঁচি, বুলি, করি, চলি,মেয়িছেলি |
| , | | কো'রে | |
| আ | আমানি | আবাল (সাধারণ) | হাতা (চামচ) |
| অ্যা | অ্যাক, অ্যামন | | |
| এ | খেতা(কাঁথা),এট্টা(একটা) | আদেকা | কোলে, ক'নে (কোথায়) |
| উ | উটকো | উটুন,কাকুই (চিরুনি) | সুদু (শুধু) বুবু (বু) |
| অ | অকতা (অশ্লীল কথা) | সোময় (সময়) | ওল (ওগো) |
| ও | ওলা, ওটা | | ফাও |

### দ্বিস্বরধ্বনি

বাংলা ভাষায় ধ্বনিগত দিক থেকে একত্রিশটি পর্যন্ত যৌগিক স্বরধ্বনি হতে পারে, এদের মধ্যে ১৯টি নিয়মিত এবং ১২টি অনিয়মিত মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষায় ১৭টি যৌগিক স্বর বা দ্বিস্বরধ্বনি আছে।[৩]

(১) ই-ই - করিই, ভিজিই
(২) ই- উ - মিউ
(৩) এ-ই - নেই, সেই, এই
(৪) এও -মেও
(৫) এউ্ - টেউ, কেউ
(৬) অ্যাও্ - দ্যাও, ন্যাও, দ্যাও

---

[৩] মুহম্মদ আবদুল হাই, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ২৭।

(৭) অ্যায় - দ্যায়
(৮) আই - দাই, বাই (বাতিক)
(৯) আও্ - ফাও্
(১০) আউ - লাউ, জাউ (ভাত)
(১১) আয় - আয় (তোমার আয় কত)
(১২) অও - রও, বও
(১৩) অয় - নয়, ছয়
(১৪) ও উ - বউ, মউ
(১৫) ও ই - দই, বই
(১৬) ওয় - ধোয়
(১৭) উই - উই, পুঁই, থুই (রাখি)

**স্বরধ্বনির উচ্চারণ**

১. *অর্ধ অভিশ্রুতি*

পূর্ব বাংলার অপিনিহিতি পশ্চিম বাংলার অভিশ্রুতি হয়। ভৌগোলিক কারণে মেহেরপুর পশ্চিম বাংলার নিকটবর্তী হওয়ায় অভিশ্রুতির প্রভাব এখানে অনেক বেশি। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

কইর‍্যা → কো'রে → করে
চইল্যা → চো'লে → চলে

২. *অনুনাসিক স্বরধ্বনি*

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষায় অনুনাসিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয় না বললেই চলে।
যেমন: ঈদের চান দেখি সবাই খুশি।

৩. স্বরসঙ্গতি

ক. *আদি স্বরের পরিবর্তন*

'অ' → 'উ'

রূপমূলের আদিতে 'অ' থাকলে তা 'উ' তে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়।

| রূপমূল | পরিবর্তিত রূপমূল | পরিবর্তনরীতি |
|---|---|---|
| বলা | বুলা | অ → উ |

খ. *মধ্যস্বরের পরিবর্তন*

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষায় মধ্যস্বরের পরিবর্তন হয় বিভিন্ন ভাবে। যেমন—

| রূপমূল | পরিবর্তিত রূপমূল | পরিবর্তনরীতি |
|---|---|---|
| শাশুড়ি | শাওড়ি | উ→ ও (উ এর প্রভাবে) |
| রবিবার | রোববার | ই→ ও (ই-এর প্রভাবে) |

গ. *অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন*

- শব্দের শেষে 'আ' ধ্বনি থাকলে তা 'উ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন:

| রূপমূল | পরিবর্তিত রূপমূল | পরিবর্তনরীতি |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| কুমড়া | কুমড়ু | আ→ উ |
| জুতা | জুতু | আ→ উ |
| গুড়া | গুড়ু | |
| রূপা | রূপু | |

চব্বিশ পরগণা জেলার পূর্ব অংশে ক্রিয়ারূপমূলের শেষের পরিবর্তন যেমন হয় মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার সেই একই রীতি দেখা যায়। যেমন—

| রূপমূল | পরিবর্তিত রূপমূল | পরিবর্তনরীতি |
|---|---|---|
| খাইতে | খাতি | এ→ উ |
| চাইলে | চালি | |
| শুইতে | শুতি | |
| নাইতে | নাতি | |

ঘ. *অন্যান্য পরিবর্তন (স্বরসঙ্গতি)*

| রূপমূল | পরিবর্তিত রূপমূল | পরিবর্তনরীতি |
|---|---|---|
| হাঁটু | হেটু | আ→ এ |
| মামা | মামু | আ→ উ |
| বোন | বুন | ও → উ |
| চেপে | চেপি | এ → ই |
| ছাতা | ছাতি | আ→ ই |
| সেয়ানা | সিয়ানা | এ → ই |

৪. *স্বরাগম*

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার স্বরাগমের উদাহরণ সুপ্রচুর ।

স্ত্রী → ইস্তিরি
বিশ্রি → বিচ্ছিরি
বিক্রি → বিক্কিরি

৫. *বিপ্রকর্ষ*

ক. প্রাণ > পিরান
খ. গ্রাম > গিরাম
গ. স্বপ্ন > স্বপন
ঘ. ফিল্ম >ফিলিম

৬. *দ্বিত্ব ( দু-বার উচ্চারণ)*

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের মধ্যে বিশেষ করে যে সব ক্রিয়াপদের রূপমূল ‘র’ ধ্বনি আছে তা লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনে দ্বিত্ব হয়। যেমন:

| রূপমূল | পরিবর্তিত রূপমূল | পরিবর্তনরীতি |
|---|---|---|
| করতে | কত্তি → | র - ত+ত |
| সরতে | সত্তি → | |
| ধরতে | ধত্তি | |
| মরলে | মল্লি → | র - ল + ল |

তবে ‘র’ নেই এমন ক্ষেত্রে ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়।

চললে → চোল্লি
বললে → বোল্লি

### *৭. মহাপ্রাণহীনতা*

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষায় মহাপ্রাণহীনতার উদাহরণ শব্দের মধ্যে ও অন্তে লক্ষণীয়:

| আদি | মধ্য | অন্তে |
|---|---|---|
| | আছাড়→ | আচাড় |
| | কথা→ | কতা |
| | করছি→ | কচছি |
| | লাঠি-→ | লাটি |

### *৮. নাসিক্য ব্যঞ্জন*

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার নাসিক্য ব্যঞ্জনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

কাঁদা → কান্দা
বাঁধা → বান্দা
বাঁদর → বান্দর
ইঁদুর → ইন্দুর

কোনো কোনো সময় রূপমূলের শেষে ব্যঞ্জন দু-বার উচ্চারিত হয় যেমন:

বড় → বড্ড
ছোট → ছোট্ট

য-ফলার উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়

সত্য → সত্তি
মধ্য → মদ্দি

### *৯. ধ্বনি বিপর্যয়*

মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলে ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ সুপ্রচুর। যেমন বর্তমানে বহুল প্রচলিত শব্দ 'আলট্রাসনোগ্রাম' শব্দটিকে গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ বলে আলতাসোনো।

রূপমূলের পূর্বের এবং পরের 'র' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

| | |
|---|---|
| রগড় | লগড় |
| শরীর | শরীল |

রূপমূলের পূর্বের 'র' ধ্বনি 'অ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

রাত → আইত
রক্ত → অক্ত

মেহেরপুরের ভাষার ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবেশ বণ্টন:

(ক) স্পষ্ট অঘোষ ধ্বনি স্পৃষ্ট ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় যেমন:
কাক → কাগ, শাক → শাগ

(খ) স, ষ, শ এর সবক্ষেত্রেই 'শ' এর মতো উচ্চারণ হয়।

(গ) 'ঢ়'-এর উচ্চারণ নেই।

(ঘ) রূপমূলের আদিতে ঙ, ন, ঞ এবং 'ড়' 'ঢ়' রূপমূলের আদিতে বসতে দেখা যায় না।

(ঙ) মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষায় যুক্তধ্বনির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম।

## রূপমূলতত্ত্ব

মূলধ্বনি হচ্ছে অর্থহীন ক্ষুদ্রতম ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান। মূলধ্বনি সংযুক্তকরণের মাধ্যমে ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক উপাদান গঠিত হয়। এই অর্থবোধক উপাদানগুলির চিহ্নিতকরণ রূপ বিদ্যমান। যখন কতকগুলো ধ্বনি সহযোগে একটা ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান গঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে অর্থ প্রকাশিত হয় তখন তা রূপমূলরূপে চিহ্নিত হয়।[৪] যেমন মা, পা, ইত্যাদি।

### *সহরূপমূল*

সহরূপমূল হচ্ছে রূপমূলের পরিবর্তনীয় সদস্য যা রূপমূলের বিশেষ পরিবেশে ব্যবহৃত হয়।[৫] যেমন- রা, - গুলো, - গুলি। মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রা, গুলু, গুনু ব্যবহৃত হয় যেমন:

| | |
|---|---|
| ১. রা | ছেলিরা |
| | মেইয়িরা |
| ২. গুলু/গুনু | কলমগুনু |
| | মুরগিগুলু |
| | মেইয়িগুলু |
| | ছেলিগুনু |

সহরূপমূলের বিভাজন প্রসঙ্গে একই রকম উচ্চারিত ধ্বনি চলিত বাংলার মতো মেহেরপুরের ভাষাতেও দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ধ্বনিগত উপলব্ধি ও উচ্চারণ সমশ্রেণীর হলেও অর্থের দিক থেকে তারা আলাদা যেমন 'বান' রূপমূলটি ক্রিয়াবাচক, অর্থ কাউকে বাঁধতে বলা। যেমন গরুটা বান দিকি। আবার বান অর্থ বন্যা যা বিশেষ্যবাচক রূপমূল। আরেকটি উদাহরণ যেমন—পুতা (ঘরের ভিত বিশেষ), পুতা (পুতে রাখা হয়েছে এমন ক্রিয়াবাচক রূপমূল), পুত (পৌত্র বিশেষ)।

## মুক্তরূপমূল

যে রূপমুল অন্য বুপমূলের সাহায্য ছাড়া ব্যবহৃত হতে পারে যার নিজস্ব অর্থ বিদ্যমান এবং ক্ষদ্রতম অংশে বিভাজ্য নয়, তাকে মুক্তরূপমূল বলা হয়।[৬] যেমন:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক. | মুক্তরূপমূল | মুক্তরূপমূল গঠিত বৃহত্তর রূপমূল | |
| | কেষ্টু | কুল | কেষ্টুকুল (অপক্ক বরই) |
| | কটা | মেয়ি | কটামেয়ি (ফর্সা মেয়ে) |
| খ. | মুক্তরূপমূল | মুক্তরূপমূল গঠিত বৃহত্তর রূপমূল | |
| | শরীল | ডা | শরীলডা (শরীরটা) |
| | নাল | চে | নালচে (লালচে) |

### *বদ্ধরূপমূল*

যে রূপমূল নিজস্ব অর্থ আছে এবং ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য নয়, কিন্তু যেগুলো স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না এবং মুক্তরূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর রূপমূল বদ্ধরূপমূল রূপে পরিচিত।[৭]

যেমন: গুলো, রা, অ, ওর

---

[৪] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭), পৃ. ৩০০।

[৫] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পৃ. ৩০২।

[৬] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পৃ. ৩০৪।

[৭] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পৃ. ৩০৬।

মুক্তরূপমূলের সাথে সংযুক্ত

বিড়ালগুনু, মেয়িছেলিরা, ছেলিরা।

বদ্ধরূপমূল বহুবচন, উপসর্গ, প্রত্যয় ও কারক নির্দেশক রূপে মুক্তরূপমূলের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে।

ক. *বহুবচনরূপে*

ফকিররা (ভিক্ষুকরা)
উকিলরা

খ. *উপসর্গরূপে*

বে আক্কেল (যার জ্ঞান নেই)
বে ইজ্জুতি (লজ্জার)
বদমায়িস (দুষ্ট প্রকৃতির)
কু কাম (খারাপ কাজ)

গ. *প্রত্যয়রূপে*

লেঠিল (লেঠিল > লাঠিয়াল, লাঠি+আল), চান্‌পনা (চাঁদ > চান+পনা)

ঘ. কারক নির্দেশক

কর্তৃকারক : প্রথমা বিভক্তি
একবচন : বিড়ালে দুদ খাইচি (বিড়ালে দুধ খাচ্ছে)
বহুবচন : ছুড়ারা মারামারি করচি (ছেলেরা মারামারি করছে)

কর্মকারক : দ্বিতীয়া বিভক্তি
একবচন : বুনকে ভাত খেয়ি নিতি বল (বোনকে ভাত খেতে বল)
বহুবচন : প্লাবন বলগুলু নাড়চি।
করণকারক: তৃতীয়া বিভক্তি
একবচন : লাঙ্গল দিয়ি জমি চাষ করা হয়।
বহুবচন : মুনিশদের দিয়ি মাঠের ঘাস বেছিনে।
সম্প্রদানকারক : চতুর্থী বিভক্তি
একবচন : ফকিরকে ভিক্কি দাও (ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও)
বহুবচন : গরিব মানুষদের ফিতরা দ্যাও।
অপাদানকারক : পঞ্চমী বিভক্তি
একবচন : মেঘ থেকি বৃষ্টি হয়
বহুবচন : গাছ থেকি পাতা পড়ে
অধিকরণকারক : সপ্তমী বিভক্তি
একবচন : আমি ঢাকা যাব
বহুবচন : বাগানে ফুল ফুটিচে ।

*ক্রিয়ার কাল*

বাংলা ক্রিয়ামূলক রূপমূল গঠনে মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় সংযুক্তির পর যখন ক্রিয়ার কাল নির্দেশিত হয় তখন সম্প্রসারিত রূপমূল গঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।[৮]

---

[৮] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পৃ. ৩১২।

মেহেরপুরের উপভাষায় ক্রিয়ার কাল নির্দেশের মাধ্যমে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার দিক বিশ্লেষণ করা যায়।

ক্রিয়ার কাল নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্তির দিক

বর্তমান কাল অতীতকালভবিষৎকাল
মুক্তরূপমূল + মুক্তরূপমূল + মুক্তরূপমূল +
বদ্ধরূপমূল বদ্ধরূপমূল বদ্ধরূপমূল
পুরুষ + বচন পুরুষ + বচন পুরুষ + বচন
ক. কর = করি করি (+ই) করিছিল (+ই + ছিল) করবি (+ বি)
খ. দ্যাখ = দ্যাখা দ্যাখে (+এ) দেখিছিল (+এ+ছিল) দেখবে (+বে)
গ. চল = চলো চলে (+এ) চ'ললো (+ও+ লো) চলবু (+বু)
ঘ. শুন + শোনা শোনে (+এ) শুনলো (+লো) শুনবু (+ব)

এখানে ক্রিয়ামূলক রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেছে। প্রযোজক রূপমূল গঠনের নমুনা দেওয়া হলো:

ক. √ পার + আ =পারা, পারা +য় = পারায়
মুক্তরূপমূল পার্ কর
খ. √ কান্দ + এ = কান্দে, কান্দ + আয় =কান্দায় (কাঁদায়)
গ. যুক্তরূপমূল : কান্দ
বদ্ধরূপমূল : আয়

*সম্প্রসারিত রূপমূল*

মেহেরপুরের উপভাষায় চলিত বাংলার রূপমূল আছে। তবে উচ্চারণের তারতম্য এবং প্রয়োগের ভিন্নতায় এসব রূপমূল নূতনরূপ লাভ করেছে। এখানে ক্রিয়ামূলের সম্প্রসারিত রূপমূল দেখানো হলো:

বর্তমান কাল

| **পুরুষ** | **সাধারণ** | **ঘটমান** | **পুরঘিটিত** |
|---|---|---|---|
| উত্তম | (চোলি)চলি | চোলতেছি (চলছি) | চোলিছি (চলেছি) |
| মধ্যম | | | |
| সাধারণ | চলো (চলো) | চল্‌ছ (ছল্‌ছ) | চলিছ (চলেছ) |
| তুচ্ছার্থে | চল্ (চল্) | চোলতেছিস(চলছিস) | চোলছিস(চলেছিস) |
| সম্ভ্রমার্থে | চলেন (চলেন) | চোলতেছেন(চলছেন) | চোলিছেন (চলেছেন) |
| প্রথম | | | |
| তুচ্ছার্থে | চলে (চলে) | চোলছে (চলেছে) | চোলিছে(চোলছে) |

অতীতকাল

| **পুরুষ** | **সাধারণ** | **ঘটমান** | **পুরাঘটিত** |
|---|---|---|---|
| উত্তম | চোলিলাম (চললাম) | চোলছিলাম | চোলিলাম (চলেছিলাম) |
| **মধ্যম** | | | |
| সাধারণ | চো'ললে (চললো) | চল্‌ছিলি | চলেছিলি (চোলেছিল) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তুচ্ছার্থে | চোল্‌লি (চল্‌লি) | চোলতেছিলি(চলছিলি) | চোলিলি(চোলেছিলি) |
| সম্ভ্রমার্থে | চল্‌লেন (চললেন) | চলছিলেন | চোলিছিলেন (চলিলেন) |
| তৃতীয়া (তুচ্ছার্থে | চোল্‌আো (চললি) | চলছিস | চোলেছিল(চলেছিল) |

*বর্তমান অনুজ্ঞা*

ক. আপনি দেন দিনি (আপনি দেন )
খ. তুমি বোলো দিকি (তুমি বলো)
গ. তুই কর দিনি (তুই কর)

ভবিষৎ অনুজ্ঞা

ক. আপনি খাবেন
খ.তুমি যাবা
গ. তুই রাকবি (তুই রাখবি)

*যৌগিক ক্রিয়া*

একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলে একটি সম্প্রসারিত রূপমূলের অর্থ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রাধান্য পায়।

ক. তুমরা সবাই যেতি পারবা তো ( তোমরা সবাই যেতে পারবে তো)
খ. খাবার-দাবার নিয়ি এস ( খাবার দাবার নিয়ে এসো)

সর্বনাম পদ

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা সর্বনামের বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ। সর্বনামের একবচন ও বহু বচনের রূপ এখানে দেওয়া হলোঃ

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| এট্টা | অ্যাতোডা |
| ক'নে (কোথায়) | ০ |
| সেইটি (সেটা) | ০ |
| কুনটা (কোনটা) | ০ |
| এখিনে (এখানে) | ০ |
| এইরকম (এরকম) | ০ |
| তকুন (তখন) | ০ |
| এমরায় (এমনিভাবে) | ০ |
| ওমবায় (ওমনিভাবে) | ০ |
| সেমবায় (সেমনিভাবে) | ০ |
| ঔইতি (ও) | ০ |
| এটি | (এগুন-ও) |
| একজন | সককুলি/সগুলি (সকলে) |

বিশেষ্যমূলক রূপমূল

মেহেরপুরের ভাষায় চলিত শিষ্ট রূপের মতো মুক্তরূপমূলের সাথে উপসর্গ (আদি প্রত্যয়) ও প্রত্যয় (অন্ত্য প্রত্যয়) যোগে বিশেষ্যমূলক সাধিত রূপমূল গঠিত হয়ে থাকে।

### ১. আদি প্রত্যয় রূপে গঠিত বিশেষ্য

| | আদি প্রত্যয় | মুক্তরূপমূল | সাধিতরূপমূল |
|---|---|---|---|
| ক. | / অ / | সোময় | অসোময় |
| খ. | / আ / | দেকলে | আদেকলে |
| গ. | /আব / | জোস | আবজস |
| ঘ. | / কু / | কাজ | কুকাজ |
| ঙ. | / গর / | মিল | গরমিল |
| চ. | / না / | বালক | নাবালেক |
| ছ. | / নি / | রাগ | নিরাগ |
| জ. | / বে / | ইজ্জত | বেইজ্জত |
| ঝ. | /বদ / | রাগী | বদরাগী |

### ২. *অন্ত্য প্রত্যয় রূপে গঠিত বিশেষ্য*

| | আদি প্রত্যয় | মুক্তরূপমূল | সাধিতরূপমূল |
|---|---|---|---|
| ক. | / আ / | চাল | চালা |
| খ. | / আনি / | ভাড়া | ভাড়ানি |
| গ. | /আনো / | সিন্দা | সিন্দানো |
| ঘ. | / আলা / | দোচাল | দোচালা |
| ঙ. | / আরি/ | প্রফেসার | প্রফেসারি |
| চ. | / খোর / | খাই | খাইখোর |
| ছ. | / খানা / | ডাক্তার | ডাক্তারখানা |
| জ. | / তোন / | কামাই | কামাইতোন |
| ঝ. | /না / | কুটা | কুটনা |
| ঞ. | / নি / | গাও | গাওনি |
| ট. | / ই / | মাতা | মাতারি |
| ঠ. | / ও / | ভাত | ভেতো |
| ড. | / ন / | চাল | চালন |
| ঢ. | / এ / | বাহির | বাইরে |
| ণ. | / এল / | গাঁজা | গেঁজেল |
| ত. | /জি / | বাপ | বাপজি |
| থ. | / দারি / | ছেতেন | ছেতেনদারি |
| দ. | / দা / | ছোট | ছোটদা |
| ন. | / রা / | ঘাগ | ঘাগরা |
| প. | / রি / | মাস্টার | মাস্টারি |
| ফ. | / গেরি / | উকিল | উকিলগেরি |
| ব. | / বাজ / | মামলা | মামলাবাজ |
| ভ. | / দার / | দোকান | দোকানদার |
| ম. | / জাদা / | হারাম | হারামজাদা |
| য. | / জান / | বাপ | বাপজান |

### ৩. *বিশেষণ গঠিত রূপমূল*

| | অন্ত্যপ্রত্যয় | মুক্তরূপমূল | সাধিত রূপমূল |
|---|---|---|---|
| ক. | / ই / | লোভ | লুবি |
| খ. | / তা / | নুন | নুনতা |
| গ. | / চে / | নাল | লালচে |
| ঘ. | / তো / | চাচা | চাচাতো |

### পদাশ্রিত নির্দেশক

মেহেরপুরের উপভাষায় পদাশ্রিত নির্দেশক এরকম:

১. গরুডা বান্দো দেকি (গরুটা বাঁধো)
২. ডিম কডা নিবা কিনা বোলো (কয়টা ডিম নিবে)
৩. খান কতক লুঙ্গি নিস তো

### (ক) বাক্য, বাক্য গঠন ও বিশ্লেষণ

মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার বাক্য গঠন প্রচলিত চলিতরীতির মতোই। প্রচলিত ব্যকরণ অনুযায়ী বাক্য গঠন বিশ্লেষণ না করে আমরা ভাষা বিজ্ঞানী লিওনার্দ ব্রুমফিল্ড-এর আই.সি. পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। আই.সি পদ্ধতির বিভিন্ন অংশের পরিচয় এখানে তুলে ধরা হলো:

ক. প্রত্যক্ষ উপাদান
খ. উপাদান
গ. গঠন
ঘ.অন্ত্য উপাদান

### **প্রত্যক্ষ উপাদান**

ইংরেজি পরিভাষায় প্রত্যক্ষ উপাদান ও অব্যবহিত উপাদান একই কিন্তু বাক্যে এদের অর্থ এক নয় আলাদা। প্রত্যক্ষ উপাদান হলো বাক্যের দুটো প্রধান ও বৃহত্তম অংশ, যারা বাক্যে সরাসরি ভাবে ব্যবহৃত হয়। 'অব্যবহিত উপাদান হলো, অব্যবহিত সম্পর্কে আবদ্ধ অংশ সমূহ। ইংরেজি বাক্যে 'Immediate Constituent' শব্দটি প্রত্যক্ষ উপাদান ও অব্যবহিত উপাদান উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়'।[৯] তবে আই.সি. পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ উপদান আর প্রচলিত বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় একইরকম মনে হতে পারে। কিন্তু এদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে। আই.সি. পদ্ধতিতে বাক্যকে ধরা হয় বিভিন্ন উপাদানের স্তর পরস্পর বা অব্যবহিত উপাদানের সুনিদিষ্ট বিন্যাস নয়।[১০] তাই আই.সি. পদ্ধতির প্রত্যক্ষ উপাদান আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যেমন: সে নীল শাড়ি পরলু ( সে নীল শাড়ি পরেছিল)

### খ. *উপাদান*

প্রত্যক্ষ উপাদানের পরের পর্যায় উপাদান যেমন—যে ছুড়াডা কাল এসিলো তার বাড়ি যাব (যে ছেলেটি কাল এসেছিল তাদের বাড়ি যাবো) এখানে 'যে ছুড়াডা কাল এসিলো' অংশটিকে উপাদান বলা যায়।

---

[৯] রাশিদা বেগম, "আই.সি. পদ্ধতি" *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা*, কার্তিক-চৈত্র- ১৩৮৪, পৃ. ৫৬।
[১০] রাশিদা বেগম, পৃ. ৫৭।

গ. *গঠন*

গঠন হলো উপাদানের চেয়ে ছোট। যেমন 'যে ছুড়াডা; 'কাল এসিলো; 'তার বাড়ি' এগুলো গঠনের পর্যায় ফেলা যায়।

ঘ. *অন্ত্য উপাদান*

বাক্য বিশ্লেষণ শেষ পর্যায়ে পড়ে। অন্ত্য উপাদান টুকরো টুকরো শব্দ, যাকে আমরা রূপমূলও বলা যায়। যেমন যে / ছুড়াডা / কাল / এসিলো / তার / বাড়ি / যাব / প্রত্যোকটিই অন্ত্য উপাদান। ছকের সাহায্যে বাক্যের এই একটি দিককে উদাহরণ দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

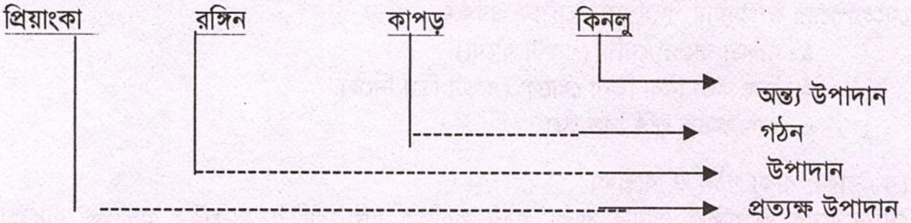
প্রিয়াংকা
রঙ্গিন
কাপড়
কিনলু
অন্ত্য উপাদান
গঠন
উপাদান
প্রত্যক্ষ উপাদান

**বাক্য বিশ্লেষণ**

উদাহরণ: এট্টা মেইয়ি শাড়িডা পছন্দ করিল (একটা মেয়ে শাড়িটা প্‌ছন্দ করেছিলো)

বাক্য= বি অ + ক্রি অ
বিশেষ্য অংশ → নিদের্শক + বিশেষ্য
ক্রিয়া অংশ → বিশেষ্য + নির্দেশক + ক্রিয়া

তাহলে দেখা যায় যায়–

বাক্য = বি অ + ক্রি অ
= নি + বি +বি অ + ক্রি
= এট + মেইয়ি + শাড়ি + ডা + ক্রি
= এট্টা + মেইয়ি + শাড়ি +ডা + ক্রি
= এট্টা + মেইয়ি + শাড়ি ডা + পছন্দ + করিল

বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে এভাবে দেখানো যায়:

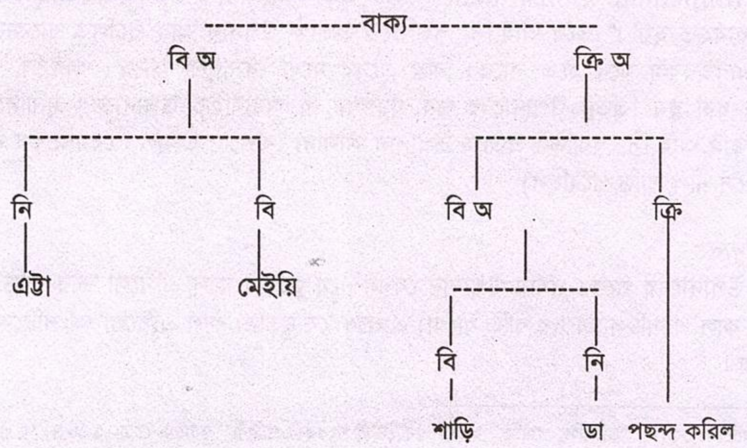
বাক্য
বি অ
ক্রি অ
নি
বি
বি অ
ক্রি
এট্টা
মেইয়ি
বি
নি
শাড়ি
ডা
পছন্দ করিল

আই.সি পদ্ধতিতে যেমন অনেক সুবিধা আছে তেমনি অনেক অসুবিধা আছে। আই.সি. পদ্ধতি বাক্যের অন্তভাগের গঠনের স্পষ্টতা আনতে পারে না। তবে নোয়াম চমস্কির রূপান্তরমূলক উৎপাদনী ব্যকরণে এই অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। বাক্যের 'অন্বয়ের ভেতরে দুটো স্তর আলাদা করা দরকার- এটাই চমস্কির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। বাক্যের অন্তবিন্যাসে তার 'ভাগ-সংস্থান বা বিভাজন হতে পারে এরকম, বর্হিবিন্যাসের স্তরে হতে পারে আরেক রকম"।[১১]

বাক্য: সীমা দুধ টুকুন খেয়িলো (সীমা দুধ টুকু খেয়েছিল)

রূপান্তর করলে যে সব বাক্য পাওয়া যেতে পারে:

ক. সীমা দুধ টুকুন খাইনি
খ. সীমা কি দুধ টুকুন খেয়িলো ?
গ. সীমা কি খেয়িলো ?

এখানে প্রত্যেক বাক্যই মৌলিক অর্থ ও ব্যাকরণগত সম্পর্ক নিয়ে আছে। বহির্ভাগ গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বাক্যই স্বতন্ত্র।

### বাক্য রূপান্তর

চমস্কি বাক্যের বহির্ভাগীয় ও অন্তর্ভাগীয় গঠনের সঙ্গে কেন্দ্রস্থানীয় বাক্যের (Kernet sentence) উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রস্থানীয় বাক্য বলতে সাধারণত সহজ সক্রিয় ও ঘোষণামূলক বাক্য বোঝায়। এদিক থেকে কেন্দ্রস্থানীয় বাক্য কয়েকটি রূপান্তরসূত্র, যেমন প্রশ্নবোধক নঞর্থক ও কর্মবাচ্যমূলক রূপান্তরের অধীন।[১২] যেমন:

কেন্দ্রস্থানীয় বাক্য : ছেলিডা ভাত খাচ্ছি
প্রশ্নবোধক রূপান্তর : ছেলিডা কি ভাত খাচ্ছি ?
নঞর্থক রূপান্তর : ছেলিডা ভাত খাচ্ছি না।
বর্মবাচ্যমূলক রূপান্তর : ভাত ছেলিডার দ্বারা খাওয়া হচ্ছে (অপ্রচলিত)।

চলিত বাংলা ও মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার বাক্য গঠন প্রায় একই।

### মেহেরপুরের ভাষা : সমাজ ভাষাতত্ত্ব

Giddens-এর মতে 'মানুষকে নিয়েই সমাজ' "ম্যাকাইভার সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝিয়েছেন যার মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়।[১৩] প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনই একটি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। সমাজে মানুষ একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে ভাষার মাধ্যমে 'ভাষা থেকে মানুষের দৃষ্টিকোণ সমাজ পরিবেশ ইত্যাদি জানা যায়। অধিকাংশ ব্যক্তির কথাবার্তা থেকে উচ্চারণের ঝোঁক থেকে স্বরভঙ্গি অথবা শব্দ ব্যবহার থেকে বোঝা যায় সে ব্যক্তি কোন দেশের কোন এলাকার লোক ; তার বিদ্যা বুদ্ধির গভীরতা-ব্যাপকতা কতোখানি' সমাজে ব্যক্তির অবস্থান বিশেষত শ্রেণীগত ব্যবধান অধিকাংশ

---

[১১] প্রবাল দাসগুপ্ত, "বৈজ্ঞানিক কল্পনার ভগীরথের ভূমিকায় চমস্কি" *জিজ্ঞাসা,* সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়, (শ্রাবণ ১৩৮১), পৃ. ১৬২-৬৩।

[১২] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পৃ. ৩৭২।

[১৩] জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ, *কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ৩২।

ক্ষেত্রেই ব্যক্তির উচ্চারিত ভাষা থেকে জানা যায়।[১৪] 'সামাজিক ভাষার বৈষম্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষা, রুচিবোধ, সংস্কৃতি, পেশা ও অর্থনৈতিক দিক বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে' সমাজ ও ভাষা দুটি বিষয়ই স্বতন্ত্র কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ।[১৫]

প্রত্যেক সমাজেই ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ বিভিন্ন ধর্ম ও পেশার লোকের বসবাস আর সেকারণেই একই ভাষায় কথা বললেও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের সাথে সাথে ভাষিক স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় পরিবেশ এ জেলার মানুষকে বৈচিত্র্যসন্ধানী করেছে। ফলে লিঙ্গগত ও পেশাগত ভিন্নতার সাথে সাথে ভাষার শব্দ ব্যবহারে উচ্চারণে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

### *নারী ও পুরুষের ভাষা*

সমাজ গঠনে নারী এবং পুরুষের সমান অবদান কিন্তু নারী ও পুরুষের জীবনাচরণের ধারা এক রকম নয়। 'প্রাচীনকালে পুরুষেরা শিকারি পেশায় নিয়োজিত থাকতেন আর নারীরা কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকতেন। তার ফলে উভয় শ্রেণীর কথোপকথনের ক্ষেত্রে বিষয়গত পার্থক্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এমন এক সময় ছিল যখন নারীদের পক্ষে বিশেষ কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল এবং পুরুষরাও নারীদের মধ্যে প্রচলিত অনেক শব্দ ব্যবহার করতেন না'।[১৬]

বর্তমানে এই রীতি অনেকটাই প্রচলিত। মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষায় নারী পুরুষের কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পুরুষেরা স্ত্রীকে সম্বোধন করেন সন্তানের নামের সাথে মা যোগ করে যেমন 'ও সালমার মা' অন্যদিকে স্ত্রীরা স্বামীদেরকে 'ওগো শোনো-শুনছ অথবা সন্তানের নামের সাথে বাপ বা আব্বা যোগ করে সম্বোধন করেন 'সালমার বাপ, 'করিমের আব্বা' ইত্যাদি। আবার অনেক স্ত্রী তার স্বামীকে বাড়িওয়ালা সম্বোধন করেন যেমন "আমাদের বাড়িওয়ালা বাড়ি নেই'।

মেহেরপুরে এখনো মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নারীরা স্বামী, ভাসুর, শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করাকে পাপ বলে গণ্য করে। এসব ক্ষেত্রে তারা প্রতীকী রূপমূল ব্যবহার করে। যেমন: গ্রামের অশিক্ষিত রমণীর স্বামীর নাম কদর হওয়ায় 'লাইলাতুল কদর' না বলে রমণীটি উচ্চারণ করে 'লাইলাতুল পাচুর ভাই'। আবার স্বামীর নাম 'ইলাহি' হওয়ায় নামাজ পড়তে করতে গিয়ে অশিক্ষিত নারীরা স্বামীর নাম মুখে আনে না। অনেক অশিক্ষিত নারী প্রতীকী রূপ ব্যবহার করে নামাজ পড়ে যেমন:

> 'কুল আউজুবি রাব্বি নাচ
> মালিকিন নাচ
> বাড়ির মিনশি শুদ্দু নাচ'

আবার ভাসুরের নাম আল়ামিন ও রহমান হওয়ায় নামাজের সুরা পড়ার সময়ে প্রতীকী রূপ ব্যবহার করে বলে:

> 'আলহামদুলিল্লাহিরাব্বিল বুদুর বাপ আর জলিলের বাপ'

বিয়ের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষ করা যায় যেমন:

---

[১৪] রাজিব হুমায়ুন, "সমাজ ভাষা বিজ্ঞান" *ভাষা বিজ্ঞান পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮০, পৃ. ৩৫।

[১৫] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পৃ. ১৪৬।

[১৬] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পৃ. ১৪৯।

আয়শা- গত বছর আমার বিয়ি হয়িছে-
রহিম - গত বছর আমি বিয়ি করিছি।

*শিক্ষিতদের ভাষা*

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মেহেরপুরে শিক্ষিতের হার ১৮.৪১% । এর মধ্যে পৌর এলাকায় শিক্ষিতের হার ৪১.০৩% এবং গাংনীতে শিক্ষিতের হার ১৭%।[১৭] মেহেরেপুর অবিভক্ত নদীয়ার অংশ ছিল। অবিভক্ত নদীয়ার নবদ্বীপ অঞ্চল আবহমান কাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত। তাই প্রাচীনকাল থেকে মেহেরপুরে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন। নিচে শিক্ষিতদের ভাষা ব্যবহার নমুনা দেওয়া হলোঃ

১। "স্টুপিড কোথাকার কোন কাজ ঠিকমতো করতে পারিসনি,"
২। "মুক্তিযুদ্ধ আমার প্রিয় প্রসঙ্গ। আর সে কারণেই ৭১' এর কথা মনে পড়লেই আমি স্মৃতিকাতর হয়ে যাই।"

মেহেরপুরে নারী পুরুষের ঝগড়ার মধ্যে পুরুষের মধ্যে শালা-শালী শব্দের ব্যবহার বেশী লক্ষ করা যায়। যেমন—"শালীর মাগীর কতা শোন।"

*অশিক্ষিতদের (নিরক্ষর) ভাষা*

'মেহেরপুর শহরে বিশেষ করে পৌর এলাকার অধিবাসীরা নিত্যদিনের কথ্য ভাষায় যে ভাবে কথা বলে তা সম্পূর্ণ কেতাবি ভাষা বলা চলে। তবে এই জেলার গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর মানুষর যে সমস্ত কথ্য ভাষা ব্যবহার করে থাকে তা বেশ একটু ভিন্নতর। যেমনঃ বুড়িপোঁতা, কামদেবপুর, ইচাখালী, কাথূলী, গাঁড়াবাড়িয়া ও বিলধলা গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থ মানুষ যেভাবে কথা বলে থাকেঃ 'আতি উটি খাবো' (রাতে রুটি খাবো) র'-এর উচ্চারণ 'আ' দিয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আরেকটি বাক্য : কুতগিয়িলিরে? অর্থ্যাৎ কোথায় গিয়েছিলে। এই একই বাক্য গাংনী কাজীপুর, বেতবাড়িয়া, চরগোয়াল গ্রামের অধিবাসীরা এইভাবে বলে থাকেন 'কুণ্ঠেগিয়িলেরে'।[১৮]
অশিক্ষিতদের ভাষার নমুনাঃ

১. সাজ ভাই : চৈত মাসের টিরটিরি রোদে মাট ঘাট খাঁ খাঁ করচি
২. আলমতারা কাইবা ফেলা
এ ভূঁইয়ের ঢেলা ও ভূঁইয়ে ফেলা
হালকা নড়ে খেজুর পড়ে
পড়ে খেজুরের গাছ
আল্লাহু আকবর"
৩. করিস : আমিও তাই বুলচি। পেরথম মেগ এইচে তো। একটা কিচু হোবেই। বাড়িতে আবার হয়তু বুলছে মিনসে এখুন এলুনা।

---

[১৭] Bangladesh Bureau of Statistics. *Statistical Accounts of Kushtia District,* 1983.
[১৮] সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, *মেহেরপুরের ইতিহাস* (মেহেরপুরঃ বই সাগর, ১৯৯৩), পৃ. ১৮৫।

## উপসংহার

মেহেরপুর অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার একটি প্রাচীন অঞ্চল। মেহেরপুরের ভাষা সেই প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে মেহেরপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। বাংলাদেশ নামক মানচিত্রটির অভ্যুদয়েও এ জেলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাভাষার প্রমিত রূপ বা আদর্শ চলিত বাংলার মূলভিত্তি হিসেবে যে নদীয়ার কথা বারবার উঠে আসে সেই নদীয়াই বর্তমানে মেহেরপুর। তাই বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিকট 'মেহেরপুরের ভাষা' স্বাভাবিকভাবেই আলাদা তাৎপর্য বহন করে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# বাংলা ভাষায় সাব'উল মু'আল্লাকাত (সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা) চর্চার ধারা ও প্রকৃতি

মো. নিজাম উদ্দীন*

**Abstract :** *Sab'ul Mu'allaqat* designates an amazing resource of Arabic literature. Being impressed with its subject matter and stylistic aspects, speakers of different languages have studied it in their respective languages. *Mu'alladqat* has been translated in Bengali also. Maulana sharfuddin, Maulana Nuruddin, Dr. Muhammad shahidullah, Md. Abu Ashraf and Iqbal Shailo have played a pioneer role in this case, and have garnered fame accordingly. The writers (translators) have presented the Bengali speaker with the background of its composition, relevant history, translation, notes, and explanation in lucid and smooth Bengali. The discussion of their books, evaluation of their styles and the investigation of the appropriacy of their translation, explanation, analysis of background and notes form the core of this article.

## ভূমিকা

আরবি সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি *সাব'উল মু'আল্লাকাত* বা 'সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা'। এগুলো প্রাক-ইসলামি যুগে খ্রিস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত। কিন্তু আজো তা বিশ্ব সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আরবি সাহিত্যের গবেষকগণের যে কেউ এর ছান্দসিক সৌন্দর্য ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী আরবি সাহিত্যানুরাগীগণ স্ব স্ব ভাষায় *সাব'উল মু'আল্লাকাত*-এর ব্যাখ্যা, অনুবাদ, টীকা সংযোজন, রচয়িতাদের জীবনালেখ্য আলোচনাসহ বিভিন্নভাবে তা চর্চা করেছেন। বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও *সাব'উল মু'আল্লাকাত* চর্চা হয়েছে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

---

[*] ড. মো. নিজাম উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় *সাব'উল মু'আল্লাকাত*-এর উপর প্রণীত গ্রন্থরাজি, অনুসৃত ধারা, পদ্ধতি, প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

### *সাব'উল মু'আল্লাকাত* পরিচিতি

আরবিতে *সাব'আ* শব্দের অর্থ সাত।[১] *মু'আল্লাকাত* শব্দটি বহুবচন, এটি একবচনে *মু'আল্লাকাহ*, অর্থাৎ ঝুলন্ত।[২] সাধারণত প্রাক ইসলামি যুগের বিখ্যাত সাতজন কবির নির্দিষ্ট সাতটি গীতি কবিতাকে *সাব'উল মু'আল্লাকাত* বলা হয়।[৩] মক্কা নগরীর নিকটবর্তী '*উকায* নামক স্থানে কাব্য প্রতিযোগিতায় এ কবিতাগুলো পুরস্কৃত হয়েছিল।[৪] অধিকাংশের মতে পরবর্তীতে মিসরীয় ক্ষৌম বস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখে এগুলোকে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এ কারণেই এ সাতটি কবিতা ইতিহাসের পাতায় *মু'আল্লাকাত* হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।[৫] ইতিহাস খ্যাত এই সাতজন[৬] কবি হলেন: ইমরুউল কায়স (৫০০-৫৪০)[৭], তারাফাহ ইবনুল 'আবদ (৫৪৩-৫৬৯)[৮], লাবীদ ইবন রাবী'আহ (৫৬০-৬৬১)[৯], যুহায়র ইবন আবী সুলমা (৫৩০-৬২৭)[১০], 'আনতারাহ

---

[১] ইবরাহীম মাদকূর ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াজীয* (মিসর: মাজমা'উল লুগাহ আল 'আরাবিয়্যাহ, ২০০৬), পৃ. ৩০১।

[২] *তদেব*, পৃ. ৪৩১।

[৩] A. J. Arberry, *The Seven Odes* (London : George Allen and Unwin Ltd., 1957), p. 16 ; H. A. R. Gibb, *Arabic Literature* (Oxford : Clarendon Press, 1963), p. 22 ; আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইল উলূম, ১৯৯৪), পৃ. ৯৮।

[৪] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৫), পৃ. ৯৮।

[৫] ইবন রাশীক আল কায়রুওয়ানী, *আল 'উমদাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮১), পৃ. ৯৬।

[৬] অধিকাংশের মতে মু'আল্লাকার কবিদের সংখ্যা সাত। তবে কেউ কেউ আট অথবা দশ এর কথাও উল্লেখ করেছেন। দ্র: *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী* পৃ. ৫৬।

[৭] ইমরুউল কায়স আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনের কিন্দাহ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তার কাব্য প্রতিভা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আজও স্বীকৃত। সপ্ত মু'আল্লাকার প্রথমটি তিনি রচনা করেন। তিনি ৫৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র: *আল মুফাসসাল*, পৃ. ৫৭-৬৪ ; সাইয়্যেদ আহমাদ আল হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: মুওয়াসসাতুত তারীখ আল 'আরাবী), পৃ. ২৪৬-২৪৮; আহমাদ হাসান আয যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৭), পৃ. ৩৭-৩৯।

[৮] তারাফাহ ইবনুল 'আবদ বাহরাইনের বনূ বাকর ইবন ওয়ায়িল গোত্রের কবি ছিলেন। আজন্ম ইয়াতীম তারাফাহর উপর পিতৃব্যদের অত্যাচারের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম আল মু'আল্লাকাহ রচনা করেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দ্র: হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: আল মাতবা'আতুল বূলিসিয়্যাহ), পৃ. ৯৭-১১১।

[৯] লাবীদ ইবন রাবী'আহ জাহিলী যুগের বনূ 'আমির গোত্রের বেদুঈন কবি ছিলেন। তিনি ৫৬০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বীর যোদ্ধা এবং দাতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তৃতীয় মু'আল্লাকাহ

ইবন শাদ্দাদ (৫২৫-৬১৫)[১১], 'আমর ইবন কুলছূম (মৃত্যু ৫৮৪)[১২] এবং আল হারিছ ইবন হিল্লিযাহ (মৃত্যু ৫৭০)।[১৩]

## বাংলা ভাষায় মু'আল্লাকাত চর্চা

বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট আরবি ভাষা ও সাহিত্য প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত। ধর্মীয় কারণে তারা আরবি ভাষা শিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। ইসলামি শরিয়াতের মৌলিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন প্রয়োজন। তাই আরবি ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য আরবি সাহিত্য অধ্যয়নে এদেশের অনেকেই ব্রতী হয়েছেন। আরবি সাহিত্যের আলোচিত কাব্যমালা *সাব'উল মু'আল্লাকাত* এভাবেই বাংলা ভাষাভাষী আরবি সাহিত্যের প্রাগ্রসর পাঠক-পাঠিকাদের হাতে আসে। এ দেশের ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম দীর্ঘকাল থেকে উর্দু ও ফার্সি ভাষা ছিল। তাই ধর্মীয় কারণে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন মাধ্যমও বাংলায় অনেক দেরিতে হয়েছে। তথ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষায় প্রথম *মু'আল্লাকাত* চর্চা হয় ১৯৩৩ সালে।[১৪] এরপর এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রবন্ধ লিখন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণা (এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি.) হয়েছে অসংখ্য। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধ শুধুমাত্র বাংলাভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে সাব'উল মু'আল্লাকাতের যে চর্চা হয়েছে, তার ধারা ও প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এ পর্যন্ত সাব'উল মু'আল্লাকাত বিষয়ে বাংলাভাষায় প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা চার। এগুলো হলোঃ

১. মৌলানা নূরুদ্দীন প্রণীত *অস্-সবউ-ল্- মু'অল্লাকাত*
২. ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত *প্রাচীন আরবি কবিতা*
৩. মাওলানা আবু আশরাফ প্রণীত *সাব'য়ে মু'য়াল্লাকাত* এবং
৪. ইকবাল শাইলো প্রণীত *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম*।

---

রচনা করেন। মু'আল্লাকার কবিদের মধ্যে তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মু'আবিয়াহ (রা.)-এর খিলাফাত কালে তিনি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ *আল মুফাসসাল*, পৃ. ৮৪-৮৬।

১০ যুহায়র ইবন আবী সুলমা ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে মুযায়না গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। 'আবস ও যুবইয়ান গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে তিনি চতুর্থ মু'আল্লাকাহ রচনা করেন। তিনি ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ১১৮-১৬৪।

১১ 'আনতারাহ ইবন শাদ্দাদ নজদের 'আবস গোত্রে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বীরযোদ্ধা ছিলেন। পঞ্চম মু'আল্লাকাহ তিনিই রচনা করেন। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করে। দ্রঃ *জুরজী যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২২।

১২ 'আমর ইবন কুলছূম আরবের বনূ তাগলিব গোত্রের কবি ছিলেন। বনূ বকরের সাথে তাদের ভয়াবহ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তিনি ষষ্ঠ মু'আল্লাকাহ রচনা করেন। তিনি ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

১৩ আল হারিছ ইবন হিল্লিযাহ বনূ বকর গোত্রের নেতা ছিলেন। বনূ তাগলিবের সাথে তাদের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে তিনি সপ্তম মু'আল্লাকাহ রচনা করেন। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। দ্রঃ *আল মুফাসসাল*, পৃ. ৭৩-৭৫।

১৪ *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ৮।

তবে সর্ব প্রথমেই আমরা আলোচনা করব মৌলানা *শরফুদ-দীনকৃত মু'আল্লাকাহ-* এর কাব্যরূপ সম্পর্কে। কারণ তিনিই বাংলা ভাষায় *মু'আল্লাকাত* চর্চার পথিকৃৎ।[১৫]
নিম্নে মৌলানা শরফুদ-দীনের কাব্যানুবাদ ও উপরিউক্ত চারটি গ্রন্থে *মু'আল্লাকাত* চর্চার ধারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

**শরফুদ-দীন এর কাব্যরূপ**

ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মৌলানা শরফুদ-দীন পত্র-পত্রিকায় *সাব্'উল মু'আল্লাকাত* সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম মু'আল্লাকার কিছু কিছু পঙক্তির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদগুলো *মাসিক মেহোম্মদী* পত্রিকার ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩[১৬] এবং একই বর্ষের ১১ শ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৩৪[১৭] এ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় *মু'আল্লাকাহ*-এর প্রথম অনুবাদ হিসেবে মৌলানা শরফুদ-দীনকৃত এ খণ্ডিত অনুবাদের ঐতিহাসিক মূল্যমান অনস্বীকার্য। পরবর্তীতে যারা *সাব'উল মু'আল্লাকাত*-এর বঙ্গানুবাদ বিশেষত কাব্যানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই মৌলানা শরফুদ-দীন-এর অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

মৌলানা শরফুদ-দীন ইমরুউল কায়স রচিত প্রথম *মু'আল্লাকার* ১-৯, ২৪-৩৫, ৪০-৪১, ৭০-৮১ পংক্তি,[১৮] তারাফাহ রচিত দ্বিতীয় মু'আল্লাকার ৫৩-৬১,[১৯] 'আমর ইবন কুলছূম রচিত পঞ্চম মু'ল্লাকার ২৩-২৫, ৫৪-৫৭, ৯৬-১০৩[২০] এবং আল-হারিছ ইবন হিল্লিযাহ রচিত সপ্তম মু'আল্লাকার ২৩-৩০ ও ৩৫-৪০[২১] পঙক্তিগুলোর কাব্যানুবাদ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম মু'আল্লাকার প্রথম নয় পঙক্তির অনুবাদ মূল আরবির অন্ত্যানুপ্রাস অনুযায়ী অনূদিত হয়েছে।[২২]

মৌলানা শরফুদ-দীন্ উপর্যুক্ত অনুবাদের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ মূলের উপর অনেকটা নির্ভর করলেও অনেক জায়গায় তাঁর স্বাধীন মনোভাব পরিস্ফুটিত হয়েছে। যেমন ইমরুউল কায়সের নিম্নোক্ত পঙক্তিটির অনুবাদ এভাবে করেছেন:

تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا * على حراصا لو يسرون مقتلى[২৩]
নিশীত রজনী সান্ত্রী সজাগ, আমার নিধন তরে

---

[১৫] মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, *অস্-সব'উ-ল-মু'অল্লকাত*, মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২), পৃ. ৪৫।

[১৬] *মাসিক মোহাম্মদী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

[১৭] *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ১১ শ সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৩৪, পৃ. ১৭।

[১৮] *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ৮-১৪।

[১৯] *তদেব*, পৃ. ১৫।

[২০] *তদেব*, ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৩৪, পৃ. ১৭।

[২১] *তদেব*, পৃ. ১৮।

[২২] আরবী লাম কাফিয়ার এ মু'আল্লাকার অনুবাদ বাংলার ল অন্ত্যানুপ্রাস অনুযায়ী রচিত হয়েছে। দ্র: *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ৮।

[২৩] আয যাওযানী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'* (বৈরুত : দারুল আরকাম, ১৯৯৭), পৃ. ৭৩।

বুকের মানিক জেগে আছে যথা আমি যাই সেই ঘরে।[২৪]

এই পঙক্তিতে إليها শব্দের অর্থ 'তার (প্রেমিকার) নিকট'। কিন্তু মৌলানা শরফুদ-দীন এর অনুবাদ করেছেন: "বুকের মানিক জেগে আছে যথা আমি যাই সেই ঘরে"।

এছাড়াও ইমরুউল কায়সের মু'আল্লাকায় হিজায, নজদ ও ইয়েমেনের যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলোর এ কাব্যানুবাদে বাংলা উচ্চারণ যথাযথ হয়নি। যেমন ইমরুউল কায়সের মু'আল্লাকায় *দাখূল, হাওমাল, তূদিহ, মিকরাত,*[২৫] *ইয়ামান,*[২৬] প্রভৃতি স্থানের নামের বাংলা উচ্চারণ যথাক্রমে তিনি লিখেছেন দখুল, হমল, তুজে, মাকরাৎ[২৭] ও ইমন।[২৮] এ ছাড়াও তিনি কোথাও কোথাও অনুবাদ যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করেছেন। যেমন ইমরুউল কায়সের শেষ দুই পঙক্তিতে কবি বলেন:

كان مكاكى الجواء غدية * صبحن سلافا من رحيق مفلفل
كان السباع فيه غرقى عشية * بارجائه القصوى أنابيس عضل[২৯]

অনুবাদ:'যেন 'জাওয়া' বনের 'মাকাকী' পাখিরা সকালবেলা গোল মরিচ মিশানো পুরাতন শরাব পান করে সুরাসক্ত, নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যাকালে 'জাওয়ার' দূরদূরান্ত অঞ্চলে ডুবন্ত হিংস্র প্রাণীগুলোকে বন্য পিয়াজের শিকড়ের ন্যায় মনে হচ্ছিল।'

কিন্তু মৌলানা শরফুদ-দীন এই দুই লাইনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এভাবে করেন:

উষার আলোকে নামিল যখন শান্ত অবনীতল
আমোদ মাতাল বিহগ-কূজনে ভরিল বনস্থল।[৩০]

অনুরূপভাবে কবি ইমরুউল কায়সের প্রেমিকা উম্ম হুওয়ায়রিছের[৩১] নাম উম্ম হারিস[৩২] হিসেবে এ অনুবাদে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মৌলানা শরফুদ-দীন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের খানিকটা আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে *মু'আল্লাকাহ* বিষয়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এ অনুবাদ করেছেন। তাই তিনি মূলের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য না রেখে পাঠকের চাহিদা এবং ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাসের গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন। এতে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অনুবাদ ব্যহত হলেও বাংলা ভাষায় সাব'উল মু'আল্লাকা চর্চার প্রথম নিদর্শন হিসেবে এ অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

[২৪] *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ১০।

[২৫] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ৫৯।

[২৬] তদেব, পৃ. ৬২।

[২৭] *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ৮।

[২৮] তদেব, পৃ. ১৪।

[২৯] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ৬২।

[৩০] *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ১৪।

[৩১] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ৫৯।

[৩২] *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ৮।

## মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ এর *অস্-সব'উ-ল-মু'অল্লকাত*

এ গ্রন্থটি ড. মুহম্মদ এনামুল হক-এর সম্পাদনায় ১৯৭২ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (বর্তমান বাংলা একাডেমী) থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৩৩] বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট আরবের প্রাগৈসলামিক যুগের যে পরিবেশে *সাব'উল মু'আল্লাকাত* এর কাসিদাহসমূহ রচিত হয়েছিল তার সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় প্রদান না করলে এ কবিতাগুলোর রস আস্বাদন সম্ভব নয়। তাই মৌলানা নূরুদ্দীন তাঁর *অস্-সব'উ-ল-মু'অল্লকাত* গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডে[৩৪] আরব, আরব জাতি ও আরবি ভাষা, অজ্ঞতা যুগ, প্রাক-ইসলামিক আরব কবি, আরবি কবিতার সংগ্রহ ও সংকলন, আরব জীবনে মূল্যবোধ, বাংলা ভাষায় মু'আল্লাকার পূর্ববর্তী অনুবাদ এবং এ পুস্তক সম্পাদনে সহায়ক গ্রন্থ বিবরণী উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে মু'আল্লাকাহ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়, রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, মু'আল্লাকাহ পর্যালোচনা, অনুবাদ এবং মূল আরবি কাব্য উলিখিত হয়েছে।[৩৫]

মৌলানা নূরুদ্দীন মু'আল্লাকাহগুলোর কাব্যরূপ দেওয়ার সময় বাংলা স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার না করার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন: "মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রকৃতিতে কৃত্রিম ও ভব্য এবং আচরণে বেশ পোশাকী ও আটঘাট বাঁধা বলিয়া মু'অলকাহ এর ন্যায় সুদীর্ঘ গীতিকায় ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।"[৩৬]

তিনি প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই পাঁচটি মু'আল্লাকায় স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং দ্বিতীয় ও সপ্তম মু'আল্লাকায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে মৌলানা নুরুদ্দীন বলেন: "আমার মনে হইয়াছে স্বরবৃত্ত ছন্দই গীতিকাগুলোর অনুবাদে প্রশস্ততর। তবে, রুচি পরিবর্তনের অর্থাৎ ছন্দের একঘেঁয়েমি পরিবর্তনের জন্য উভয় ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি। নতুবা ইহার অন্য কোন বিশেষ কারণ নাই।"[৩৭]

*মু'আল্লাকাহ* -এর পঙক্তিগুলো দুইটি অংশে বিভক্ত। মৌলানা নূরুদ্দীন অধিকাংশ পঙক্তির এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিটি পঙক্তির দুই লাইনে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। তবে ভাব ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনুবাদের সামাঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর না হওয়ায় অগত্যা তিনি দু-এক জায়গায় মূলের অনুপাতে কাব্যানুবাদে শ্লোকের ব্যাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন। এ সকল ক্ষেত্রে মূলের শ্লোক সংখ্যার সাথে অনুবাদ শ্লোক সংখ্যার মিল রাখার জন্য 'ক' ও 'খ' চিহ্নের দ্বারা মূল শ্লোকের ব্যাপ্তির নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন:

لخولة أطلال ببرقة ثهمد * تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد[৩৮]

উল্লিখিত পঙক্তির কাব্যানুবাদ করেছেন তিনি এভাবে:

---

[৩৩] *অস্-সব'উ-ল্-মু'অল্লকাত*, পৃ. (১) ও (২)

[৩৪] তদেব, পৃ. ১-৫৩।

[৩৫] তদেব, পৃ. ৫৪-৩৩৪।

[৩৬] তদেব, পৃ. ।√০-॥০।

[৩৭] তদেব, পৃ. ॥০-॥/।

[৩৮] শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব', পৃ. ১০১।

(১ক) খাওলা চলিয়া গেছে 'পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা' তার,
আজিও উজ্জ্বল হেথা, স্মৃতি-চিহ্ন আমার প্রিয়ার।
(১খ) 'সমদ' মরুর ভূমে, সেই চিহ্ন আজো দেখা যায়,
করপৃষ্ঠে লুপ্ত প্রায়, উল্কিসম রেখায়-রেখায়।[৩৯]

সাব'উল মু'আল্লাকাতের অনুবাদ সহজসাধ্য নয়। এ প্রসঙ্গে R. A. Nicholson-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "It must be confessed that no rendering of the Mu'allaqat can furnish European readers with a just idea of the original, a literal version least of all."[৪০]

অর্থাৎ 'স্বীকার করতে হবে যে, *মু'আল্লাকাত*-এর কোনো অনুবাদ ইউরোপীয় পাঠককে মূলের ধারণাটুকু দিতে অক্ষম, আক্ষরিক অনুবাদ তো নয়ই।'

বাংলা ভাষায় *মু'আল্লাকাতের* অনুবাদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তবে এই দুঃসাধ্য কাজকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুচারুরূপে সমাধা করেছেন মৌলানা নূরুদ্দীন। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালি যিনি সাব'উল মু'আল্লাকার পূর্ণাঙ্গ কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেছেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি মূলের সাথে সঙ্গতি রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি 'আমর ইবন কুলছূম রচিত ষষ্ঠ মু'আল্লাকার নিম্নোল্লিখিত পঙক্তিটির অনুবাদ করেছেন এভাবে:

ألا هبى بصحنك فأصبحينا * تبقى خمور الاندرينا[৪১]

"ওঠো সখি ! দাও গো শরাব
বিরাট তোমার পাত্র ভরি,
আন্দরীনের মধুর শরাব
কাহার লাগি রাখবে ধরি ?"[৪২]

অনুবাদ করার সময় মৌলানা নুরুদ্দীন পাদটীকায় শব্দ-বিশ্লেষণ করে অনুবাদকে পাঠকের কাছে বোধগম্য করার প্রয়াস চালিয়েছেন। যেমন:

"শুনাও মিত্র-গোত্রগণে
আমার প্রাণের এই আবেদন,
সন্ধি তবে 'জুবান'- সবাই
কসম খেয়ে করলো যে পণ।"[৪৩]

পঙক্তিতে 'জুবান' এর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি টীকায় উল্লেখ করেন:

"জুবান মূল আরবি যুবয়ান (ذبيان)। 'জুবান-সবাই' কথার দ্বারা 'যুবয়ান' ও তাহাদের মিত্র গোত্র বনূ অসদ এবং বনূ ঘত্বফান-কে বুঝাইতেছে। যুবয়ান- গোত্র এবং

---

[৩৯] অস্‌-সব'উ-ল্‌-মু'অল্লকাত, পৃ. ৯৮-৯৯।

[৪০] R. A. Nicholson, *A literary History of the Arabs* (Chambridge: Chambridge University Press, 1953), p. 103.

[৪১] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১৮৯।

[৪২] *অস্‌-সব'উ-ল-মু'অল্লকাত*, পৃ. ১৭৫।

[৪৩] তদেব, পৃ. ১৩৪।

তাহাদের বন্ধু গোত্রগুলির প্রত্যেকে আল্লাহর নামে 'কসম' করিয়া সন্ধি রক্ষার পণ করে। কবি তাহাদিগকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।"[৪৪]

অনুবাদে যেখানে ব্যক্তি, বস্তু ও স্থানের নাম এসেছে সেক্ষেত্রে অনুবাদক বাংলা ছন্দ রক্ষা করতে গিয়ে মূল আরবির হুবহু প্রতিবর্ণায়ন না করে সঙ্গতিপূর্ণ বাংলা উচ্চারণ লিখেছেন। তবে পাদটীকায় মূল আরবি ও প্রতিবর্ণায়িত বাংলারূপ উলেখ করেছেন। যেমন:

" 'রিয়ান' গিরির জীর্ণ নালা
যায় আজিও স্পষ্ট দেখা
দেয়নি মুছে পাষাণ যেমন
অঙ্গ থেকে স্মৃতির রেখা।"[৪৫]

পঙক্তিতে 'রিয়ান' একটি পর্বতের নাম। এর প্রকৃত আরবি প্রতিবর্ণায়ন ও অর্থ প্রসঙ্গে মৌলানা নূরুদ্দীন টীকায় উলেখ করেন:

"রিয়ান- মূল আরবি "রৈয়ান: (ريان)। ইহা একটি পাহাড়ের নাম।"[৪৬]

প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে মৌলানা নূরুদ্দীন তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের (বর্তমান বাংলা একাডেমী) প্রকাশিত 'আরবি বাংলা অভিধান'-এ ব্যবহৃত বাংলা প্রতিবর্ণায়ন রীতি গ্রহণ করেছেন।

সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যায় যে, মৌলানা নূরুদ্দীন প্রণীত *অস্-সব'উ-ল-মু'আল্লাকাত* একটি অনন্য গ্রন্থ। মু'আল্লাকার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ, কবিদের জীবনালেখ্য বর্ণনা, মূল কবিতার কাব্যানুবাদ ও টীকা সংযোজন সবকিছু মিলিয়ে বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কিন্তু এটি পরবর্তীতে আর প্রকাশিত হয়নি। তাই গুরুত্ব বিবেচনা করে এটির পুনঃপ্রকাশ প্রয়োজন। তবে প্রতিবর্ণায়ন রীতিসহ বেশ কিছু বিষয়ের পরিমার্জন প্রয়োজন।

### ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত *প্রাচীন আরবী কবিতা*

কলিকাতা মাদরাসা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ফার্সী ও তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ *সাব'উল মু'আল্লাকাত* -এর গদ্যানুবাদ করার বিরল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি *প্রাচীন আরবী কবিতা* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কলিকাতা, উত্তরবঙ্গ ও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ শ্রেণীর পাঠ্যসূচি হিসেবে প্রণীত।[৪৭] তবে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাগণও এ গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। যদিও গ্রন্থটির নাম *প্রাচীন আরবী কবিতা*, কিন্তু এতে শুধুমাত্র *সাব'উল মু'আল্লকাত*

---

[৪৪] তদেব।

[৪৫] তদেব, পৃ. ১৪৯।

[৪৬] তদেব।

[৪৭] ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *প্রাচীন আরবী কবিতা* (কলিকাতা : বাণীবুক ষ্টল, ১৩৯৭ বাং), কভার পৃষ্ঠা।

كأنى غداة البين يوم تحملوا * لدى سمرات الحى ناقف حنظل [৫৪]

অনুবাদক এর অনুবাদ এভাবে করেছেন: "সেই বিচ্ছেদের দিন সকালে, যখন তারা মালপত্র নিয়ে চলে গেল, তখন আমি প্রিয়ার গোত্রের কাঁটাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছিলুম"।[৫৫]

কবির কবিতায় উল্লিখিত حنظل এক প্রকার ফলের নাম। যা ভাঙলে অশ্রু ঝরে। তাই তিনি মূল আরবি ناقف حنظل (হানযাল ভাঙছিলাম) এর সরাসরি অনুবাদ করেছেন "অশ্রু বিসর্জন করছিলুম"।

ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মূল আরবির প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে ভাব অনুবাদ করেছেন। তবে এতে মূলের কোনো অঙ্গহানি ঘটেনি। যেমন কবি যুহায়র বলেন:

يمينا لنعم السيدان وجدتما * على كل حال من سحيل ومبرم[৫৬]

এখানে মূলে উল্লিখিত سحيل শব্দের অর্থ এক তার সুতা[৫৭] এবং مبرم অর্থ পাকানো সুতা।[৫৮] তবে আরবি ভাষায় এ শব্দ দু'টি ভাবার্থে সুখ-দুঃখ বা সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উপরোক্ত পঙক্তির এভাবে সরাসরি অনুবাদ করেছেন: "আমি শপথ করে বলতে পারি, সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় তোমাদের মধ্যে দুজন মহান নেতাকে পাওয়া গেছে।"[৫৯]

মূল পঙক্তিতে আরবের কোনো সামাজিক রীতি কিংবা কিংবদন্তীর সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি তা পাদটীকায় উলেখ করেছেন। যেমন:

تأوى إلى الأطناب كل رذية * مثل البلية قالص أهدامها[৬০]

পঙক্তির তিনি অনুবাদ করেন: "মরণোন্মুখ উষ্ট্রীর মত শীর্ণকায়া ও জীর্ণবস্ত্র রমণীরা আমার গৃহের চতুর্দিকে আশ্রয় লাভ করে।"[৬১]

অতঃপর উল্লিখিত মরণোন্মুখ উষ্ট্রীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রাচীন আরবের এক সামাজিক রীতির কথা উল্লেখ করে তিনি পাদটীকায় লিখেন: "প্রাচীন আরবের প্রথা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উষ্ট্রীকে তার কবরের নিকট বেঁধে রাখা হত, সে খাদ্য পানীয়ের অভাবে সেখানেই মারা যেত, যাতে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর ঐ উষ্ট্রে আরোহণ করে উঠতে পারে।"[৬২]

তবে দু'এক জায়গায় মূলের সাথে অনুবাদের বৈসাদৃশ্যও ঘটেছে। যেমন কবি তারাফাহ রচিত:

---

[৫৪] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ৫৯।
[৫৫] *প্রাচীন আরবী কবিতা*, পৃ. ২২-২৩।
[৫৬] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১৩৪।
[৫৭] *আল মু'জামুল ওয়াজীয*, পৃ. ৩০৫।
[৫৮] তদেব, পৃ. ৪৭।
[৫৯] *প্রাচীন আরবী কবিতা*, পৃ. ৪৯।
[৬০] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১৫৮।
[৬১] *প্রাচীন আরবী কবিতা*, পৃ. ১৫৮
[৬২] তদেব।

রচয়িতাদের জীবনী, কাব্য প্রতিভা, মু'আল্লাকার বিষয়বস্তু এবং সরল গদ্যানুবাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেন: "আরবি সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ সাহিত্যরসিক নর-নারী যাতে আরবি গীতিকবিতা তথা প্রাচীন আরবি কবিতার রসাস্বাদন করতে পারেন এমন একটি বাংলা গ্রন্থের অভাব বোধ করেছি দীর্ঘদিন ধরে। সেই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই অধমের এই অক্ষম প্রয়াস"।[৪৮]

অধ্যাপক শহীদুল্লাহ *সাব'উল মু'আল্লাকাত*-এর অনুবাদ করতে গিয়ে মূলের সাথে যথাসাধ্য মিল রাখার চেষ্টা করেছেন। কবি তারাফাহ ইবনুল 'আবদের দার্শনিক চিন্তাধারা সংবলিত নিম্নোক্ত লাইন দুটির অনুবাদ লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কবি বলেন:

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا * ويأتيك بالأخبار من لم تزود
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له * بتاتا ولم تضرب له وقت موعد[৪৯]

ডক্টর মোহাম্মদ শাহীদুল্লাহ এ পঙক্তিদুটির অনুবাদ এভাবে করেন: "কাল তোমার নিকট এমন বহু কিছু প্রকাশ করে দেবে যা তুমি জানতে না। আর সেই ব্যক্তি তোমাকে বহু সংবাদ প্রদান করবে যাকে তুমি জীবন যাত্রার কোন প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করনি। সেই ব্যক্তি তোমাকে সংবাদ প্রদান করবে যার জন্য তুমি কোন ভ্রমণের সামগ্রী ক্রয় করনি এবং যার সাক্ষাতের জন্য তুমি কোন সময় নির্ধারিত করনি।"[৫০]

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি কখনও কখনও পাঠকের বোধগম্য করার জন্য সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজন এবং উপমা উৎপ্রেক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন: "(আমার এই প্রেয়সীর) কঙ্কন আর মল যেন উশার বা খিরওয়াবৃক্ষের সুঠাম শাখায় দোদুল্যমান।"[৫১]

উক্ত অনুবাদে উশার বা খিরওয়া বৃক্ষের সুঠাম শাখা-কে উপমা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অনুবাদক এর টীকায় লিখেন: "তন্বী তরুণী প্রিয়ার হস্ত ও পদযুগলকে সুন্দরী বৃক্ষের মত সতেজ দু'টিবৃক্ষের সুগোল ও মসৃণ শাখার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।"[৫২]

মু'আল্লাকায় উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের পরিচিতিও তিনি টীকায় উলেখ করেছেন। দারুল জুলজুল-এর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি টীকায় লিখেন: "দারুল জুলজুল নজদে অবস্থিত, কিন্দা গোত্রের এক মরুসরোবর ; কবি এই সরোবরের তীরে তার প্রেয়সী 'উনায়যাহ আর তার সখীদের নিয়ে মদির আনন্দোপভোগ করেন।"[৫৩]

মু'আল্লাকায় উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে অধ্যাপক শহীদুল্লাহ ভাবানুবাদের মাধ্যমে সেটি সরাসরি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি ইমরুউল কায়স তাঁর মু'আল্লাকায় প্রেমিকার সাথে বিচ্ছেদের দিন স্বীয় বিষাদময় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন:

---

[৪৮] তদেব, পৃ. ছ।
[৪৯] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১০৫।
[৫০] তদেব, পৃ. ৮৯।
[৫১] তদেব, পৃ. ৮৩।
[৫২] তদেব।
[৫৩] তদেব, পৃ. ২৩।

وجاشت إليه النفس خوفا وخاله * مصابا ولو أمسى على غير مرصد[৬৩]

পঙক্তির অনুবাদ করেছেন: "তার হৃদয় ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, আর সে মৃত্যুর চিন্তায় বিহবল হয়ে যায়। যদিও সেখানে কোন দস্যুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না"।[৬৪]

এখানে مرصد শব্দের অর্থ করা হয়েছে দস্যু। অথচ এর মূল অর্থ 'শক্রুর ওঁৎ পেতে বসে থাকার স্থান'।[৬৫]

তবে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদের মৌলিকত্ব বজায় রেখেছেন। গদ্যানুবাদ হওয়ার কারণে তাঁর এ অনুবাদ কাব্যের জটিলতা থেকেও মুক্ত। কবিদের জীবনী ও কাব্য প্রতিভা পর্যালোচনা এবং অনুবাদের টীকা সংযোজন তাঁর *প্রাচীন আরবী কবিতা* গ্রন্থের মূল্যমান বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। বাংলা ভাষায় *মু'আল্লাকাহ* চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

## মো. আবূ আশরাফ-এর *সাব'য়ে মু'য়াল্লাকাত*

আল-কুরআন ও হাদীছের মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্য প্রাচীন আরবি কবিতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে 'ধাব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন:

إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب[৬৬]

অর্থাৎ "যখন তোমরা কুরআন মজীদের কোনো অংশ পাঠ কর, আর তার অর্থ বুঝতে না পার, তখন তার অর্থ তোমরা আরবদের কবিতার মধ্যে অনুসন্ধান করবে। কারণ, কবিতাই হল আরবদের জীবন-দর্পণ"।

এজন্যই যুগ-যুগ ধরে *সাব'উল মু'আল্লাকাত* এর কবিতাগুলো বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহে পাঠ্যসূচিভুক্ত রয়েছে এবং এগুলো হৃদয়ঙ্গম করার জন্য চলছে বিভিন্ন ধরনের প্রয়াস। এরই অংশ হিসেবে ঢাকার আমীনবাজার মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহতামিম হাফেজ মাওলানা মো. আবূ আশরাফ চারটি মু'আল্লাকার বাংলা সংস্করণ সম্পন্ন করেন। তিনি এ সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন *সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত*। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন: "বাংলা ভাষী সুধীমণ্ডলী জ্ঞানান্বেষী ছাত্র সমাজ এবং রসজ্ঞ পাঠক মহলের কোরআনিক জ্ঞান সাগরের অমূল্য রতন কুড়াতে সহায়তা সূচক মনোভাব নিয়েই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।"[৬৭]

মো. আবূ আশরাফই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষায় *মু'আল্লাকাহ* এর অনুবাদের পাশাপাশি প্রতিটি পঙক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অনুবাদ ও ব্যাখ্যার পূর্বে *মু'আল্লাকাহ* রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি পঙক্তির মূল আরবি পাঠ উল্লেখ পূর্বক তার অনুবাদ, ব্যাখ্যা,

---

[৬৩] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১১৭।

[৬৪] *প্রাচীন আরবী কবিতা*, পৃ. ৮০।

[৬৫] *আল মু'জামুল ওয়াজীয*, পৃ. ২৬৬।

[৬৬] জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, ২য় খণ্ড (দিল্লী : কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম), পৃ. ১০।

[৬৭] হাফেজ মাওলানা মো. আবূ আশরাফ, *সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত*, বাংলা সংস্করণ (ঢাকা: দারুল উলূম পাবলিকেশন্স, ১৯৮৩), পৃ. ৭।

শাব্দিক বিশেষণ এবং স্থানভেদে সংশ্লিষ্ট ঘটনার উলেখ করেছেন। যেমন দ্বিতীয় মু'আল্লাকার কবি তারাফাহ ইবনুল 'আবদের নিম্নের পঙক্তিটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

كأن حدوج المالكية غدوة * خلايا سفين بالنواصف من دد[৬৮]

অর্থ: "বিচ্ছেদের প্রভাতে আমার মালেকিয়্যা প্রেমিকার কাজোয়াখানি দাদ উপত্যকায় প্রবাহিত নদীর খরস্রোতে ভেসে যাওয়া বৃহৎ তরীর ন্যায় পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

ব্যাখ্যা: আলোচ্য ছন্দে কবি প্রেমিকার যাত্রা পথের করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে বলেন: সেদিন ঊষা লগ্নে বিচ্ছেদের কালো ছায়া মেলে আমার মালেকিয়্যা প্রেমিকার কাবীলা (গোত্র) দাদ উপত্যাকার ধূলিধূসর প্রান্তর অতিক্রম করে অজানার উদ্দেশ্য যখন যাত্রা করেছিল, প্রেয়সী এবং তার সঙ্গিনীদের বহনকারী শিবিকা বা কাজোয়াগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে তখন মনে হত মরু-প্রান্তরের বুক চিরে প্রবাহিনী নদীর খরস্রোতে যেন বড় বড় নৌযানগুলো ভেসে চলেছে। আমি তখন সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলাম উদার নয়নে।"[৬৯]

মো. আবূ আশরাফ তাঁর গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট আকারে প্রথম তিনটি মু'আল্লাকার প্রতিটি পঙক্তির আরবি ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। যেমন তিনি প্রথম মু'আল্লাকার নিম্নোক্ত পঙক্তির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন:

ترى بعر الأرام فى عرصاتها * وقيعانها كأنه حب فلفل[৭০]

> يقول : ان المساكن التى كانت تعيش فيها حبيبتى آصبحت الأن بعد ذهابها مقرا لظباء لايعيش فيها أحد من الناس وأبعارها المنثورة هنا و هناك فى ساحتها ترى فى سوادها مثل حبوب الفلفل أى إن الأماكن صارت الآن مستوحشة لايوجد إلا الآرام وأبعارها [৭১]

এ গ্রন্থে অনুবাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানে মূল আরবি পাঠের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করা হয়েছে। নিম্নের পঙক্তিটির অনুবাদ তুলে ধরলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কবি তারাফাহ্ বলেন:

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا * ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد[৭২]

অর্থ: "যমানা অতি শীঘ্র অজ্ঞাত বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করে দিবে। আর এমন ব্যক্তি তোমার নিকট সংবাদ বহন করবে, যাকে তুমি ভ্রমণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করনি।"[৭৩]

তবে কোথাও কোথাও তিনি মূল পাঠের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা না করে ভাব ও আবেগের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন তিনি ইমরুউল কায়স এর নিম্নোক্ত পঙক্তির অনুবাদ এভাবে করেছেন-

فيالك من ليل كأن نجومه * بأمراس كتان إلى صم جندل[৭৪]

---

[৬৮] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১০৭।
[৬৯] *সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত*, পৃ. ১০২।
[৭০] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ৫৯।
[৭১] *সাবা'য়ে মু'য়ালাকাত*, আরবি ব্যাখ্যা অংশ, পৃ. ১।
[৭২] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১০৫।
[৭৩] *সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত*, পৃ. ১৭৯।
[৭৪] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ৬১।

"বড় আশ্চর্য যে, এটা কেমন দীর্ঘরাত যে, একেবারে পোহাতেই চায় না? এর নক্ষত্রগুলো যেন কঠিন শিলার সাথে কাত্তানের রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।"[৭৫]

এখানে 'বড় আশ্চর্য যে, এটা কেমন দীর্ঘ রাত, যে একেবারে পোহাতেই চায় না?' অনুবাদ যথাযথ হয়নি। কারণ মূলে 'একেবারে পোহাতেই চায় না'-এর কোনো আরবি নেই।

অনুরূপভাবে কবি তারাফাহ ইবনুল 'আবদ-এর নিম্নোক্ত পঙক্তির অনুবাদে তিনি বলেন:

وقوفا بها صحبى على مطيهم * يقولون : لاتهلك أسىً و تجلد[৭৬]

"প্রেমিকা খাওলার বিলীয়মান বাসস্থানের নিদর্শনসমূহ তখনও আলোকময়। আর সুহৃদ বন্ধুরা আমার জন্যে নিজেদের সওয়ারী থামিয়ে আমাকে বলতে লাগল : সাহস করে ধৈর্য্য ধর। বেদনার ভারে নিজেকে ধ্বংস করে দিওনা।"[৭৭]

এখানে 'প্রেমিকা খাওলার বিলীয়মান বাসস্থানের নিদর্শনসমূহ তখনও আলোকময়'-এ বাক্যের কোনো আরবি মূল পাঠে নেই।

মাওলানা মো. আবূ আশরাফ বাংলাভাষীদের নিকট যে অভিনব পদ্ধতিতে *সাব'উল মু'আল্লাকাত* উপস্থাপন করেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। বিদেশি ভাষার কোন উন্নত কবিতা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাঁর এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। মূল আরবি পাঠ, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, শাব্দিক বিশ্লেষণ, সর্বোপরি প্রাগ্রসর আরবি পাঠকদের জন্য আরবি ব্যাখ্যা সংযোজন *সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত* গ্রন্থটিকে একটি মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত করেছে।

## ইকবাল শাইলো প্রণীত *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম*

বাংলাভাষায় যেমন *মু'আল্লাকাহ* এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশেষণ সংক্রান্ত চর্চা হয়েছে তেমনি *মু'আল্লাকাহ* এর সমালোচনা ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত গ্রন্থও প্রণীত হয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ইকবাল শাইলো। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে *সাব'উল মু'আল্লাকাত*-এ চিত্রিত রোমান্টিসিজমের নিখুঁত ছবি অঙ্কন করেছেন তাঁর *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম* শীর্ষক গ্রন্থে।[৭৮] গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় বলেন: "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্য সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সমূহে প্রাগৈসলামিক আরবি সাহিত্যের *আস-স'বউল মু'য়াল্লাকাত* বা সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা'র কবিও কবিতাগুলো সিলেবাস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। শুধু তাই নয়, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের সব সরকারী বেসরকারী ও কাওমী মাদ্রাসাগুলোতে এ কাসিদাগুলো পড়ানো হয়। শিক্ষার্থী ভাইবোনদের সুবিধার্থে আরবি সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে পরিচিত এ সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকাকে ভিন্ন একটি আঙ্গিকে সম্পূর্ণ আল্লাদা একটি দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।"[৭৯]

---

[৭৫] সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত, পৃ. ৬৭।

[৭৬] *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১০১।

[৭৭] *সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত*, পৃ. ১০১।

[৭৮] এ গ্রন্থটি ১৯৮৮ সালে ঢাকাস্থ সবুজ পাতা প্রকাশনী প্রকাশ করে। দ্র. ইকবাল শাইলো, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম* (ঢাকা: সবুজপাতা প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৩-৪।

[৭৯] তদেব, পৃ. ৭।

*সাব'উল মু'আল্লাকাত*-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু রোমান্টিক দিকগুলোর প্রতি সমালোচকবৃন্দের নীরবতা অনেকটা অবাক হওয়ার মতো। তাই এ অভাব পূরণের জন্য ইকবাল শাইলো সাতটি মু'আল্লাকাহ্ মন্থন করে যে রোমান্টিসিজমের সন্ধান পেয়েছেন তা চমৎকার ভাষা শৈলীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন এ গ্রন্থে। প্রথমে তিনি রোমান্টিসিজম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করেছেন।[৮০] এতে রোমান্টিসিজমের সূচনা, রোমান্টিক ধারার ইংরেজ কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে রোমন্টিসিজমের প্রভাবও বিশ্লেষিত হয়েছে। এরপর প্রাগৈসলামিক যুগ ও আরবি সাহিত্য'[৮১] শিরোনামে আরবি কবিতার উৎপত্তি, প্রাক্-ইসলামি যুগে কবিদের মর্যাদা ও তাদের কাব্যচর্চা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর 'সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা ও রোমান্টিসিজম'[৮২] শিরোনামে তিনি *মু'আল্লাকাহ* নামকরণের কারণ, আরবি কবিতার প্রকারভেদ, আরবি ছন্দ, কাসিদায় অনুসৃত রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনার মাধ্যমে *সাব'উল মু'আল্লাকাত* এ যে রোমান্টিসিজমের খোলামেলা চিত্র রয়েছে তা পেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রয়েছে রোমান্টিসিজমের প্রায় সব কটি সুর। রোমান্টিসিজমের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য ছেয়ে গেছে সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকার প্রতিটি পাতায়। এ গীতিকায় সজীবতার লহরী সীমাবদ্ধতাকে নির্বাসন দিয়ে প্রসব করেছে আবেগের কচি পাতা। চিন্তাশক্তির প্রমত্ততায় কবিতায় এসেছে সঞ্জীবনী শক্তি।"[৮৩]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন: "'সাবজেকটিভিটি' হলো রোমান্টিক কবিতার মূল উপাদান। রোমান্টিক কবিরা প্রায়শই নিজেদেরকে নিয়ে থাকেন মগ্ন। কবিতায় স্মৃতি রোমন্থন ছাড়াও নিজেদের জীবনের সুবৃহৎ আঙ্গিনার বিভিন্ন প্রান্ত সম্পর্কে খুব খোলাখুলিভাবে অনেক কিছু লিখে ফেলেন তারা। সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় এই 'সাবজেকটিভিটি' বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ কবিদল নিজেদের জীবন প্রবাহকে কবিতার ভাস্কর্যে অঙ্কিত করেছেন নিপুণভাবে। সাবজেকটিভিটি'র পূর্ণতা হলো এখানেই।"[৮৪]

এ গ্রন্থে লেখক প্রত্যেক কবির কবিতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের প্রত্যেকের একটি করে উপাধি উল্লেখ করেছেন। যেমন রোমান্টিক কবি ইমরুল কায়েস,[৮৫] নিঃসঙ্গ কবি তারাফাহ্,[৮৬] মানবতাবাদী কবি যুহাইর,[৮৭] নস্টালজিক কবি লবীদ,[৮৮] বিরহের কবি আমর বিন কুলসুম,[৮৯] মেল্যান্‌কলিক্ কবি আনতারাহ[৯০] ও এলিজিয়াক কবি হারিস।[৯১]

---

[৮০] তদেব, পৃ. ৯-১৯।
[৮১] তদেব, পৃ. ২০-২৬।
[৮২] তদেব, পৃ. ২৭-৩৩।
[৮৩] তদেব, পৃ. ৩১।
[৮৪] তদেব, পৃ. ৩৩।
[৮৫] তদেব, পৃ. ৩৪।
[৮৬] তদেব, পৃ. ৫৯।
[৮৭] তদেব, পৃ. ৭৪।
[৮৮] তদেব, পৃ. ৮৪।
[৮৯] তদেব, পৃ. ৯৪।

এছাড়াও তিনি তাঁর গ্রন্থের কোথাও মূল কবিতার আরবি পাঠ উল্লেখ করেননি। তিনি যে কাব্যানুবাদ উলেখ করেছেন, তা মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ কৃত *অস্-সব'উ-ল্-মু'অল্লকাত* গ্রন্থ থেকে হুবহু নেওয়া হয়েছে।

ইকবাল শাইলো প্রত্যেকটি *মু'আল্লাকায়* বর্ণিত রোমান্টিসিজমের বিশেষণ করেছেন। যেমন তিনি কবি ইমরুউল কায়সের মু'আল্লাকায় রোমান্টিসিজমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: "কবি কায়েস তার দীর্ঘ কবিতার প্রথম তিনটি শোকে প্রিয়তমার পরিত্যক্ত বাসস্থানের বর্ণনা করেছেন। ভিটেবাড়ির বিবরণে প্রকৃতি (Nature) সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক বর্ণনা এখানে স্থান পেয়েছে।"[৯২]

কখনো কখনো তিনি মু'আল্লাকার কবিদেরকে ইংরেজ কবিদের সাথে তুলনা করেন। যেমন তিনি কবি ইমরু'উল কায়সকে ইংরেজ রোমান্টিক কবি কীট্সের সাথে তুলনা করে বলেন: "ইমরুল কায়েস রোমান্টিক কবি কীটসের মতো ইন্দ্র দিয়ে অনুভব করেন। ইন্দ্রয়ানুভূতির প্রখরতায় তিনি প্রত্যক্ষণ করেন প্রেমিকাদের। প্রেমিকার গন্ধ তাকে স্বর্গ সুধা দান করে। তিনি বিমোহিত হয়ে যান। এ Sensuous ভুবনে কীটসের চাইতেও রোমান্টিক ইমরুল কায়েসের আবেগ মমতা, আকাঙ্ক্ষা, স্বাদ ও তৃপ্তি অনেক বেশী বলেই মনে হয়। প্রিয়তমাদেরকে স্বর্গপুরীর মতো মনে করেন রূপে, গন্ধে যৌবনে ও মায়ায়।"[৯৩]

এছাড়াও তিনি মাঝে-মাঝে ইংরেজ কবিদের উপর মু'আল্লাকার কবিদের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, কবি আল্ফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২) কবি ইমরুউল কায়সের মু'আল্লাকার গদ্যানুবাদ পড়ে আলোড়িত হন। তিনি এ কাসীদার বিষয়বস্তু অনুকরণ করে Locksley Hall নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। এ কবিতার প্রথম চারটি লাইনে কবি হুবহু প্রথম মু'আল্লাকার অনুকরণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "কায়েসের কথাগুলো যেন ভিক্টোরিয়ান যুগে পুনঃপ্রতিধ্বনিত হচ্ছে টেনিসনের কণ্ঠে। কবি কায়েস বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনে তার প্রিয়ার বাস্তভিটা পরিদর্শনে গেলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।... টেনিসন ও তার কবিতায় প্রথম দিকে চাচাতো বোন অ্যামির (Amy) সাথে বাল্যকালের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করেন। তিনি তার বন্ধুদেরকে অতীতকালের রোমান্সের বর্ণনা দিচ্ছেন।... তিনি অতীত স্মরণ করছেন এ কথা উচ্চারণ করে:

> "Comrades, Leave me here a little, while as Yet 'tis early morn :
> Leave me here, and when you want me sound upon the bugle horn
> 'Tis the place, and all around it, as of old, the curlews call,
> Dreary gleams about the moorland flying over Locksley Hall."[৯৪]

---

[৯০] তদেব, পৃ. ১০৩।
[৯১] তদেব, পৃ. ১০৯।
[৯২] তদেব, পৃ. ৪৬।
[৯৩] তদেব, পৃ. ৪৫।
[৯৪] তদেব, পৃ. ৪৮-৪৯।

এভাবে ইকবাল শাইলো প্রত্যেক কবির মু'আল্লাকায় বর্ণিত রোমান্টিসিজম বিশেষণ করে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় প্রণীত *মু'আল্লাকাহ* বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে এটি আল্লাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই শুধুমাত্র একটি বিষয় অবলম্বনে *মু'আল্লাকাহ* সংক্রান্ত এ গ্রন্থটি অনেক গুরুত্বের দাবিদার।

## উপসংহার

বাংলা ভাষায় প্রণীত *আল মু'আল্লাকাত* সংক্রান্ত উপরোক্ত গ্রন্থাবলি এদেশের সুধী মহলে সমাদৃত হয়ে আসছে। প্রাগ্রসর পাঠক-পাঠিকা, আরবি সাহিত্যানুরাগী, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষকমণ্ডলী এ গ্রন্থসমূহ থেকে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। পাশাপাশি বাংলা ভাষায় *সাব'উল মু'আল্লাকাত* চর্চার মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের সাথে এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের একটি যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, বিদেশি কাব্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে *আল মু'আল্লাকাত* সংক্রান্ত উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# তাওফীক আল হাকীমের 'নাহরুল জুনূন' নাটকের বাংলা অনুবাদ : একটি পর্যালোচনা

আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর*

**Abstract:** Nahr al-Junun is an excellent play written by the leading Egyptian playwright Tawfiq al-Hakim. Having been translated into many different languages of the world including French, it has stirred the world literature. With a view to making the Bengali speaking people appreciate the 'drama' representing a rich branch of modern Arabic literature, two great literati syed sajjad Husain and Abdus Sattar translated this play. Their translations were not literal, but they, to the best of their ability, tried to keep it similar in essence to that in Arabic. Both the traslations, undoubtedly, have stood the test of literary standard.

## ভূমিকা

মারূন আন-নাক্কাশের হাতে আরবি নাটকের যাত্রা শুরু হলেও তাওফীক আল হাকীমের মাধ্যমে আরবি নাটক বিশ্বসাহিত্য দরবারে পরিচিতি লাভ করে। এ জন্য তাকে 'আধুনিক মিসরীয় নাটকের অগ্রদূত' (رائد المسرح المصرى المعاصر)[১] ও 'আরবি নাটকের প্রতিষ্ঠাতা'[২] বলে অভিহিত করা হয়। প্যারিসে আইনশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য গিয়েও সেখানে তিনি ফরাসি ও অন্যান্য সাহিত্যের নাটকের সাথে পরিচিত হন।[৩] এরপর দেশে ফিরে এসে তিনি নাট্য সাহিত্যকে জীবনের সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি চাকুরি করলেও এ ক্ষেত্রে তা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বরং মিসরীয় সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, স্বাধীনতা-পরাধীনতা প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনা করেন অসংখ্য নাটক। তন্মধ্যে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক নাটক হচ্ছে 'নাহরুল জুনূন'।

'বিষাক্ত নদী' ও 'উন্মাদের নদী' নামে নাটকটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মূল নাট্যকার তাওফীক আল হাকীমের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ পূর্বক নাটকটি রচনার প্রেক্ষাপট,

---

*ড. আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] ড. কামালুদ্দীন হুসাইন, *আল মাসরাহ ওয়াত তাগাইয়্যুর আল ইজতিমা'ঈ ফী মিসর* (কায়রোঃ আদ দারুল মিসরিয়্যাহ আল লুবনানিয়্যাহ, ১৯৯২), পৃ. ১৬।

[২] M. M. Badawi, *Modern Arabic Drama in Egypt* (London: Cambridge University Press, 1987), p. 8.

[৩] ড. শাওকী দায়ফ, *আল আদাব আল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর* (মিসর : দারুল মা'আরিফ, তাবি.), পৃ. ২৮৯।

নামকরণ, বিষয়বস্তু এবং মূল আরবি পাঠের সাথে অনূদিত নাটকের মিল-অমিল ও অনুবাদ দুটির তুলনামূলক পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

## মূল নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

*নাহরুল জুনূন* নাটকের লেখক তাওফীক আল হাকীম ১৮৯৮ সালে মিসরের ঐতিহ্যবাহী শহর আল-ইস্কান্দারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তবে আরবি সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা হান্না আল ফাখূরী তার জন্মসাল ১৯০২ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] তাওফীক আল হাকীমের পিতা সরকারি চাকুরি করার কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি হতেন। শিশু তাওফীকও বিভিন্ন স্থানে বাবার চাকুরির সুবাদে এক মক্তব থেকে অন্য মক্তব, এক মাদরাসা থেকে অন্য মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হতেন।[৬] সাত বছর বয়সে তিনি দামনাহুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[৭] এরপর তার বাবা কায়রোতে বদলি হলে তিনি দশ বছর বয়সে সেখানকার মুহাম্মদ আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[৮] মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর ১৯২৪ সালে তাওফীক আল হাকীম আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্যারিস গমন করেন। প্যারিসে তিনি চার বছর কাটান। তবে সেখানে আইন শাস্ত্র অধ্যয়নের পরিবর্তে তিনি নাট্যচর্চা ও সংগীত নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন।[৯]

১৯২৮ সালে তিনি মিসরে ফিরে এসে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে টেক্সট বুক বোর্ডের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে সমাসীন থাকার পর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন-কল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক নিযুক্ত হন।[১০]

১৯৪৩ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।[১১] ১৯৫১ সালে তিনি 'দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ' এর পরিচালক, ১৯৫৪ সালে সাহিত্য ও শিল্পকলা উচ্চ কমিটির ( المجلس الأعلى للاداب والفنون ) সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৫৯ সালে তিনি প্যারিসে মিসরের পক্ষে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।[১২] ১৯৮৭ সালের ২৬ শে জুলাই তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩]

---

[৪] *আল আদাব আল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৮৮ ; *Modern Arabic Drama in Egypt*, p. 8.

[৫] হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি'ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী, আল আদাব আল হাদীছ* (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮৬), পৃ. ৩৯২।

[৬] তদেব।

[৭] *আল আদাব আল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৮৮।

[৮] *আল আদাব আল হাদীছ*, পৃ. ৩৯৩।

[৯] তদেব, পৃ. ৩৯৪ ; *আল আদাব আল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৮৯।

[১০] তদেব, পৃ. ২৯০।

[১১] তদেব, পৃ. ২৯২।

[১২] *আল আদাব আল হাদীছ*, পৃ. ৩৯৪ ; আল আদাব আল *'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৯৪ ; আবদুস্ সাত্তার, *আধুনিক 'আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৮৭।

[১৩] Ali Al-Ra'i, Arabic drama since the thirties, *Modern Arabic literature*, edited by M. M. Baadwi (Chambridge : Chambridge University Press, 1992), p. 368.

তাওফীক আল হাকীমের প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ৭২ টি।[১৪] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের নাম নিম্নে দেওয়া হলো।

১. আহলুল কাহ্ফ (أهل الكهف)
২. শাহরাযাদ (شهرزاد)
৩. পেগমালিয়ূন (بجماليون)
৪. সুলায়মান আল হাকীম (سليمان الحكيم)
৫. আল মালিক আওদীব (الملك اوديب)
৬. আল আয়দী আন না'ঈমাহ (الايد الناعمة)
৭. ইযীস (ايزيس)
৮. আস সাফকাহ্ (الصفقة)
৯. লু'বাতুল মাওত (لعبة الموت)
১০. আশওয়াকুস সালাম (أشواك السلام)
১১. আস সুলতান আল হায়ির (السلطان الحائر)
১২. আত তা'আম লিকুল্লি ফাম (الطعام لكل فم)
১৩. শামসুন নাহার (شمس النهار)
১৪. মাসীরু সিরসার (مصير صرصار)
১৫. সিররুল মুনতাহিরাহ (سر المنتحرة)
১৬. নাহরুল জুনূন (نهر الجنون)
১৭. আল ওয়ারতাহ (الورطة)
১৮. 'আওদাতুর রূহ (عودة الروح)
১৯. আদ দায়ফ আছ ছাকীল (الضيف الثقيل)
২০. আল মারাআ'তুল জাদীদাহ (المرأة الجديدة)

### 'নাহরুল জুনূন' নাটক রচনার প্রেক্ষাপট

১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মিসর জয় করেন।[১৫] এ সময় মিসরের শাসনক্ষমতা দুজন মামলূক সামন্তের হাতে ন্যস্ত ছিল। তারা হলেন শাইখুল বালাদ ইবরাহীম বে ও আমীলূল হাজ্জ মুরাদ বে। তাদের পক্ষে ফরাসি বাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মিসরে ফরাসিদের কর্তৃত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ নেপোলিয়ান নিজেকে বন্ধু বলে পরিচয় দিলেও মিসরীয়দের মনে তার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। উপরন্তু 'উছমানীয় এবং ব্রিটিশ বাহিনীর যৌথ প্রতিরোধ ব্যূহ তিনি অনেক চেষ্টা করেও ধ্বংস করতে পারেননি। তাই মাত্র তিন বৎসরের ব্যবধানে ১৮০১ সালে তার নেতৃত্বাধীন ফরাসি বাহিনী মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[১৬] ফরাসিদের প্রস্থানের পর মিসরে 'উছমানী ও মামলূকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে মিসরে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এহেন দুঃসন্ধিক্ষণে ১৮০৫ সালে মুহাম্মদ আলী পাশা মিসরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৮৪৯ সালের ২রা আগস্ট ৮০ বৎসর বয়সে তিনি মারা গেলে মিসরে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়।[১৭] এরপর পর্যায়ক্রমে আব্বাস পাশা (১৮৪৮-১৮৫৪ সাল), সা'ঈদ পাশা (১৮৫৪-১৮৬০), খেদীভ

---

[১৪] *আধুনিক 'আরবী কথাসাহিত্যে তিন দ্রষ্টা*, পৃ. ৮০।

[১৫] বুতরুসুল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব ফিল আন্দালুস ওয়া 'আছরিল ইনবি'আছ* (বৈরুত: দারু নাযীর আব্বূদ, ১৯৮৮), পৃ. ২৩৪ ; *Modern Arabic Literature*, pp. Viii, 2 ; মূসা আনসারী, *আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১২ ; A. A. Paton, *History of the Egyptian revolution from the period of Mamlukes to the death of Muhammad Ali,* Vol. 2 (London : 1870), pp. 1-50.

[১৬] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ২৬২-২৭০।

[১৭] *আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা*, পৃ. ২০, ৪২।

ইসমা'ঈল (১৮৬০-১৮৭৯), তাওফীক পাশা, শরীফ পাশা, উরাবী পাশা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।[১৮] মুহাম্মদ আলী পাশার মৃত্যুর পর হতে ব্রিটিশ কর্তৃক মিসর দখল পর্যন্ত সময়কাল মিসরীয় জাতির ইতিহাসে দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ হিসেবে চিহ্নিত। ১৮৮২ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর উরাবী পাশার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মিসরে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার উরাবী পাশা এবং তার সহকর্মীদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ করলে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে চলে যায়। লর্ড ক্রোমার হলেন প্রকৃত শাসক আর তাওফীক পাশা নামমাত্র শাসনকর্তা রূপে অবশিষ্ট থাকেন। ১৮৮২ সাল হতে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত ক্রোমার বলিষ্ঠ হাতে মিসর শাসন করেন। তিনি মিসরীয় কর্মচারীদেরকে অপসারিত করে প্রতিটি শূন্য পদে ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং তাদের সমন্বয়ে মিসরীয় সিভিল সার্ভিস গঠন করেন।[১৯] ১৯০৭ সালে লর্ড ক্রোমার দিনশাওয়াই ঘটনার পরিণতিতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।[২০] অতঃপর স্যার ইল্ডোন গোর্ষ্ঠ-এর মৃত্যুর পর লর্ড কিচনার মিসরে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাওফীক পাশার পর তার পুত্র আব্বাস দ্বিতীয় হিলমী ১৮৯২ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মিসরের খেদীভ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[২১] এরপর হুসাইন কামিল, আহমাদ ফু'আদ পাশা প্রমুখ ১৯২২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নামমাত্র মিসরের খেদীভ হিসেবে দেশ পরিচালনা করেন। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব এবং মিসরের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করার কারণে ১৯১৯ সালে সা'দ যাগলূল, হামাদ আল বাসিল, ইসমা'ঈল সিদকী ও মুহাম্মদ মাহমূদকে ব্রিটিশ সরকার বন্দী করে মাল্টায় নির্বাসন দেয়। সমগ্র মিসরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং সর্বত্র দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে মিসরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণা দেয়। কিন্তু ঘোষণা সত্ত্বেও মিসরীয়গণ স্বাধীনতা পায়নি। এরপর বহু

---

[১৮] তদেব, পৃ. ৪৯-৫১।

[১৯] Alfred Milner, *England in Egypt,* 11th edn. (London : 1904), pp. 63-66, 104-157.

[২০] **দিন শাওয়াই ঘটনা :** মিসরে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে দিনশাওয়াই ট্র্যাজেডি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দখলদার ব্রিটিশ বাহিনীর কয়েকজন অফিসার মিসরের দিনশাওয়াই গ্রামে কবুতর শিকারে গিয়েছিলেন। তারা বন্য কবুতরের পরিবর্তে গৃহপালিত কবুতর শিকার করতে শুরু করলে গ্রামবাসীদের সাথে তাদের কলহের সৃষ্টি হয়। তখন জনৈক সৈনিকের গুলিবর্ষণের ফলে এক বৃদ্ধ মারাত্মকভাবে আহত হন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সেখানে একজন সৈনিকেরও মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু দখলদার শক্তির মনে জান্তব ক্রোধের সৃষ্টি করে। অপরাধীদের শাস্তিবিধানের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। নাটকীয়তার সাথে বিচারকার্য শেষ করে চারজন গ্রামবাসীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বেশ কয়েজনকে জেল এবং বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দ্রঃ J. E., Marshall, *The Egyptian Engima 1890-1928* (London : John Murray: 1928), p. 82.

[২১] **খেদীভ :** শব্দটির অর্থ শক্তিধর, বাদশাহ, সম্রাট, মন্ত্রী, দলপতি ইত্যাদি। খেদীভ একটি উপাধি, যা মধ্য যুগ হতে মুসলিম শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বিশেষ করে তুর্কী সুলতান 'অবদুল 'আযীয ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মিসরের গভর্নর ইসমা'ঈল পাশাকে এই উপাধি প্রদান করেছিলেন। সরকারি নথিপত্রে মিসরীয় শাসকদেরকে তখন খেদীভে মিসর বলে অভিহিত করা হত। মুহাম্মদ 'আলী পাশাও এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তার বংশের সকল শাসক খেদীভ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসরের শাসকদের এই উপাধি প্রদানের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল।

আন্দোলন সংগ্রামের পর অবশেষ ১৯৫২ সালে ২২শে জুলাই এক সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মিসর স্বাধীনতা লাভ করে।[২২]

তাওফীক আল হাকীম ১৯৩৫ সালে 'নাহরুল জুনূন' নাটকটি লেখেন। প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে।[২৩] এ সময় মিসরের ক্ষমতায় ছিলেন পুতুল রাজা ফুয়াদ ও রাজা ফারুক।[২৪] সে সময় গোটা মিসরে ছিল ইংরেজদের কর্তৃত্ব। রাজনীতি ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত তারাই। মিসরীয় রাজারা ছিল তাদের হাতের ক্রীড়নক। বিশেষ করে ১৯৩৬ সালের ২১শে আগস্ট ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির ফলে মিসরে ইংরেজদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫] গোলামির জিঞ্জির তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমাজ সচেতন নাট্যকার তাওফীক আল হাকীম রচনা করেন তার অনন্য নাটক 'নাহরুল জুনূন'।

### 'নাহরুল জুনূন' নাটকের নামকরণ

যে কোনো সাহিত্যকর্মের নামকরণ সাধারণত তিনভাবে হয়ে থাকে। যথা:

১. অভ্যন্তরীণ কোনো শব্দ বা শব্দাবলি দ্বারা সরাসরি নামকরণ;
২. ঘটনা, বিষয়বস্তু বা মূলভাব অবলম্বনে নামকরণ; এবং
৩. রূপক বা প্রতীকী নামকরণ।

আলোচ্য নাটকটির নামকরণের যথার্থতা নিরূপণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, নাট্যকার এ নাটকটির প্রধান চরিত্র বাদশাহর সংলাপের এক পর্যায়ে বিধৃত নদীটিকে *নাহরুল জুনূন* (نهر الجنون)[২৬] বা উন্মাদনার নদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে *নাহরুল জুনূন* (نهر الجنون)।

নামকরণের দ্বিতীয় মূলনীতি অনুযায়ীও এ নাটকের *নাহরুল জুনূন* (نهر الجنون) নামকরণটি যথার্থ হয়েছে। কারণ এ নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে একটি নদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে নদীর পানিতে উন্মাদনার উপাদান রয়েছে এবং এর পানকারী উন্মাদে পরিণত হয়। সুতরাং এ দিক থেকেও এ নাটকটির নাম *নাহরুল জুনূন* (نهر الجنون) যৌক্তিক হয়েছে।

প্রতীকী নাটক হিসেবেও এর নাম *নাহরুল জুনূন* (نهر الجنون) যথার্থ হয়েছে। কারণ, নাট্যকার পরাধীন মিসরের সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী রাজনীতিবিদ, আমলা ও রাষ্ট্র প্রধানদের একটি রূপক চিত্র অঙ্কন করেছেন এ নাটকে। এখানে তিনি 'নাহর' (نهر) বা 'নদী' বলতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বুঝিয়েছেন, নদীর পানি বলতে ব্রিটিশদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, 'আল জুনূন' (الجنون) বা 'উন্মাদনা' বলতে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন এবং পানি পানকারী বলতে ক্ষমতালোভী ও সুযোগ-সন্ধানী মিসরীয়দের বুঝিয়েছেন। এসকল পদলেহীরা দেশ ও জাতির

---

[২২] *আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা*, পৃ. ১৪২; *Modern Arabic Literature*. pp. viii-ix.

[২৩] তাওফীকুল হাকীম, *নাহরুল জুনূন* (মিসর : মাকাতাবাতু মিসর, তাবি.), পৃ. ১৬৫; *Modern Arabic Drama in Egypt*, p. 52.

[২৪] *আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা*, পৃ. ১২৮-১২৯।

[২৫] তদেব, পৃ. ১২৮ ; *Modern Arabic Literature*. pp. ix. 6.

[২৬] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৬৭।

অনিবার্য ধ্বংসের কথা জেনেও ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার মোহে সাম্রাজ্যবাদের তোষণ করছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ নাটকের নাম *নাহরুল জুনূন* (نهر الجنون) যথার্থ হয়েছে।

## 'নাহরুল জুনূন' নাটকের মূল বিষয়বস্তু

তাওফীক আল হাকীম রচিত 'নাহরুল জুনূন' বা 'উন্মাদনার নদী' নাটকটি একটি প্রতীকী নাটক।[২৭] একজন মিসরীয় হিসেবে তাওফীক আল হাকীমের ধ্যান-জ্ঞান নিবদ্ধ ছিল মিসরীয় সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি। তিনি তার বিভিন্ন নাটকে মিসরীয় সমাজ-রাজনীতির কথা বলেছেন স্বাধীনভাবে। তিনি নিজে রাজনীতি পছন্দ না করলেও রাজনীতি তার নাটকের অবিচ্ছেদ্য উপজীব্য ছিল। তেমনি একটি নাটক হচ্ছে 'নাহরুল জুনূন'। এ নাটকের মূল সুর হচ্ছে জনগণ, দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এতে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জয়গান রয়েছে।[২৮]

নাটকটি ১৯৩৫ সালে লিখিত ও ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এক অঙ্ক ও দুই দৃশ্য সংবলিত একটি ক্ষুদ্র আকৃতির নাটক এটি। এর চরিত্র ৫টি। যথা: রাজা, রানী, মন্ত্রী, চিকিৎসক ও পুরোহিত। এক রাজা এবং তার মন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে তারা দুজন ব্যতীত রাজ্যের অন্য সবাই এমন নদীর পানি পান করেছে, যাতে রয়েছে পাগলামির বীজ।

কিন্তু রাজা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, রানীও ঐ নদীর পানি পান করেছেন। অবস্থার অবসান কল্পে রাজা এবং মন্ত্রী চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। সর্বদা এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা, পর্যালোচনার অন্ত নেই। অন্য দিকে তাদের এ অবস্থা দেখে রানী ও রাজদরবারের অন্যরা মনে করেন যে, রাজা এবং মন্ত্রী পাগল হয়ে গেছেন। রাজার এ পাগলামিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে রানী অগত্যা রাজ চিকিৎসক ও পুরোহিতের নিকট ব্যাপারটি উত্থাপন করেন।[২৯] তাদের নিকট মানসিক রোগের কোনো ঔষধ আছে কি না তা তিনি জানতে চান। কিন্তু চিকিৎসক রাজা ও মন্ত্রী সম্পর্কে এরূপ কথা ভাবতে নারাজ। রানীকে সে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে অলৌকিক কিছুর জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়।[৩০] রানী এবার পুরোহিতের নিকট অলৌকিকভাবে কিছু করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু অলৌকিকতার কথা শুনে পুরোহিত হতবাক হয়ে যায়। এসব তার কিছু জানা নেই বলে উত্তর দেয়।[৩১] রানী স্বামী, দেশ ও দেশবাসী সকলকে ভালবাসে। দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য স্বামীর সুস্থতা আবশ্যক। এ জন্য তার চিন্তার শেষ নেই। কিন্তু দেশবাসী যেন জানতে ও বুঝতে না পারে যে, রাজা উন্মত্ততায় ভুগছেন। সেদিক সদা সতর্ক তিনি।

রানী যখন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ক্রমাগত শরাব পানে, রাজার আজ এরূপ অবস্থা, তখন রাজাকে শরাব পান হতে বিরত থাকতে এবং এর পরিবর্তে নদীর পানি পান করার পরামর্শ দেন।[৩২] নদীর পানির কথা শ্রবণ করে রাজা চমকে ওঠেন। রানীও যে তাঁকে ঐ উন্মাদের নদীর

---

[২৭] *Modern Arabic Drama in Egypt*, p. 52.

[২৮] আহমাদ হায়কাল, *আল আদাব আল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর* (মিসর : দারুল মা'আরিফ ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ৪০৭; *আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যে তিন দ্রষ্টা*, পৃ. ৯১।

[২৯] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৭০।

[৩০] তদেব, পৃ. ১৭১।

[৩১] তদেব।

[৩২] তদেব, পৃ. ১৭৫।

পানি পান করতে বলবেন তা বিশ্বাস করতে পারেন না। এমনকি শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীও রাজাকে পরামর্শ দেন, নদীর পানি পান ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।[৩৩] কারণ দেশের সবাই তাদেরকে পাগল মনে করে। তারা সংখ্যাধিক্য। সুতরাং তাদের ইচ্ছার বিপরীত কাজ করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না। রাজা চারিদিকে বিপদের ঘনঘটা উপলব্ধি করে।

অবশেষে রাজা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার মানসে উক্ত নদীর পানি পান করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩৪] যদিও তিনি জানতেন যে, এর মাধ্যমে তিনি তার সুস্থতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

এ নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন, ক্ষমতার লোভে রাজনীতিবিদরা (শাসকরা) কিভাবে নিজের বুদ্ধি বিবেককে বিকিয়ে দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মেনে নেন।

## সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের বাংলা অনুবাদ

তাওফীক আল হাকীম বিরচিত 'নাহরুল জুনূন' নাটকটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে প্যারিস থেকে এটির ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৩৫] বাংলা ভাষায় এ নাটকটির প্রথম অনুবাদ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* নামে একটি বই লেখেন। এর পরিশিষ্টে তিনি উক্ত নাটকটির অনুবাদ সংযোজন করেন। এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৯৭ সালে এর দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আধুনিক আরবি সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালি পাঠক সমাজকে ধারণা দেওয়ার জন্যই তিনি এ নাটকটির অনুবাদ করেন।[৩৬]

হোসায়েন নাটকটির শিরোনাম দিয়েছেন 'বিষাক্ত নদী'।[৩৭] সম্ভবত নাটকটির নিম্নোক্ত সংলাপের আলোকে তিনি এ ভাবানুবাদ করেছেন।

الملك : (يحاول التذكر) لست أذكر أكثر مما قصصت عليك .... رأيت النهر أول الأمر فى لون الفجر , ثم أبصرت أفاعى سوداء قد هبطت فجأة من السماء, وفى أنيابها سم تسكبه فى النهر , فإذا هو فى لون الليل ! ... وهتف بى من يقول :((حذار أن تشرب بعد الان من نهر الجنون ! ...))[৩৮]

রাজা : (স্মরণ করার চেষ্টা করে) আপনাকে যতটুকু বলেছি তার বেশি আমি স্মরণ করতে পারছি না। স্বপ্নে আমি প্রথমত নদীর পানি ভোরের আলোর মতো সোনালী হতে দেখলাম। হঠাৎ আসমান থেকে অজস্র কালো সাপ (মর্তে) নেমে আসতে দেখলাম। সাপগুলোর দাঁতে ছিল বিষ। সেগুলো **নদীর পানিতে বিষ উগড়ে দিল** এবং মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পানি রাত্রির অন্ধকারের মতো কালো আকার ধারণ করল।

---

[৩৩] তদেব, পৃ. ১৭৮।

[৩৪] তদেব, পৃ. ১৭১।

[৩৫] তাওফীকুল হাকীম, *সিররুল মুনতাহিরাহ* (মিসর: মাকতাবাতু মিসর, তা. বি:.), পৃ. ৭।

[৩৬] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), ভূমিকা, পৃ. ৬।

[৩৭] তদেব, পৃ. ৬৫।

[৩৮] *নাহরুল জনূন*, পৃ. ১৬৭।

নাটকটির অনুবাদ করতে গিয়ে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন মূল আরবি পাঠের সাথে মোটামুটি মিল রক্ষা করেছেন। যেমন রানী উন্মাদের নদীর পানি পান করেছেন, এ কথা জানতে পেরে রাজা বিস্ময়ের সুরে বললেন:

**মূল পাঠ**

الملك : هى أيضا شربت من ماء النهر !؟
الوزير : كما شرب أهل المملكة أجمعين ! ..[৩৯]

**অনুবাদ**

বাদশাহ: তিনিও এ নদীর পানি খেলেন?

উযীর : জী, প্রজাদের মতো তিনিও খেলেন।[৪০] তবে এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তিনি الوزير শব্দের অর্থ মন্ত্রী না করে উযীর করেছেন।

তিনি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে নাটকীয় সংলাপগুলো উপভোগ্য ও বোধগম্য করার জন্য মূল আরবি পাঠের সাথে সংগতি রেখে ভাবানুবাদ করেছেন। যেমন রানী পাগলামীর নদীর পানি পান করেছেন, সে কথা জানার পর রাজা রানীর অবস্থান জানতে চেয়ে বলেন:

**মূল পাঠ**

الملك : أين رأيت الملكة؟
الوزير : فى حديقة القصر ! ...[৪১]

**অনুবাদ**

বাদশাহ : আপনার সঙ্গে যখন বেগম সাহেবার দেখা হয় তখন তিনি কোথায় ছিলেন?

উযীর : বাগানে পায়চারী করছিলেন।[৪২]

মূল আরবি পাঠের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, 'আপনি রানীকে কোথায় দেখেছেন।' এর অর্থ তিনি করেছেন 'আপনার সঙ্গে...।' আবার উযীরের উক্তি 'প্রাসাদের বাগানে এর অর্থ করেছেন 'বাগানে পায়চারী করছিলেন।' এই ভাবানুবাদের ফলে নাটকের মূল পাঠের অঙ্গহানি ঘটেনি, বরং পাঠকের কাছে বোধগম্য ও উপভোগ্য হয়েছে। শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে অনুবাদের।

তবে ভাবানুবাদ করতে গিয়ে অসাবধানত বশত কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ বাদ পড়েছে। যেমন: রানীকে তার পাগলামি থেকে সুস্থতার উপায় বের করার জন্য রাজা মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন এবং রানীকে দেশের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিস্করূপে আখ্যায়িত করলে মন্ত্রী বলেন।

**মূল পাঠ**

الوزير : حقاً ... إنها كانت كالشمس فى سماء هذه المملكة !!..

জবাবে রাজা বলেন:

الملك : نعم ! ... أنت دائماً تردد ما أقول ولاتفعل شيئاً ... على برأس الأطباء!...[৪৩]

**অনুবাদ**

উযীর : জী হাঁ, তিনি ছিলেন আমাদের গৌরব রবি।

---

[৩৯] তদেব, পৃ. ১৬৬।

[৪০] *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৬৫।

[৪১] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৬৬।

[৪২] *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৬৫।

[৪৩] *নাহরুন জুনূন*, পৃ. ১৬৮।

বাদশাহ: আপনি তো শুধু আমার কথাই আমাকে শোনাচ্ছেন। বড় হাকীম সাহেবেকে তলব করুন।[৪৪] এখানে লক্ষ্যণীয় যে আরবি ولاتفعل شيئاً (কিছু করতে পারছেন না) এ অংশটুকুর অনুবাদ ছাড়া পড়েছে।

তাছাড়া দু'এক জায়গায় তিনি পুরো সংলাপ বাদ দিয়েছেন। যেমন: রাজা-রানী পরস্পর পরস্পরকে পাগল বলে মনে করেন। এমনকি রানীর মুখে রাজা পাগল হয়ে গেছে একথা শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে যান এবং স্ত্রীকে ডাকলে তিনি এসে বলেন:

**মূল পাঠ**

الوزير : جئتك بخبر هائل ! ...
الملك : (فى رجفة) ماذا أيضا؟ ...[৪৫]

**অনুবাদ**

উযীর: আপনার নিকট ভয়ংকর সংবাদ নিয়ে এসেছি?
বাদশাহ : (চমকে উঠে) কি হল আবার?

অনুরূপভাবে, জনগণের চাপে মন্ত্রী পাগলামির নদীর পানি পান করতে চান এবং রাজাকে বলেন যে, জনগণ বিশ্বাস করেন যে, তারা (রাজা-মন্ত্রী) পাগল। জনগণের কথা অনুযায়ী না চললে তারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তখন রাজা বলেন:

**মূল পাঠ**

الملك : ولكنا لسنا بمجنونين !...
الوزير : كيف نعلم؟!...[৪৬]

**অনুবাদ**

বাদশাহ : কিন্তু আমরা পাগল নই!
উযীর: আমরা কীভাবে বুঝব যে, পাগল নই?

উপরিউক্ত সংলাপগুলির অনুবাদ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বাদ দিয়েছেন। তাওফীক আল হাকীম তার নাটকে কতিপয় ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন السماء (আকাশ) معبد القصر (প্রাসাদের প্রার্থনাকক্ষ), كبير الكهان (পুরোহিত প্রধান), رأس الاطباء (প্রধান চিকিৎসক), نصلى (প্রার্থনা করি), واحسرتاه (হায় আফসোস) প্রভৃতি। কিন্তু সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এ শব্দগুলোর অনুবাদ করার সময় বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি رأس الاطباء এর অর্থ করেছেন হাকীম, كبير الكهان এর অর্থ ইমাম, معبد القصر এর অর্থ মসজিদ, السماء এর অর্থ আল্লাহ, نصلى এর অর্থ সিজদায় পড়ে থাকি এবং واحسرتاه এর অর্থ করেছেন: ইয়া আল্লাহ। সর্বোপরি সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে ড. হোসায়েনের অনুবাদটি সুন্দর হয়েছে।

### আব্দুস সাত্তারের অনুবাদ

আব্দুস সাত্তার ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের পর 'নাহরুল জুনূন' নাটকটির অনুবাদ করেন। আব্দুস সাত্তার কর্তৃক লিখিত 'আধুনিক আরবি নাটক' শীর্ষক গ্রন্থে যে পাঁচটি নাটকের অনুবাদ করা হয়েছে

---

[৪৪] *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৬৭।
[৪৫] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৭৬।
[৪৬] তদেব, পৃ. ১৭৮।

তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'নাহরুন জুনূন' এর বঙ্গানুবাদ 'উন্মাদের নদী'। গ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে ঢাকার মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালী পাঠক- পাঠিকাকে আরবি নাটক সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্যই তার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস বলে তিনি গ্রন্থটির ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

আব্দুস সাত্তার তার অনূদিত নাটক 'উন্মাদের নদী'- এর মূল আরবি নাম 'নাহরুল মাগনূন'[৪৮] বলে উল্লেখ করেছেন। সে হিসেবে এর অনুবাদ 'উন্মাদের নদী' যথার্থ হয়েছে। তবে আমাদের হাতে এ নাটকের মূল আরবির যে কয়টি সংস্করণ রয়েছে। তার সবকটিতেই এর নাম রয়েছে *নাহরুল জুনূন* (نهر الجنون)।

আব্দুস সাত্তার মূল আরবি পাঠের সাথে হুবহু সংগতি রাখার যে ওয়াদা *আধুনিক আরবী নাটক* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন,[৪৯] *নাহরুল জুনূন* নাটকের অনুবাদ করার সময় সেদিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছেন। নিম্নের সংলাপটি লক্ষ্য করা যাক।

**মূল পাঠ**

الوزير : هو القضاء يامولاى ... ألم أقل إنه قضاء وقع ؟!...
الملك :أجل ... إنها لكارثة شاملة ! ... ليس لها من نظير, لافى التواريخ ولافى
مملكة بأسرها قد أصابها الجنون دفعة واحدة, ولم يبق بها ناعم بعقله غير [৫০]الأساطير ...
الملك والوزير ؟!!....

**অনুবাদ**

মন্ত্রী : রাজা বাহাদুর, সবই অদৃষ্ট। আমি কি আপনাকে বলিনি যে অদৃষ্টই এই পরিণতির দিকে টেনে নিয়েছে?

রাজাঃ সত্যি, এ এক প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য! অতীতের কোন কিংবদন্তী বা কাহিনীতে এমন ঘটনা আছে বলে আমার জানা নেই। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, কেমন করে একটা দেশের সব লোকই পাগল হয়ে গেল। এখন দেখছি, একমাত্র রাজা এবং মন্ত্রীই ভালো আছে।[৫১]

শাব্দিক অনুবাদের চেয়ে আব্দুস সাত্তার ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন :

**মূল পাঠ**

الوزير: لم أكد أقبل عليها حتى ازورت عنى فى شبه روع , كذلك فعلت وصائفها وجواريها,
وطفقن يتهامسن وينظرن إلى نظرات المزورين!...
الملك : (كالمخاطب نفسه) كل هذا بدا لعينى فى تلك [৫২]
الرؤيا! ...

**অনুবাদ**

মন্ত্রী : না। তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছতেই তিনি ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার সখীরাও ভয়ে জড়সড় হলো এবং আমার দিকে তাকিয়ে কি সব বলাবলি শুরু করলো।

---

[৪৭] অবদুস্ সাত্তার, *আধুনিক 'আরবী নাটক* (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ১১ (ভূমিকা)।

[৪৮] **মাগনূনঃ** মিসরীয়রা আরবী 'জীম' বর্ণকে বাংলা 'গ' বর্ণের মত উচ্চারণ করে থাকে। সেজন্য আবদুস্ সাত্তার মিসরীয়দের উচ্চারণের অনুকরণে 'মাজনূন' এর উচ্চারণ 'মাগনূন' লিখেছেন।

[৪৯] তদেব, পৃ. ১০।

[৫০] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৬৯-১৭০।

[৫১] *আধুনিক আরবী নাটক*, পৃ. ৫০।

[৫২] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

রাজা : (নিজে নিজে) হ্যাঁ, কল্পনায় আমি এ রকম মনে করেছিলাম।[৫৩]

তবে ভাবানুবাদ করতে গিয়ে দু'এক জায়গায় কোন কোন শব্দের অর্থ বাদ পড়েছে। যেমন:

**মূল পাঠ**

الملكة : (تتأمله لحظة في إشفاق, ثم تجذبه) تعال أيها العزيز اجلس إلى جانبى[৫৪] على هذا الفراش, ولا تحزن كل هذا الحزن!... لقد آن لهذا الشر أن يزول عنا!...

**অনুবাদ**

রানী : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে এবং রাজাকে পাশে টেনে) প্রিয়তম, আমার আরো কাছে আসুন। দুঃখ করবেন না। রোগ নিশ্চয়ই সেরে যাবে এবং সে সময় এসেছে।[৫৫]

এখানে অনুবাদক মূল পাঠে উল্লিখিত الفراش শব্দের অর্থ করেননি। মূলত "আমার আরো কাছে আসুন" এ বাক্যের অর্থ হবে "এ বিছানায় আমার পাশে বসুন"।

আবার দুএক জায়গায় দু'এক লাইনের অনুবাদ একেবারে ছাড়া পড়েছে। যেমন:

الملك: وأن الناس[৫৬] كلهم قد شربوا منه !..
الوزير : أعرف !..

**অনুবাদ**

রাজা : লোকেরা সবাই ঐ নদীর পানি পান করেছে।
মন্ত্রী : আমি তা জানি।

ড. হোসায়েনের মত আব্দুস সাত্তারও উক্ত দু' লাইনের অনুবাদ করেননি। নাট্যকার তাওফীক আল হাকীম যেহেতু প্রাচীন কালের কোন এক প্রাসাদকে এ একাঙ্কিকাটির ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু প্রাচীন কালের উপযোগী ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শব্দাবলিও এ নাটকে স্থান পেয়েছে। যেমন প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী আকাশকেই প্রভুর আসনে রেখে সকল শক্তির আধার হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। প্রার্থনা, প্রার্থনাকক্ষ, পুরোহিত প্রভৃতি শব্দাবলি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আব্দুস সাত্তার এ নাটকটির অনুবাদ করতে গিয়ে উপরিউক্ত শব্দাবলি প্রতিশব্দ হিসেবে এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির উপযোগী শব্দকে বেছে নিয়েছেন। যেমন:

| মূল নাটকের ধর্মীয় শব্দ | প্রকৃত বাংলা অনুবাদ | আবদুস্ সাত্তারের অনুবাদ |
|---|---|---|
| السماء | আকাশ | আল্লাহ |
| واحسرتاه | হায় আফসোস | সুবহানাল্লাহ |
| معبد القصر | প্রাসাদের প্রার্থনাকক্ষ | মসজিদ |
| نصلى | নামায পড়ি | প্রার্থনা করি |
| رأس الاطباء | প্রধান চিকিৎসক | চিকিৎসক |
| كبير الكهان | পুরোহিত প্রধান | ধর্মগুরু |

---

[৫৩] *আধুনিক আরবী নাটক*, পৃ. ৪৭।
[৫৪] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৭৪।
[৫৫] *আধুনিক আরবী নাটক*, পৃ. ৫৪।
[৫৬] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৭৯।

### তুলনামূলক আলোচনা

আলোচ্য অনুবাদ দুটির তুলনা করলে দেখা যায় যে, দুটি অনুবাদই মূল আরবি নাটকের ভাবানুবাদ। তবে ভাবানুবাদ করার কারণে মূল নাটকের আবেদনে কোনো ঘাটতি পড়েনি। যেমন রানী রাজাকে সুস্থ করার জন্য ধর্মগুরুকে অলৌকিক কিছু ঘটানোর অনুরোধ করলে তিনি বললেন:

### মূল পাঠ

كبير الكهان : إن السماء يا مولاتى ليست كالنخيل , يستطيع الإ نسان أن يستنزل منها ماشاء من ثمار!....[৫৭]

### আব্দুস সাত্তারের অনুবাদ

ধর্মগুরু : রানী মা, অলৌকিক জিনিস তো আর গাছের ফল নয় যে, যে-কোন লোকই তা হাত দিয়ে পেড়ে আনতে পারবে?[৫৮]

### সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের অনুবাদ

ইমাম : সৌভাগ্য তো গাছের ফল নয় যে ইচ্ছে করলেই কুড়িয়ে আনা যাবে।[৫৯]

আলোচ্য সংলাপে দেখা যায়, النخيل (খেজুর বা খেজুর গাছ) শব্দের অর্থ দুজনই গাছের ফল করেছেন। দুজন অনুবাদকই তাওফীক আল হাকীমের ব্যবহৃত ধর্মীয় শব্দগুলোকে ইসলামি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় তারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন আব্দুস সাত্তার قضاء শব্দের অর্থ করেছেন অদৃষ্ট।[৬০] আর ড. হোসায়েন করেছেন তকদীর।[৬১] তবে তকদীর বাঙালি পাঠকের কাছে বেশি বোধগম্য হয়েছে।

নাটকের পাঁচটি চরিত্রের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে। যেমন চরিত্রগুলোর আরবি নামসহ দুজনের অনূদিত নামগুলো নীচে দেওয়া হলো:

| মূলনাটকের চরিত্র | প্রকৃত বাংলা অনুবাদ | আব্দুস সাত্তারের অনুবাদ | ড. হোসায়নের অনুবাদ |
|---|---|---|---|
| الملك | রাজা/ বাদশাহ | রাজা | বাদশাহ্ |
| الملكة | রানী/ বেগম | রানী | বেগম |
| الوزير | মন্ত্রী/ উযীর | মন্ত্রী | উযীর |
| رأس الأطباء | প্রধান চিকিৎসক | চিকিৎসক | হাকীম |
| كبير الكهان | পুরোহিত প্রধান | ধর্মগুরু | ইমাম |

---

[৫৭] তদেব, পৃ. ১৭১।

[৫৮] *আধুনিক আরবী নাটক*, পৃ. ৫১-৫২।

[৫৯] *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৬৯।

[৬০] *আধুনিক আরবী নাটক*, পৃ. ৫০।

[৬১] *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৬৮।

দুটি অনুবাদেই নাটকের দুয়েক জায়গায় অনুবাদ ছাড়া পড়েছে। যেমন: নাটকের শুরুতেই নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে তাওফীক আল হাকীম উল্লেখ করেছেন:

(بهو فى قصر ملك من ملوك العصور الغابرة)
(الملك و وزيره منفردان ...) [৬২]

অনুবাদ (প্রাচীনকালের কোনো এক রাজার রাজপ্রাসাদের বহিরাঙ্গন)। (রাজা ও মন্ত্রী একান্তে...)।

উল্লিখিত লাইন দুটির অনুবাদ দুজনই ছেড়ে দিয়েছেন।

তাছাড়া মূল নাটকের ভিতরে নিম্নোক্ত সংলাপগুলোর অনুবাদ কেউই করেননি।

الوزير : جئتك بخبر هائل
الملك : (فى رجفة) ماذا أيضا...؟[৬৩]
الملك : ولكنا لسنا بمجنو نين!..
الوزير : كيف نعلم؟!...[৬৪]
الملك : وأن الناس كلهم قد شربوا منه!...
الوزير : أعرف !...[৬৫]

তাছাড়া এক জায়গায় দুটি অনুবাদেই সংলাপ উলট-পালট হয়ে গেছে। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে, রানীও পাগলামীর নদীর পানি পান করে উন্মাদ হয়ে গেছেন? এর জবাবে মন্ত্রী বললেন, তার ভাব-ভঙ্গি ও চাল-চলন দেখেই বুঝতে পারলাম। তাছাড়া তার কাছে যেতে না যেতেই তিনি ভয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। তার সঙ্গী-সাথী ও পরিচারিকারাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করতে লাগল। এর পর রাজা বললেন:

**মূল পাঠ**

الملك : (كالمخاطب نفسه) كل هذا بدا لعينى فى تلك الرؤيا!...
رحمة بنا أيتها السماء!...[৬৬]

**অনুবাদ**

রাজা : (মনে মনে) স্বপ্নে আমি এরকমই দেখেছিলাম। হে আল্লাহ! আমাদের উপর রহম করো।

'হে আল্লাহ ! আমাদের উপর রহম করো' রাজার এ উক্তিটি দু'অনুবাদকই মন্ত্রীর বক্তব্য হিসাবে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আসলে সেটি রাজার বক্তব্য। এজন্য পরবর্তী সংলাপটি মন্ত্রীর হওয়া সত্ত্বেও তারা রাজার উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হয়ত অসাবধানবশত এমনটি হয়েছে।

---

[৬২] *নাহরুল জুনূন*, পৃ. ১৬৬।

[৬৩] তদেব, পৃ. ১৭১।

[৬৪] তদেব, পৃ. ১৭৮।

[৬৫] তদেব, পৃ. ১৭৯।

[৬৬] তদেব, পৃ. ১৬৭।

সর্বোপরি দুটি অনুবাদই উপভোগ্য ও সুখপাঠ্য হয়েছে। মূল পাঠের সথে যথাসম্ভব সঙ্গতি রাখা হয়েছে।

## উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আরবি ভাষার নাট্যকর্ম বাংলায় অনুবাদ করে সেই ভাষার মূলভাব ও আবেদন অক্ষুণ্ন রাখা এবং বাংলা ভাষার সাথে তার সঙ্গতি প্রদান সহজ কাজ নয়। এহেন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে দুজন খ্যাতিমান অনুবাদক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের অনুবাদে সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেলেও সামগ্রিক বিবেচনায় অনুবাদ দুটি আরবির সাথে সঙ্গতি রেখে করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। নাটকটির বাংলা অনুবাদ যাতে বাঙালি পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয় এবং মঞ্চায়নেরও যোগ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# বাংলাদেশের টুরি জাতিগোষ্ঠী : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন

মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী*

**Abstract:** The aim of the present article is to decipher the indentity and to discribe the cultural pattern of the *Turi* a least known ethnic group of North-western Bangladesh. Actually, the *Turi* is a disappearing community today. They migrated from the Rajmahal hill range of the western coast of India to this region. Over the century; after settlement in this region the *Turi* give up the hunting-gathering economy and adopted proto agrarian life style. They are Austro-Mundari speaking animist people. They have got traditional *parha* organization headed by a *Moral*. They have got a two tier political organization and the *Mandal* is the chief of that. This is an urgent aspect to be studied by the social scientist today.

## ক. ভূমিকা

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এবং সার্বিক পরিবেশ প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক আদিম ও পরিভ্রমণশীল জনগোষ্টীকে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলার জন্য আকৃষ্ট করেছে (Majumder, 1943)। বহু ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিতে পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অনেক জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে (Malony, 1977)। ফলে এদেশে এক মিশ্র জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ অঞ্চলে গড়ে ওঠেছে বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর বসতি। সে জন্য আজও বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী (Ethnic group) বসবাস করে। বরেন্দ্র অঞ্চল তথা দেশের উত্তর-উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় 'টুরি' নামক একটি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তবে টুরিরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মতো টুরিরা চিরাচরিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বর্তমানে এ সম্প্রদায়টি বিলুপ্তির পথে। তাই তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা খুবই দুরূহ। এ জনগোষ্ঠীটি সম্পর্কে জাতিতাত্ত্বিক সাহিত্যে বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। তাই ক্লাসিক্যাল লেখাসমূহে কিছু তথ্য (Dalton, 1973 & Risley, 1891) থাকলেও উত্তরকালে এদের প্রতি গবেষক-পণ্ডিতদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। বিশেষভাবে বাংলাদেশে এ যাবৎকাল টুরিরা অপরিচিত ও উপেক্ষিতই থেকেছে। আর এভাবে এরা (টুরি) হারিয়ে যেতে বসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে টুরিদের চিহ্নিতকরণ ও পরিচয় বিশ্লেষণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

---

* ড. মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী ,সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বাংলাদেশের একটি বিস্মৃতপ্রায় অথবা অচেনা জাতিগোষ্ঠী টুরিরা সম্ভবত পশ্চিম ভারতের মূল জনস্রোত থেকে পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইদানীং বাংলাদেশের জনবিন্যাসের মধ্যেও তারা হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে টুরি সম্প্রদায়ের আপন ঐতিহ্যগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা সাম্প্রতিক কালে কতটুকু ক্রিয়াশীল রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হওয়াই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো টুরি জাতিগোষ্ঠীর জৈবিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। এছাড়া তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও আচরণের দিকসমূহ বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

জাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত গবেষণার একটি মৌল কৌশলই হচ্ছে ক্ষেত্র অনুসন্ধান বা মাঠ পর্যায়ের তথ্য আহরণ। কেননা উক্ত গবেষণা কৌশলের মাধ্যমেই কোনো একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনযাপন প্রণালীর অবিকৃত ও অকৃত্রিম তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যই এ ধরনের গবেষণার জন্য মুখ্য উপাদান। মাধ্যমিক সূত্র অর্থাৎ প্রকাশিত বই-পুস্তক, জার্নাল, রিপোর্ট ইত্যাদি থেকেও কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মূলত প্রাথমিক উপাত্তভিত্তিক। ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণভিত্তিক (Participant observation) পদ্ধতি অবলম্বনে এ তথ্যসমূহ সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে (পশ্চিম দিকে) সীমান্তবর্তী একটি প্রত্যন্ত পল্লিতে বসবাসকারি টুরি জাতীগোষ্ঠীর উপর অনুসন্ধান চালানো হয়। পল্লিটি ধরনী নামে পরিচিত। এটা জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় অবস্থিত। এরা মূলত ভূমিহীন এবং যাযাবর শ্রেণীর মানুষ। এদের মূল পেশা কৃষিশ্রমিক। তবে অবসর সময়ে কুটির শিল্প অর্থাৎ বাঁশজাত নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করে থাকে। তাদের জীবনের সর্বত্র প্রাচীন জীবনধারার ছাপ সুস্পষ্ট। শহরের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। অসুখ-বিসুখের সময়ে তারা সাধারণত তাদের সম্প্রদায়ের ওঝার শরণাপন্ন হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ধরনী গ্রামে মোট ২১টি টুরি পরিবার বসবাস করে এবং এদের মোট সংখ্যা ৬১ জন—এদের মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ এবং ২৭ জন মহিলা। গবেষণার জন্য ধরনী পল্লিতে বসবাসরত ২০ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক মোট ২২ জন পুরুষ এবং ১৬ জন মহিলার একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। টুরি সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক জীবনধারা পর্যবেক্ষণের জন্য ধরনী পল্লিতে প্রায় মাসতিনেক অবস্থান করতে হয়েছে।

## খ. টুরি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও জাতিগত পরিচয়

'টুরি' নামের উৎপত্তি ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিত গবেষকদের মধ্যে এখনো যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। উনিশ শতকে ইউরোপীয় গবেষক-প্রশাসক ও খ্রিস্টান মিশনারির কর্মকর্তা, খ্রিস্ট ধর্মযাজকগণ এবং পরবর্তীকালে দেশীয় গবেষকগণ টুরিদের যথার্থ পরিচয় ও আদি উৎসভূমি, প্রাচীন বিচরণ ক্ষেত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অন্যান্য দিকসহ 'টুরি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, অনেকে টুরিদেরকে "Tori" "Tari" "Toria" বলে অভিহিত করেছেন। ব্রিটিশ প্রশাসক-গবেষক H. H. Risley টুরিদের নামকরণের কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তিনি তাঁর *The Tribes and Castes of Bengal* নামক গ্রন্থে উক্ত জনগোষ্ঠীটিকে 'টুরি' (Tori) বলে উল্লেখ করেছেন (Risley, 1891)। অনেকের ধারণা

টুরিরা খুব ভালো করে 'তুরমি' বা বাঁশি বাজাতে ও তৈরি করতে পারে। এ জন্যই তাদেরকে টুরি বা তুরিয়া বলা হয়। স্থানীয়ভাবে তাদেরকে তো-র-ই ->তোরি বলে সম্বোধন করা হয়। এ ধরনের সম্বোধন থেকে তাদের নাম হয়েছে 'টুরি'।

### *খ. ১ : দৈহিক বৈশিষ্ট্য*

বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে টুরিদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ভারতের সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও খাড়াদিগড় খড়িয়াগাড়ি এক সময় তাদের পূর্ব পূরুষের বাসস্থান ছিল। এটা তাদের কথাবার্তা ও দিক নির্দেশনা থেকে খুব সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। ভারতের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাথে এদের যেমন পার্থক্য রয়েছে; তেমনি মিলও রয়েছে প্রচুর। টুরিরা স্পষ্টত অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। তাদের শারীরিক গঠনের সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলের কোনো কোনো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাদৃশ্য রয়েছে (যারা অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ)। বিশেষভাবে সাঁওতাল, কোচ ও মুণ্ডাদের সাথে। দৈহিক উচ্চতায়-টুরিরা মাঝারি ধরনের। দেহের গঠন সুঠাম, মুখমণ্ডল হাল্‌কা লম্বাটে, গাল (চোয়াল) ডানে ও বামে প্রসারিত। চিবুক ছোট তবে চেপ্টা। গায়ের রং কালো, অমসৃণ চামড়া। মাথা গোলাকার, চুল কালো ও কোঁকড়ানোর প্রবণতা রয়েছে। মুখে পাতলা দাড়ি গোফ রয়েছে। নাসার প্রান্তভাগ প্রসারিত এবং নাসামূল অবদমিত, কর্ণদ্বয় মাঝারি আকৃতির। চক্ষুদ্বয় ক্ষুদ্রাকৃতির এবং চোখের মণি কালো রঙের। প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম বিশ্বাস এবং মন মানসিকতার দিক থেকেও অস্ট্রিক জাতিভুক্ত মানুষদের সাথে বেশ মিল রয়েছে। টুরিরা অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মত নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে বসবাস করতে ভালবাসে। আগন সমাজ বা গোষ্ঠীর বাইরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্যদের সাথে তাদের যোগাযোগ খুবই সামান্য। তাই অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মতো তাদের মধ্যেও অন্তর্মুখিনতা বিদ্যমান এবং জনমিশ্রণের (Racial admixture) সুযোগ সামান্য।

অন্যদিকে E.T. Dalton তাঁর *Tribal History of Eastern Indian* (1973) নামক গ্রন্থে টুরিদের গোত্র বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি টুরি সম্পর্কে বলেন, টুরিরা ভারতের সাঁওতাল পরগণা ও তৎসন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী সম্প্রদায়ের বংশধর। তবে বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতাল, কোচ, মাহলিদের সাথে টুরিদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও কথাবার্তায় মিল রয়েছে। যদিও টুরিরা তাদের বংশ ও গোত্র পরিচয় যথার্থভাবে দিতে পারে না। টুরিরা এদেশে আগমনকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে আঠারশো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আগমন করেছে বলে ধারণা করা হয়।

টুরি জাতির উদ্ভব ও তাদের অতীত পরিচয় সম্পর্কে নানান পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তাদের আদি বাসস্থান ভারতের কোনো এক পাহাড়ের জলাশয়ের নিকট ছিল। যেখানে শূকর ও এক তরুণীর মিলনের ফলে তাদের পূর্ব পুরুষের (Ancestor) জন্ম হয়। এ কাহিনীর সাথে আফ্রিকার ডাহমিয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের মিল আছে (Hoebel, 1966)। যদিও এ ধরনের কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই কঠিন। তবে এসব পৌরাণিক কাহিনী, গোত্র বিভাজন, খাদ্য, পেশা এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে টুরিদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। টুরিদের অবিরাম স্থানান্তর গমনের (Migration) প্রবণতা এবং তার বিবরণ তাদের স্মৃতিপটে ঝাপসা কল্পকথা হিসেবে টিকে রয়েছে। তাই তাদের উদ্ভব ও প্রাচীন সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হয়তো আর কোনো ভাবেই জানা সম্ভব হবে না।

### খ. ২ : গোত্র বিভাজন

গোত্র বা টোটেম ভিত্তিক সমাজ বিন্যাস টুরি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। ঐতিহ্যগত অনেক রীতিনীতি ও প্রথা প্রতিষ্ঠান টুরি সমাজ থেকে ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও টোটেমের ধারণা সুস্পষ্টভাবে টিকে আছে। তাই সমাজ সংগঠনের অন্যতম নির্ধারক হিসেবে টোটেমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। টুরিদের মধ্যে একাধিক টোটেমভিত্তিক গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তারমধ্যে 'তিওরী' ও 'টুরি' (Tiauri & Tori) অন্যতম। ধারণা করা যায় যে, বর্তমানেও টুরিদের মধ্যে টুরি ও তিওরী নামে দুটো গোত্র রয়েছে। বিভিন্ন নথি-পত্র, বই-পুস্তক এবং স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের ভাষ্য অনুযায়ী টুরিরা একাধিক উপগোত্রে বিভক্ত। প্রকৃত পক্ষে এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর গোত্র-বিভাজন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই দুষ্কর। দেড়-দুই শতকেরও বেশি সময় পূর্বে টুরিদের উপর প্রথম অনুসন্ধান করা হলেও টুরিদের গোত্র বিভাজনের বিষয়টি বলতে গেলে এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, যদিও টুরিরা একাধিক গোত্রে বিভক্ত তবু তাদের মধ্যে বহির্বিবাহ রীতি (Exogamy) বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

### খ. ৩. : ভাষা

অনেক জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় টুরিদের নিজস্ব বর্ণমালা বা ভাষার লিখিত কোনো রূপ নেই। তাই তাদেরকে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায় অনক্ষর সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী বলা যায়। তবে রিজলী ও ডালটন উভয়ই বলেন যে, টুরিরা ভারতের বিহার, সাঁওতাল পরগণা, খাড়াদিগড়, খড়িয়াগাড়ি ও ছোট নাগপুর এলাকায় বসবাস করার সময়ে যে ভাষায় কথা বলতো, তা প্রাচীন মুন্ডারি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। রিজলী আরো বলেন যে, বিন্ধ, গোন্দ, খরিয়াত (Khariat) ও টুরি জাতিগোষ্ঠী যে ভাষা ব্যবহার করতো তার সাথে সাঁওতালি ভাষার অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে। সাঁওতালরাও অস্ট্রো-মুণ্ডারি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানের টুরিদের পূর্ব পুরুষরাও ঐ ভাষায় কথা বলতো। একথা সঠিক যে, তাদের (টুরি) বর্ণমালা না থাকলেও নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে। অর্থাৎ তাদের ভাষার লিখিত কোনো রূপ নেই কথ্য রূপ আছে। বরেন্দ্রভূমি তথা এ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সময় টুরিদের সাথে যে সব জনগোষ্ঠী এখানে এসেছিল তাদের ধারণা টুরিরা এক সময় নিজস্ব ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু বর্তমানে তা বিলুপ্ত প্রায়। বর্তমানে টুরিরা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের দাবি করলেও এর পিছনে বাস্তব কোনো প্রমাণ নেই। যা হোক, টুরিরা যে বহু পূর্বেই তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলেছে তা ডালটনের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, "They have lost all trace of thier original language (Dalton, 1872)। বাংলাদেশের টুরিরা এখন কথা বলার সময় বাংলা (স্থানীয়) ও হিন্দি শব্দ মিশ্রিতভাবে 'সাদ্রি' ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তবে তারা অস্ট্রো-মুণ্ডারি ভাষা পরিবারের কোনো হারানো শাখায় মানুষ এতে সন্দেহ নেই।

### খ. ৪ : বিশেষ জাতিগত বৈশিষ্ট্য

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, টুরিরা দৈনন্দিন জীবনে যুগপৎ সংগ্রামশীলতা ও সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সাথে তাদের সংগ্রাম অবিরাম এবং প্রকৃতির কোলেই মানুষ, প্রকৃতির মতোই এদের অন্তর সরলতায় পরিপূর্ণ। সে জন্য সরলতা ও সততাকে তাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যায়। টুরিরা খুব পরিশ্রমী। নারী-পুরুষ সারাদিন মাঠে ময়দানে কঠোর

পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত। ইদানীং মৎস্য শিকার ও কুটির শিল্প (বাঁশ দিয়ে চাটাই, ডালি, ঝুড়ি, ঝাড়, কুলা) তাদের জীবন ধারণের অন্যতম অবলম্বন। তাই অধিকাংশ সময় মাছ শিকার ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। টুরিরা আনন্দ উল্লাস প্রিয় জনগোষ্ঠী। অন্যান্য সম্প্রদায় গোষ্ঠীর ন্যায় তারা নৃত্যগীত, মদ্য পান ভালবাসে। তারা অতিথি পরায়ণ। এখনো তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত উপলব্ধির চেয়ে সমষ্টিগত চেতনাই প্রবল। সমজাতীয় জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় টুরিরা অতীত ও বর্তমানের জোতদার, মহাজন, দালাল, সরকারি কর্মকর্তা, প্রশাসকের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার ছিল এবং বর্তমানে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অবজ্ঞা প্রভৃতির সঙ্গে নিত্য পরিচিত। তবু টুরিরা সাধারণত কারো সাথে সহজে বিবাদ বা সংঘাতে লিপ্ত হয় না। সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, অতিথি পরায়ণতা তাদের জাতিগত চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। এরূপ কঠোরতা ও কোমলতা তাদের জাতিগত চরিত্রে মিলেমিশে এক অনুপম রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে ক্রমশ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে তাদের সমাজ ও কর্ম জীবনে নতুন ধরার সূচনা হয়েছে।

### গ. টুরিদের জীবনযাত্রা

কোনো মানবগোষ্ঠীর পরিচিতি শুধুমাত্র তার ধর্ম, কর্ম, আত্মবিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মে ও আচার আচরণে যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বিবাহ-যৌনাচার, আমোদ-প্রমোদ, রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে।

#### *গ. ১ : অর্থনীতি*

প্রাকৃতিকভাবে টুরিরা ছিল শিকারি ও যাযাবর জনগোষ্ঠী। যখন তারা এদিকে (বরেন্দ্র) আগমন করে এবং বসতি গড়ে তুলতে থাকে তখন টুরিরা অনেকাংশে আহরণ-শিকার অর্থনীতির (Hunting and gathering economy) দশায় বিদ্যমান ছিল। টুরিরা পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও চারপাশের সামাজিক পরিস্থিতির রূপান্তরের ফলে তাদের প্রাচীন সংগ্রাহক ও শিকারি জীবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ক্রমশ এরা প্রতিবেশী কৃষি জনগোষ্ঠীর অনুকরণে জীবনধারাকে বদলাতে শুরু করে। এখন অনেকটা কৃষিজীবী ধাঁচে জীবনযাপন করে। তবে এখনো তাদের জীবনধারা মূলত জীবন-ধারণ অর্থনীতি ভিত্তিক (Subsistance enocomy)। এছাড়া টুরিরা ইদানীং কৃষি মজুর ও কুটির শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। স্থানীয় বাজারে বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিক্রয় করে এবং কৃষি মজুরি করে জীবিকা অর্জন করছে। উল্লেখ্য, অতীতে টুরিরা মাটি কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার, বিভিন্ন ধরনের বাঁশি তৈরি এবং পালকি বহনের কাজও করতো। টুরিরা সাধারণত সকলেই ভূমিহীন। তবে অনেকেরই শুধুমাত্র বাস্তুভিটা আছে, যার পরিমাণ ১.৫ কাঠার বেশি নয়।

#### *গ. ২ : খাদ্যাভ্যাস*

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতীতে পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করার সময় টুরিরা আহরণ ও শিকার ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনযাপন করতো। এমন কি বরেন্দ্র অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পরেও তাদের প্রাচীন অর্থনৈতিক জীবন ধারা কতকাংশে অক্ষুণ্ন ছিল। তখন এ অঞ্চলে বন জঙ্গল ও ছোট-বড় অনেক জলাশয় ছিল। এ সব বন বাদড়ে ফলমূল, লতাপাতা ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ এবং বন জঙ্গলে বিভিন্ন রকম বন্য প্রাণী পাওয়া যেত, যা তাদের প্রত্যাহিক খাদ্য তালিকার অপরিহার্য অংশ ছিল। তবে ভাত, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি টুরিদের প্রধান খাদ্য। তাছাড়া গম,

যব, মটর ও কলাইয়ের রুটি তারা পছন্দ করে। এছাড়া তারা খাদ্য হিসেবে শূকুর, ইঁদুর, কাঁকড়া, কচ্ছপ ও খরগোশের মাংস ভক্ষণ করে। যদিও এসব প্রাণী খুব বেশি পাওয়া যায় না। তাছাড়া শুকনো চিড়া, খৈ, মুড়ি বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও দুধ-দই পছন্দ করে। এসব খাদ্য অনেকে তৈরি করতে পারে। তবে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য যেমন-- বিড়ি, হুক্কা, গুল, তামাকের পাতা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকে। নিজেদের তৈরি বিশেষ ধরনের মদ/চুয়ানী টুরিরা পান করে থাকে।

### *গ. ৩ : পোশাক পরিচ্ছদ*

টুরিদেও পোশাক পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ। অতীতে পুরুষরা ল্যাংটি পরিধান করত। মেয়েরা ঘাগড়া ও ছোট এক খণ্ড কাপড় বুকে জড়িয়ে থাকত। এখন টুরিরা অধিকাংশ সময়ে লুঙ্গি, গেঞ্জি ও গামছা ব্যবহার করে। অন্যদিকে মেয়েরা শাড়ি, পেটিকোট ও ব্লাউজ ব্যবহার করে থাকে। কম বয়সী ছেলেরা হাফ প্যান্ট, শার্ট ও মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ ও ওড়না ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিশেষ অনুষ্ঠানে বা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গেলে অনেকে ধুতি, প্যান্ট, শার্ট ও জুতা পরিধান করে থাকে। এ অঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায় জনগোষ্ঠীর মেয়েদের মতো টুরি মেয়েরা খুবই সৌন্দর্যপ্রিয়। বিভিন্ন উৎসবে তারা বেশ সাজগোজ করে থাকে। তারা সুন্দর ও উঁচু করে মাথায় খোঁপা বাধে এবং ফুল ও ফিতা দিয়ে মাথা সাজায়। এছাড়া হাতে চুড়ি, নাক ফুল, মালা, হাঁসলি ইত্যাদি ধাতব অলংকার তাদেরকে পরিধান করতে দেখা যায়।

### *গ. ৪ : বাড়িঘর ও আসবাবপত্র*

টুরিদের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি ছোট ছোট। বাড়ি তৈরির জন্য তারা খড়, লতাপাতা, মাটি ও বাঁশ ব্যবহার করে থাকে। দু'একটি পরিবারের ঘরে ছাদ (চালা) টিনের হলেও বেড়া মাটি। বেশির ভাগ ঘরের বারান্দা রয়েছে। রান্না ঘর নেই বললেই চলে। অধিকাংশ পরিবার উঠানের ফাঁকা জায়গায় রান্না করে। তবে বর্ষা মৌসুমে তারা রান্নাঘর হিসেবে ঘরের বারান্দা ব্যবহার করে থাকে। টুরিরা ঘর-বাড়ি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। বিভিন্ন উৎসবে তারা ঘর-বাড়ি আল্পনা দিয়ে সাজায়। রান্নার জন্য টুরিরা চুলা (চুল্লী) ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এসব চুলায় এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তারা একমুখো চুলার চেয়ে দুই মুখ বিশিষ্ট চুলা বেশি ব্যবহার করে থাকে। আসবাব পত্রের মধ্যে তারা বাঁশ, কাঠ ও পাটের রশি দিয়ে তৈরি খাটিয়া ব্যবহার করে। অনেকে রাত্রে ঘুমানোর জন্য বাঁশের টং (মাচা) ব্যবহার করে। এছাড়া পিঁড়ি, টুল, খড়ের মোড়া তাদেরকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। মাটির হাড়িসহ বিভিন্ন ধাতব বাসনপত্র টুরিরা ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া দৈনন্দিন কাজের জন্য দা, বটি, কোদাল, হাঁসুয়া, নিড়ানি, ঝাড়ু, টুকরি, ডালা, কুলা, মাছ ধরার বিভিন্ন ধরনের জাল ও শিকারের জন্য তীর-ধনুক ব্যবহার করে থাকে। প্রতিবেশী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো টুরিরা কৃষি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। পূর্বে টুরিরা পশু-পাখি শিকার করলেও সম্প্রতি শিকার করার প্রবণতা কমে আসছে। ফলে শিকারের উপকরণ খুব কম লোকেরই দেখা যায়।

## ঘ. পারিবারিক উৎসব

অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় টুরিরাও উৎসবপ্রিয় জাতি। তারা বর্ষচক্রব্যাপী বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালন করে থাকে। তার মধ্যে জন্ম, বিবাহ ও অন্যান্য পার্বণিক অনুষ্ঠান এবং মৃত্যুকেন্দ্রিক শেষকৃত্য

অনুষ্ঠানই প্রধান। সব অনুষ্ঠান আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও বিবাহ ও পার্বণিক অনুষ্ঠানগুলো যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে সম্পন্ন হয়।

### *ঘ. ১ : জন্মোৎসব*

পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর টুরিরা অন্য জনগোষ্ঠীর মতোই আনন্দ প্রকাশ করে। এ সময় আঁতুড়ে ঘর জাল দিয়ে ঘিরে দেয় এবং ঘরের বাহিরের চারকোণা নিম বা জিগনি (জিকা) গাছের শাখা পুঁতে দিয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাস এর ফলে প্রসূতি কিংবা নবজাতকের উপ অপদেবতার কোনো অশুভ নজর পড়বে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বাঁশের চটা (বাঁশের গায়ের সবুজ অংশ) দিয়ে শিশুর নাড়ি কাটা হয়। শিশুর নাড়ি কাটার কাজটি প্রসূতি কিংবা নবজাতকের মাতৃস্থানীয় কোনো মহিলা করে থাকে। অতীতে তাদের সমাজের বয়স্ক মহিলারা এ কাজটি সম্পন্ন করতো। সম্প্রতি শিশুর নাড়ি কাটা হয় সাধারণত ব্লেড দিয়ে। তবে চিরায়ত প্রথা অনুযায়ী নাড়ি কাটার সময় তারা বাঁশের চটা হাতে রাখে। শিশুর নাড়ির কর্তিত অংশ কোনো উঁচু জায়গায় পুঁতে (গর্তে) রাখা হয়। তাদের বিশ্বাস উঁচু জায়গায় নাড়ি পুঁতে রাখলে জীবনে শিশুটি ধন-সম্পদে বড় (উঁচু) হবে এবং স্বভাব চরিত্র উঁচু মানের (ভালো) হবে। শিশু জন্মানোর পর প্রথম দশ দিনের যে কোনো বেজোড় দিবসে নবজাতকের মাথা কামানো হয়। ঐ রাত্রিকে তারা 'সাথু' রাত বা ষাটের রাত বলে। তারা সাথু রাত উদ্‌যাপন উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করে থাকে। শিশুটি যদি পুরুষ সন্তান হয় তবে ঐ রাত্রে শিশুটির পাশে বিভিন্ন ধরনের শিকারের উপকরণ রাখে, যাতে করে সে তার কর্ম জীবনে ভাল শিকারি হতে পারে। মেয়ে শিশু হলে তারা শামুকের মালা, শাপলা ফুল এবং ছোট ছোট হাড়ি পাতিল রাখে। তাদের বিশ্বাস নবজাতক সংসার জীবনে কর্মঠ হয়। অত্মীয় স্বজনদের জন্য তারা সাধ্যমতো ভাল খাবার আয়োজন করে থাকে। এসব রীতিনীতি তাদের প্রাচীন আহরণ ও শিকার অর্থনীতির সাক্ষ্য বহন করে। শিশুর (নবজাতক) মাথার চুল কামানো না হলে নাম রাখা নিষেধ (Taboo)। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু ও প্রসূতির অশুচিতা দূর হয়। ইদানীং অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে তাদের এ সব আনুষ্ঠানিকতা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

### *ঘ. ২ : বিবাহ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান*

সাধারণত সকল সমাজেই বিবাহকে ব্যক্তি জীবনের কল্যাণকর দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। টুরি সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে টুরিরা অন্তর্বৈবাহিক দল (Endogamous group)। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। টুরি সমাজে নারীর সতীত্বের উপর খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। এটা তাদের ধর্মীয় বিধান। বিয়ের ব্যাপারে বর ও কনের অভিভাবকদের মধ্যে কথা হয়। বিয়ের আলাপ আলোচনার প্রথম পর্ব শেষ হবার পর পাড়ায় সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি তথা মোড়লের সাথে এ বিষয়ে কথা হয়। বর ও কনে উভয় পক্ষের কোনো অসুবিধা না থাকলে মোড়ল ( প্রবীণ) বিয়ের দিন ও শুভক্ষণ ঠিক করে দেয়। বিয়ে ঠিক হবার পর নির্ধারিত তারিখে বরযাত্রী কনের বাড়িতে হাজির হয়। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বরপক্ষ কন্যার বাড়ির উঠানে অপেক্ষা করে। উল্লেখ্য, টুরিদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বর ও করে বিয়ে প্রথমে মেয়ের বাপের বাড়ি বা পাড়ার সবচেয়ে পুরাতন বৃক্ষের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য ঐ গাছটি আগে থেকে বিয়ের বিভিন্ন রকম উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। ঐ গাছের পাতা ছেড়া বা গাছ কাটা নব দম্পত্তির জন্য ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর পাড়ার অধিকাংশ সমগোত্রীয় লোকের উপস্থিতিতে বিয়ের বাকি কাজ সম্পন্ন হয়। বাল্য বিবাহ ও

বহু বিবাহের প্রথা চালু থাকলেও টুরির সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, তবে ঐ স্বামীকে প্রমাণ করতে হবে যে, তার প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা। বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক টুরি সমাজে অনুমোদন করে না। কেউ যদি স্বগোত্রের বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে একঘরে করে রাখা হয় এবং সমাজে সে অধঃপতিত বলে গণ্য হয়। বিয়ের সময় টুরি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপঢৌকন হিসেবে বরকে কনে পক্ষ নগদ অর্থ, নতুন কাপড়, রান্নার জন্য বাসনপত্র, কাথা বালিশ, পান-সুপারি দেয়। আবার অনেক বরপক্ষ নববধূকে কিছু নতুন উপহার সামগ্রী দিয়ে বরণ করে থাকে।

### *ঘ. ৩ : পার্বণিক উৎসব-অনুষ্ঠান*

টুরি সম্প্রদায় বর্ষচক্রব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তাদের উৎসবের প্রাণ হলো পানাহার ও নৃত্যগীত। অঞ্চল ভেদে উৎসবাদির একটু হেরফের পরিলক্ষিত হলেও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ইদানীং হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন—শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও গঙ্গাপূজায় তারা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে টুরিরা এখনো হিন্দুদের কোনো অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে না। মূলত তারা সর্বপ্রাণবাদী (Animist) এবং বিভিন্ন অদৃশ্য ভূত-প্রেত ও প্রাণী, বৃক্ষ, শস্য, জলাশয়, পাহাড় ও অগ্নির প্রতি ভক্তি ও ভয় পোষণ করে থাকে। বাংলা বৎসরের ফাল্গুন মাস থেকে টুরিদের বিভিন্ন উৎসব আরম্ভ হয়। এ সময় প্রকৃতি নতুন পাতায় ও ফুলে সজ্জিত হয়। ফাল্গুন মাসের প্রথম শনিবার তারা দেবতার নামে খৈ, মুড়ি, দুধ, কলা উৎসর্গ করে দেয় এবং এর মধ্যে দিয়ে তাদের বার্ষিক উৎসব শুরু হয়। এ সময় টুরিরা দুধ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তৈরি করে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। নারী পুরুষ সবাই এসব অনুষ্ঠানে যোগদান করলেও কোনো বিধবা নারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ধরনের অনুষ্ঠানে বিধবাদের অংশগ্রহণ করা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নিষিদ্ধ (Taboo)। শরৎকালীন উৎসবে টুরিরা কলা গাছের ভেলা তৈরি করে তাতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বড় জলাশয় বা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কার্তিক মাসে জমিতে অধিক উৎপাদনের আশায় জমির চারকোণায় সূর্যাস্তের সময়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। পৌষ মাসের প্রথম সোমবার টুরিরা 'আমজাই' উৎসব পালন করে। পৌষ মাস আমন ধান কাটার মৌসুম। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য তারা এ উৎসব করে থাকে। এ সময় গরু-মহিষের শিং, কপালে তৈল এবং সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের লতা-পাতা ও গুল্ম দিয়ে তৈরি মালা গবাদি পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেয়। এ সময় তারা আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত করে এবং পাড়ায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। উল্লেখ্য, ঐ অনুষ্ঠানে পাণ্ডাবাবা (পুরোহিত) তাদের ধর্মীয়/পৌরণিক কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। এমনকিভাবে টুরি সমাজে সারা বর্ষব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক উৎসবাদি পালিত হয়ে থাকে। শত কষ্ট ও ক্লেশের মধ্যেও তারা সামাজিক উৎসব গুলো পালন করে থাকে। সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত উৎসবাদির পেছনে প্রবল ধর্মীয় অনুভূতিই কাজ করে থাকে।

### *ঘ. ৪ :ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা*

পৃথিবীর অসংখ্য আদিম জনগোষ্ঠীর মতো টুরিরাও প্রকৃতি পূজারী এবং সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। মূলত তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ধর্মীয় ধারণাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তারা কতিপয়

অদৃশ্য ও অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করে। তাদের ধর্মবিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিবিধ মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে এক জটিল বিশ্বাস ব্যবস্থার (Belief system) বিকাশ ঘটেছে। টুরিদের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে রয়েছে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা। আগে উল্লেখ করা হয়েছে পাহাড়, পাথর, জলাশয়, নদী, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, ভূমি (শস্যক্ষেত্র) বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও অনুরূপ বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে কতক অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় সত্তার উৎসমূল হিসেবে তারা শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে। এছাড়া তারা বহু অশরীরী অথচ শক্তি সম্পন্ন ভূত-প্রেতকে ভয় ও ভক্তি করে। টুরিরা শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে উপাসনা করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এ আগুন সৃষ্টিকর্তার এক ধরনের শক্তি, যা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ধরনের উপদ্রবের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করবে। ভারতের রাঁচি, ছোটনাগপুর ও ধানগড় অঞ্চলের কোনো কোনো এলাকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্ম বিশ্বাসের সাথে টুরিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। টুরিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ যেমন—একদিকে পার্থিব জীবনের কল্যাণের লক্ষ্যে আয়োজিত হয়, তেমনি অন্যভাবে বলা যায়, তাদের সমগ্র জীবন ব্যবস্থা ধর্মবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

### *ঘ. ৫ : রাজনৈতিক সংগঠন ও আচরণ*

টুরিদের রাজনৈতিক সংগঠন ও আচরণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। টুরিদের রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রে রয়েছে জাতিগোষ্ঠীর সম্পর্ক। এরা প্রধানত জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বসতি গড়ে তোলে। সেজন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ও রাজনৈতিক আচরণ একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। টুরি সমাজে দুইস্তর বিশিষ্ট নেতৃত্বের ধারা পরিলক্ষিত হয়। মোড়ল হচ্ছে রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। মোড়ল সমাজের শীর্ষ ব্যক্তি বা গোত্রপতি তিনি সমাজের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে সমাজের নেতৃত্ব দান করেন। বিবাহ, মৃত্যু, বিবাদ, মীমাংসা সব কিছুতেই মোড়লই গোত্রের নির্ধারক। মোড়ল নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে মুখপাত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকেন। মোড়ল আপন সম্প্রদায়ের যে কোনো বিবাদ মীমাংসার প্রধান ব্যক্তি। মোড়লের পদটি পারিবারিক উত্তরাধিকারী হিসেবে অর্জিত হয়। অর্থাৎ একজন মোড়লের মৃত্যুর পর তার পুত্র কিংবা উত্তরাধিকারি যে কোনো পুরুষ ঐ মোড়লের দায়িত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ঝিমোড়ল ও সাধিমোড়ল। ঝিমোড়ল সমাজের দ্বিতীয় নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি এবং স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। সাধিমোড়ল পাড়ার ছোট-খাট বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করে থাকে। তিনি মূল মোড়লের একজন সহযোগী হিসেবেও কাজ করেন। মূল মোড়ল নিজ সমাজের মধ্যে নেতৃত্ব দান করেন এবং প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয়কারী বা যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করেন। টুরিদের সাথে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব-বিরোধ হলে সে ক্ষেত্রে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রেও সাধিমোড়ল তাকে সহযোগিতা করেন। সাধিমোড়ল মূলত টুরি সম্প্রদায়ের পুরোহিত বা ধর্মীয় নেতা। তিনি বিভিন্ন উৎসবাদিতে পৌরোহিত্য করেন। তার নেতৃত্বে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান উৎযাপিত হয়। তিনি সম্প্রদায়ের কারো উপর ভূত-পেতনির কুদৃষ্টি হলে কিংবা রোগ বালাই হলে তাবিজ-কবজ দিয়ে থাকেন। ভূত-পেত্নি বিতাড়ণের জন্য সাধি মোড়ল ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। টুরিরা ক্রমশ বাংলাদেশের মূল রাজনৈতিক ধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কিংবা স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বের সাথে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। টুরিরা ক্রমশই জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। পরিলক্ষিত হয়েছে স্থানীয় ও

জাতীয় বিভিন্ন নির্বাচনে তাদের অনেকেই ভোট দিতে যায় এবং স্বপক্ষের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে তারা মোড়ালের নির্দেশ মোতাবেক ভোট প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এটা তাদের গোত্র ভিত্তিক প্রাচীন জীবনধারার পরিচায়ক।

## ঙ. উপসংহার

টুরিরা বরেন্দ্র অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। তাদের ভাষা ও আচার ঐতিহ্যের মধ্যে আজও এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মতো টুরিরা আহরণ ও শিকার জীবন পরিত্যাগ করে কৃষি ভিত্তিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। টুরিরা বাংলাদেশে কয়েক শতক ধরে বসবাস করলেও এদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংখ্যাস্বল্পতা ও ঘন ঘন আবাসস্থল পরিবর্তন এর অন্যতম কারণ। স্থানীয় জনগণও তাদেরকে (টুরি) সাঁওতাল, কোঁচ, মুণ্ডা প্রভৃতি গোষ্ঠীর সাথে একাকার করে দেখতে অভ্যস্ত। কঠোর জীবন সংগ্রামের কারণে টুরিরা তাদের স্বকীয়তাকে কখনো প্রকাশ করতে পারেনি বরং তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ ঢাকা পড়ে গেছে। জৈবিক, উত্তরাধিকার ও জীবনযাপন রীতিসহ বহু ক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য থাকলেও কালের প্রবাহে পারিপার্শ্বিক সমাজ সমূহের অদৃশ্য চাপের ফলে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। টুরিরা এখন একটি দ্রুত বিলীয়মান সম্প্রদায়। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবার পূর্বেই তাদের সমাজ-সংস্কৃতি তথা সমগ্র জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

## তথ্যপঞ্জি

Dalton, E.T. (1973) *Tribal History of Eastern India*. Delhi: Cosmo Publication.

_________. (1872) *Descriptive Ethnology of Bengal*. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing.

Hoebel, E. A. (*1966) Anthropology, The Study of Man, 3rd Edition, New York: McGrow-Hill.*

Majumber, R.C. (1943), *The History of Bengal*. Vol. I. Dacca: Dacca University.

Maloney, C. T. (1977), "Banglaesh and its People in Prehistory". *IBS Journal*, Vol. II.

Risley, Sir, H.H. (1891), *The Tribes and Castes of Bengal*. Calcutta,

Troisi, J, (ed.). (1979) *The Satals: Governemnt and Other Reports*. New Delhi: Indian Social Insititute.

আলী, মেহরাব (১৯৮০), *দিনাজপুরের আদিবাসী*। দিনাজপুর: আদিবাসী সংস্কৃতি একাডেমী।

কাদির, আব্দুল (১৯৯৬), *পাকিস্তানের সাঁওতাল সম্প্রদায়*। ঢাকা।

মল্লিক, সমর কুমার (১৯৮৮), *উনবিংশ শতকে সাঁওতাল আদিবাসী আন্দোলনের স্বরূপ, ইতিহাস অনুসন্ধান*। কলিকাতা: ৩-কে-পি, বাগচী এ্যান্ড কোং।

সাত্তার, আব্দুল (১৯৬৬), *অরণ্য জনপদে*। ঢাকা।

### সাক্ষাৎকার

শিনু মোড়ল (৬০), তার নিকট থেকে টুরি জাতি গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায়।

শ্যামল মোড় (৪০), তিনি তাদের বার্ষিক উৎসবাদি সম্পর্কে তথ্য দেন।

হিপরা (৫০), তিনি টুরিদের বিবাহ সম্পর্কে তথ্য দেন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# কৃষি ভর্তুকি এবং আখচাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব : একটি সমীক্ষণ

শর্মিষ্ঠা রায়*

**Abstract :** The present study was conducted to explore the impact of subsidy for the sugarcane growers, to assess the excess production of sugar and to know the farmers' attitude about the subsidy given. Primary data were collected from slected sugarcane growers from five sub-zones of Rajshahi Sugar Mills and secondary data were collected from the records of Rajshahi Sugar Mills and Bangladesh Sugarcane Research Institute. It was found from the analysis that due to subsidy, average rate of sugarcane production has been increased about 10 ton per acre.

## ভূমিকা

বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের জীবন, জীবিকা কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। তার মধ্যে ইক্ষু থেকে আসে ১৫০০-১৭০০ কোটি টাকা। কৃষি শিল্প ভিত্তিক ফসলের মধ্যে ইক্ষু কৃষি অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এদেশের উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে ইক্ষু চাষের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দেশে প্রায় ১.৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় এবং ২০ লক্ষ চাষিপরিবার ইক্ষু চাষের উপর নির্ভরশীল (পাল, রহমান ও চৌধুরী, ২০০৫)। কিন্তু এই সমস্ত কৃষক পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। কারণ ইক্ষুর উৎপাদন খরচ অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য অপেক্ষা অনেক বেশি। এটি দীর্ঘমেয়াদি (১২-১৮ মাস) একটি ফসল। ইক্ষুর উৎপাদন ব্যয় হেক্টর প্রতি প্রায় ৫০,০০০ টাকা, যা এদেশের দরিদ্র চাষিদের পক্ষে নির্বাহ করা সম্ভব নয়। ইক্ষু চাষে বীজ বাবদ ১১.৪৪%, রাসায়নিক সার বাবদ ১০.৫৮%, কীটনাশক বাবদ ৩.৪০% এবং বীজ পরিবহন বাবদ ৮.৭৯% খরচ হয়ে থাকে (আলম ও পাল, ২০০৬)। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ইক্ষু চাষিরা এসব ব্যয়বহুল উপকরণ সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে না পারায়

---

* ড. শর্মিষ্ঠা রায়, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইক্ষুর ফলন দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং এর আবাদ অলাভজনক হয়ে পড়ছে। ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ চিনি ও গুড়ের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

কৃষিভিত্তিক পণ্যের মধ্যে ধান থেকে যথেষ্ট সফলতা এলেও আমাদের দেশে পুষ্টি সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। পুষ্টির অন্যতম উৎস হচ্ছে ইক্ষু হতে উৎপাদিত চিনি ও গুড়। তাই দেশের অন্যতম এই কৃষিপণ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এদিকে নজর দিতে হবে বেশি। কৃষকেরা যাতে জমিতে উন্নত প্রযুক্তি, সার, সেচ, বীজ ব্যবহার করতে পারে সেজন্য কৃষি উপকরণগুলো সহজলভ্য করতে হবে। সাম্প্রতিকালে সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা ইক্ষু হতে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রতি নজর দিচ্ছেন এবং ইক্ষু চাষিদের ভাগ্যোন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। ২০০১-০২ অর্থ বছরে কৃষি খাতে ১০০ কোটি, ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ২০০ কোটি, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৩০০ কোটি, ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ৬০০ কোটি, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ১১০০ কোটি এবং ২০০৬-০৭-এর প্রস্তাবিত বাজেটে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই কৃষিতে কম বেশি ভর্তুকি প্রদান করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলো যথাক্রমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত এবং থাইল্যান্ড কৃষি এবং এগ্রো-প্রসেসিং শিল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। ইইউ-তে কৃষি এবং এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প খাতে প্লান্টার-মিলারদের উৎপাদন খরচের শতকরা ৬৭ ভাগ ভর্তুকি দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই হার শতকরা ৫০ ভাগের উপরে। উন্নয়নশীল দেশগুলো WTO-এর Rules of Business অনুযায়ী জিডিপি-এর শতকরা ১০ ভাগ কৃষিতে ভর্তুকি হিসেবে অর্থ সহায়তা অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা পেয়েছে। এছাড়া ভারত প্রতি বছর ৬০ হাজার কোটি রুপি কৃষিখাতে ভর্তুকি সহায়তা প্রদান করে থাকে। তাই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও প্রতি বছর কৃষিতে অব্যাহত ভর্তুকি সহায়তা প্রদানের কর্মসূচি সরকার হাতে নিয়েছেন। সরকারের এই ভর্তুকি সহায়তা বাংলাদেশের আখ চাষিদের ভাগ্যেন্নয়নে তথা চিনি শিল্পের উন্নয়নে কতটা প্রভাব ফেলছে তা জানার উদ্দেশ্যে এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

১) আখ চাষিদের আর্থিক অবস্থার ওপর কৃষি ভর্তুকির প্রভাব;
২) ভর্তুকি প্রদানের ফলে চিনিকলের অতিরিক্ত উৎপাদন নিরূপণ; এবং
৩) ভর্তুকি প্রদান সম্পর্কে কৃষকদের মতামত যাচাই।

## গবেষণা এলাকা ও পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি পরিচালনার জন্য রাজশাহী চিনিকল এলাকা নির্বাচন করা হয় এবং চিনিকল এলাকার ৫টি সাব-জোনের ৫২ জন ইক্ষুচাষিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়। ইক্ষুচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর ভর্তুকির প্রভাব ও তাদের মতামত যাচাই করার জন্য প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতেই তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

ক) *কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন* : প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, নির্বাচিত ১০০% ইক্ষু চাষিরই ভর্তুকি প্রদানের ফলে ইক্ষুর ফলন বেড়েছে একর প্রতি প্রায় ১০ টন।

উত্তরদাতা ৫২ জনের ইক্ষু চাষির মোট জমির পরিমাণ ছিল ৬৩১.৪৩ একর। তবে বিভিন্ন শর্ত পালন সাপেক্ষে ভর্তুকির টাকা প্রদান করায় উক্ত ইক্ষুচাষিগণ মাত্র ৭৯.৮০ একর জমিতে ইক্ষু চাষের জন্য ভর্তুকির সুবিধা পেয়েছিলেন । উত্তদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সাধারণ আখচাষের চেষে ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্ত জমির অতিরিক্ত ফলন ছিল একর প্রতি গড়ে প্রায় ১০ টন। সে হিসেবে মোট ভর্তুকি প্রদত্ত ৭৯.৮০ একর জমি থেকে অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদিত হয়েছে (৭৯.৮০×১০) = ৭৯৮ টন। প্রতি টন ইক্ষুর বাজার মূল্য ১৩০০ টাকা হিসেবে অতিরিক্ত ৭৯৮ টনের মূল্য (৭৯৮ টন × ১৩০০ টাকা) = ১০,৩৭,৪০০/- টাকা। অধিকন্তু তারা একর প্রতি গড়ে প্রায় ৩০০০ টাকা করে ভর্তুকি পেয়েছে। যার মোট পরিমাণ ছিল (৭৯.৮০ ×৩০০০ টাকা ) = ২,৩৯,৪০০ টাকা। অর্থাৎ নির্বাচিত ইক্ষুচাষিদের মধ্যে অতিরিক্ত টাকার সঞ্চালন হয়েছিল মোট ১২,৭৬,৮০০ টাকা। উক্ত টাকা অতিরিক্ত হিসেবে চাষিদের হাতে এসেছে, যার প্রভাব পড়েছে চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার ওপর। ঐ টাকায় একদিকে যেমন কৃষি উপকরণের বাজারে কেনাবেচা বৃদ্ধি করে গ্রামীণ ব্যবসাকে সচল ও গতিশীল করেছে অন্যদিকে তেমনি ইক্ষু থেকে পাওয়া অতিরিক্ত টাকাও বাজারে ইক্ষুচাষিদের ব্যবসা ও কারবারের উন্নতি সাধন করায় গোটা এলাকার ইক্ষু চাষিদের আর্থিক অবস্থার একটি ভাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছ (সারণি ১)।

**সারণি ১ : ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্তির ফলে ইক্ষুচাষিদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন**

| অর্থের উৎস | উত্তরদাতা কৃষকের সংখ্যা | ইক্ষু চাষের মোট জমির পরিমাণ (একর) | ভর্তুকি প্রাপ্ত জমির পরিমাণ (একর) | প্রাপ্ত ভর্তুকির টাকা (৩০০০ ট্রাক/একর হিসেবে) | অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদন (টন) | অতিরিক্ত মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদন থেকে | ৫২ | ৬৩১.৪৩ | ৭৯.৮০ | | ৭৯৮ | ১০,৩৭,৪০০/- |
| ভর্তুকি থেকে | ৫২ | ৬৩.৪১ | ৭৯.৮০ | ২,৩৯,৪০০/- | | ৭৯.৮০×৩০০০)<br>২,৩৯,৪০০/- |

মোট অতিরিক্ত টাকা = ১২,৭৬,৮০০/=

* সাধারণ জমিতে ইক্ষুর ফলন ২৪ টন/একর

** ভর্তুকি প্রাপ্ত জমিতে ইক্ষুর ফলন ৩৪ টন/একর

## ভর্তুকি প্রদানের ফলে রাজশাহী চিনিকলের সামগ্রিক লাভ

রাজশাহী চিনিকল এলাকায় ভর্তুকি সুবিধা পাওয়ায় ইক্ষুচাষিগণ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। একারণেই তাদের জমিতে ইক্ষুর ফলন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সারণি ২-এ তার বিবরণ দেওয়া হলো।

### সারণি ২ : ভর্তুকি প্রদানের ফলে রাজশাহী চিনিকলের সামগ্রিক লাভ

| | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | গড় |
|---|---|---|---|---|
| ভর্তুকি সুবিধাপ্রাপ্ত জমিতে ইক্ষুর ফলন (টন/একর) | ২৮.০২ | ২৯.৩৫ | ২৬.১১ | ২৭.৮৩ |
| ভর্তুকিবিহীন জমিতে ইক্ষুর ফলন (টন/একর) | ২০.১৫ | ২১.৫৯ | ২০.৪৮ | ২০.৭৪ |
| অতিরিক্ত ফলন (টন/একর) | ৭.৮৭ | ৭.৭৬ | ৫.৬৩ | ৭.০৯ |
| ভর্তুকিপ্রদানকৃত জমির পরিমাণ (একর) | ১৩২.৭৮ | ৫৯৯.৯৯ | ১৫৪১.১৩ | ৭৫৭.৯৭ |
| মোট অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদন (টন) | ১০৪৪.৯৮ | ৪৬৫৫.৯২ | ৮৬৭৬.৫৬ | ৪৭৯২.৪৯ |
| অতিরিক্ত ইক্ষুর মূল্য (টাকা) | ১৩,৫৮,৪৭৪ | ৬০,৫২,৬৯৬ | ১,১২,৭৯,৫২৮ | ৬২৩০২৩২.৬৭ |
| অতিরিক্ত ইক্ষু থেকে অতিরিক্ত চিনি উৎপাদন (চিনি আহরণ হার ৭% ধরে) (টন) | ৭৩.১৫ | ৩২৫.৯১ | ৬০৭.৩৬ | ৩৩৫.৪৭ |
| উৎপাদিত অতিরিক্ত চিনির বাজারমূল্য (টাকা) | ২১,৯৪,৫০০ | ৯৭,৭৭,৩০০ | ১,৮২,২০,৮০০ | ১,০০৬৪,২০০ |
| ভর্তুকি প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা) | ২,৩১,০৩৭.২ | ১০,৩৯,২৬৩ | ৪০,২৭,৯০০ | ১৭,৬৬,০৬৬.৭৩ |
| মোট জাতীয় লাভ (টাকা) | ১৯,৬৩,৪৬২.৮ | ৮৭,৩৮০,০৩৭ | ১,৪১,৯২,৯০০ | ৮২৯৮১৩৩.২৭ |

উৎস : রাজশাহী চিনিকল।

সারণি ২-এ উল্লিখিত ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ সালের গড় হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় যে, উক্ত তিন বছরে গড়ে ১৭,৬৬,০৬৬.০০ টাকা বিতরণের মাধ্যমে প্রতিবছর গড়ে ১,০০,৬৪,২০০ টাকার অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হয়েছে। এই হিসেবে উক্ত তিন বৎসরে গড়ে প্রতি বছর ৮২,৯৮,১৩৩ টাকা জাতীয় লাভ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর কারণ ভর্তুকি প্রদানের ফলে তিন বছরে একর প্রতি গড়ে ৭.০৯ টন অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদিত হয়েছে। গড়ে ৭৫৭.৯৭ একর জমিতে উক্ত ৭.০৯ টন অতিরিক্ত ফলন হিসেবে মোট অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদিত হয়েছে ৪৭৯২.৪৯ টন। টন প্রতি ১৩০০ টাকা হিসেবে অতিরিক্ত ইক্ষুর বাজার মূল্য দাঁড়ায় ৬২,৩০,২৩২ টাকা। যেহেতু ভর্তুকি প্রদানকৃত জমির সম্পূর্ণ ইক্ষুই চিনিকলে সরবরাহ করা হয়েছে। অতএব, চিনিকলের গড় চিনি আহরণ হার (৭%) হিসেবে উক্ত অতিরিক্ত ৪৭৯২.৪৯ টন ইক্ষু থেকে অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হয়েছে ৩৩৫.৪৭ টন। বর্তমান বাজার মূল্যে (৩০,০০০ টাকা/টন) অতিরিক্ত ৩৩৫.৪৭ টন চিনির মূল্য ১,০০,৬৪,২০০ টাকা । এখানে উল্লেখ্য যে, ভর্তুকি প্রদানের হার প্রথম বছর ১৩২.৭৮ একর থেকে ২য় বছর ৫৯৯.৯৯ একরে এবং ৩য় বছর ১৪৪১.১৩ একরে উন্নীত করা হয়। ভর্তুকি প্রদানের এই বর্ধিষ্ণু হার নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। সে কারণেই প্রথম বছরে মোট জাতীয় লাভ ১৯,৬৩,৪৬২ টাকা হলেও ২য় ও ৩য় বছরে তা বেড়ে যথাক্রমে ৮৭,৩৮,০৩৭ এবং ১,৪১,৯২,৯০০ টাকাতে উন্নীত হয়। অতএব স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, ভর্তুকি প্রদানের ফলে রাজশাহী চিনিকল সামগ্রীকভাবে লাভবান হয়েছে।

## সুবিধাভোগী কৃষকদের মতামত

এই গবেষণায় ভর্তুকি প্রদানের বিষয়ে কৃষকদের মতামত যাচাই করা হয়। সারণী- ৩ এ তার বর্ণনা দেয়া হলো:

সারণি ৩ : ইক্ষু চাষে ভর্তুকি প্রদানের বিষয়ে কৃষকদের মতামত

| বিষয় | কৃষকদের মতামত | | |
|---|---|---|---|
| | সম্পূর্ণ একমত | মতামত নেই | সম্পূর্ণ ভিন্নমত |
| ১। একর প্রতি বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ বাড়ানো উচিত | ৫২ (১০০%) | - | - |
| ২। ভর্তুকির টাকা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যেই বিতরণ করা উচিত | ৪৪ (৮৪.৬২%) | ৮ (১৫.৩৮) | - |
| ৩। ভর্তুকি টাকা বিতরণে অনিয়ম লক্ষণীয় | - | ২ (০৩.৮৫%) | ৫০ (৯৬.১৫%) |
| ৪। প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখা উচিত | ৪৯ (৯৪.২৩%) | ৩ (০৫.৭৭%) | - |
| ৫। ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা উচিত | ৪৮ (৯২.৩১%) | ৩(০৫.৭৭%) | ১ (০১.৯২%) |

সারণি ৩ থেকে লক্ষ করা যায় শতকরা ১০০ জন উত্তরদাতাই ভর্তুকির টাকা বৃদ্ধি করার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

শতকরা ৮৪.৬২ ভাগ উত্তরদাতা জানান যে, ভর্তুকির টাকা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যেই প্রদান করা উচিত। এতে করে তারা উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু রোপণকালীন সময়ের প্রয়োজনীয় খরচাদি সংকুলান করতে পাওে, ফলে তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হয়। প্রায় সকল উত্তরদাতাই (৯৬.১৫ শতাংশ) জানিয়েছেন যে, ভর্তুকির টাকা বিতরণে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য ভর্তুকির টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে চিনিকল কর্তৃপক্ষের বিভন্ন ধরনের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া থাকায় ভর্তুকির টাকা সুষ্ঠুভাবে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। ভর্তুকি বিতরণের এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখা প্রসঙ্গে বেশিরভাগ ইক্ষুচাষিই (৯৪.২৩ শতাংশ) পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। অন্যদিকে শতকরা ৯২.৪১ শতাংশ ইক্ষুচাষি ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করা উচিত বলে মনে করেছেন।

## উপসংহার ও সুপারিশ

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বেশির ভাগ জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল সেখানে কৃষি খাতকে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে প্রাধান্য দিতে হবে বেশি। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে অর্থকরী এবং পুষ্টিকর ফসল হিসেবে ইক্ষুর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্ত

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন মূলধনের অভাব, সময়মত সার, বীজ, বা কীটনাশকের সরবরাহ না থাকা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ আমরা যদি একটু সচেতন ও যত্নবান হই তাহলে দেশের অন্যান্য খাতের মত জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ইক্ষুও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এর জন্য প্রয়োজন সময়মত ইক্ষুচাষিদের হাতে উন্নত বীজ, সার ও উপকরণ সরবরাহ এবং সরকারের ভর্তুকি সহায়তাকে আরো বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত করা।

শিল্পোন্নত দেশগুলো নিজেদের কৃষিতে ভর্তুকি অব্যাহত রেখে অনুন্নত দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকি কর্মসূচীতে প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের কৃষিপণ্যের বাজার ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এই অবস্থার নিরসন প্রয়োজন। এই কারণে সর্বশেষ হংকং সম্মেলনে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (WTO)-এর উদ্যোগে উন্নত দেশগুলো ২০১৩ সালের মধ্যে কৃষিতে ভর্তুকি ক্রমাগতভাবে হ্রাস করে কৃষি ভর্তুকি বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো ভর্তুকি সহায়তা অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা পেয়েছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কৃষি ভর্তুকি কার্যক্রমকে কৃষি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে যাতে করে শুধু কৃষকদের ভাগোন্নয়নই নয় দেশের চিনি ও গুড় শিল্প যেমন লাভজনক হবে, তেমনি চিনি আমাদানি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হবে।

## প্রমাণপঞ্জি

আলম, মোঃ মাহমুদুল ও সমজিৎ কুমার পাল (২০০৬) "ইক্ষু প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ভর্তূকী/অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের অবদান" *ইক্ষু চাষে ভর্তুকি প্রদান কার্যক্রম এর "লাঞ্চিং এবং মনিটরিং" ওয়ার্কশপ*, ২২-২৩ জুন, ২০০৬-এ উপস্থাপিত প্রতিবেদন। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

পাল, সমর্জিৎ কুমার ; মু. খলিলুর রহমান ও এটিএম সালেহ উদ্দিন চৌধুরী (২০০৫) *ইক্ষুচাষের উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল*, ঈশ্বরদী, পাবনা, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

**ISSN 1561-798X**
**আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫**

# স্বাধীন সুলতানী আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮) বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা

মোহাম্মাদ নাজিমুল হক*

**Abstract:** Administration in Bengal never remained the same always. Every new conquest was followed by new mode of administration. In the Hindu-Buddhist, period the administrative system developed, which under the Muslim rulers underwent changes in name and structure. In medieval period saw the outcome of the development of administrative institutions of the earlier period. The uniqueness of medieval administration lies in the fact that despite frequent changes in dynasties, it bore the main characteristics of several centuries old institutions which the Turko-Afghans carried with them to India. After the inception of the Muslim **principality** in Bengal by Ikhtiyaruddin Muhammad Bakhtiyar Khalji in early 13th century, it was ruled as a province of the Delhi Sultanate till an independent Sultanate was established over the major parts of Bengal in 1338. Gaur or Lakhnauti, the capital, followed the broad principles of the Delhi Sultanate and the administrative system was a copy of the House of Iltutmish–a hierarchy of decentralised minor sovereignties bearing a feudal character. However, some improvements were made under the Iliyas Shahi (1342-1415 and 1442-1487) and the Husain Shahi (1494-1538) rulers.

## ভূমিকা

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন সুলতানাত প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বাংলা কখনো স্বাধীন আবার কখনো দিল্লীর অধীনস্থ প্রদেশ ছিল। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা দুশো বছর স্বাধীন ছিল এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কর্তৃক গৌড় দখলের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থা শুধু সুষ্ঠু ও সুসংহতই ছিল না, বরং হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। তাই এ যুগেই বাংলায় মুসলিম শাসন বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল। যেহেতু স্বাধীন সুলতানগণ স্থানীয় সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন, ফলে স্বাধীন সুলতানগণের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের সক্রিয়

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অংশগ্রহণ ছিল। এই মুসলিম শাসনের মোট সময়কালের মধ্যে স্বাধীন সুলতানী আমল মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কেননা এই আমলেই বাংলা ভূখণ্ড সর্ব প্রথম কোনো সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। বাংলার এই স্বাধীনতা ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কাজেই এই আমলের শাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের দাবিদার।

## বাংলার সীমানা

মোটামুটি ভাবে ১৯৪৭-এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতেব 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূখণ্ডই আলোচিত বাংলাকে চিহ্নিত করে। প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপালের তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চ ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[1]

## স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থা

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট—**প্রথমত,** বাংলার মুসলিম রাজ্যের পূর্ব নাম লখ্নৌতির স্থলে 'বাংলা' নাম প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ এই যুগে মুসলিম রাজ্য সমগ্র বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করে। ইলিয়াস শাহ্ই সর্ব প্রথম বাংলাকে একীভূত ও একক শাসনাধীনে আনেন এবং তিনি 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ্-ই-বাঙ্গালীয়ান' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা'রূপে অভিহিত হতে থাকেন। দীর্ঘ দুই শতাধিক বছবকাল এই শাসন টিকে থাকার কারণে বাংলায় মুসলিম শাসন বিকাশ লাভ করেছিল। **দ্বিতীয়ত,** যেহেতু স্বাধীন সুলতানগণ স্থানীয় সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন, সেহেতু স্বাধীন সুলতানগণের শাসনামলে স্থানীয় জনগণের শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল। **তৃতীয়ত,** চতুর্দশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতে মুসলিম রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী ও বিধাতাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা ইসলামের বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্বাধীন সুলতানগণের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উৎস ছিল তাদের সামরিক শক্তি। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বহিরাগত বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি আক্রমণের ফলে বাংলার সুলতানী শাসন ব্যবস্থার মূল প্রকৃতি সামরিক হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। **চতুর্থত,** এই শাসনামলে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট আইন-কানুন না থাকায় সুলতানের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের মধ্যে কোনো প্রকার গণতন্ত্রায়ণ ছিল না বলে অনেকের ধারণা। সামন্ততান্ত্রিকতা ছিল সুলতানী

---

[1] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১।

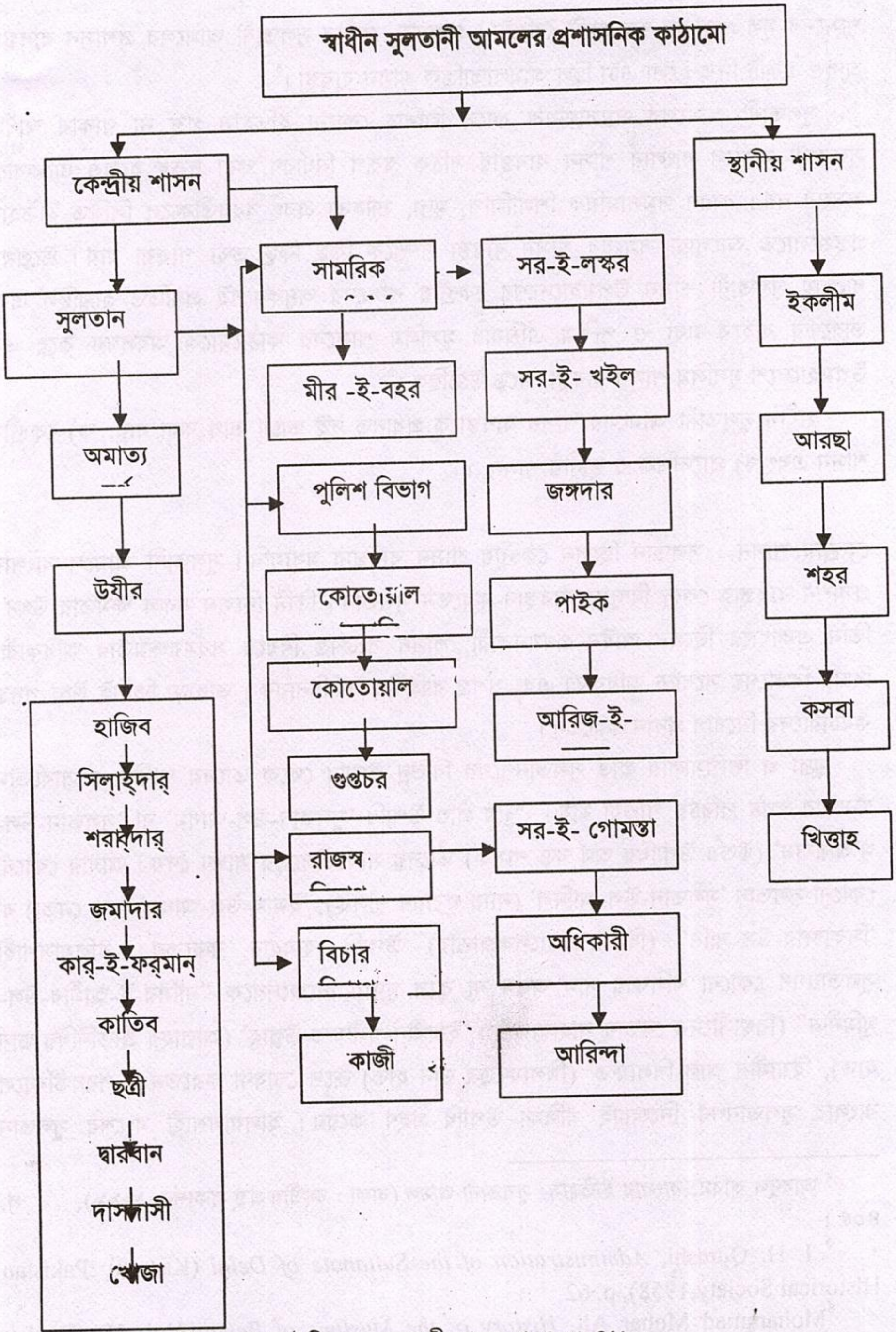
স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসনিক কাঠামো
কেন্দ্রীয় শাসন
সুলতান
অমাত্য
উযীর
হাজিব
সিলাহ্দার
শরাবদার
জমাদার
কার্-ই-ফরমান্
কাতিব
ছত্রী
দ্বারবান
দাসদাসী
খোজা
সামরিক
মীর -ই-বহর
পুলিশ বিভাগ
কোতোয়াল
কোতোয়াল
গুপ্তচর
রাজস্ব
বিচার
কাজী
সর-ই-লস্কর
সর-ই- খইল
জঙ্গদার
পাইক
আরিজ-ই-
সর-ই- গোমস্তা
অধিকারী
আরিন্দা
স্থানীয় শাসন
ইকলীম
আরছা
শহর
কসবা
খিত্তাহ

উৎস: আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল*, পৃ. ৪০৫-৪১৮।

শাসনের মূল প্রকৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য। **পঞ্চমত,** স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার আরও একটি দিক হলো এটা ছিল আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।[২]

সুলতানী আমলের সমসাময়িক কালে লিখিত কোনো ইতিহাস গ্রন্থ না থাকায় স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থার সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করা দুরূহ হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ সমসাময়িক শিলালিপি, মুদ্রা, সাহিত্য এবং পরবর্তীকালে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে আলোচ্য সময়ের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বাংলায় সুলতানী শাসন উপমহাদেশের কেন্দ্রীয় শাসনের অনুকরণেই প্রবর্তিত হয়েছিল এবং ভারতের বাইরে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম শাসনের কাঠামোকে অবলম্বন করে এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[৩]

স্বাধীন সুলতানী আমলের শাসন ব্যবস্থাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ক) কেন্দ্রীয় শাসন এবং খ) প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন।

**কেন্দ্রীয় শাসন :** সুলতান ছিলেন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যমনি। সুলতানী আমলে বাংলার প্রসাশন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করতেন সুলতান। তিনি ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি একাধারে ছিলেন আইন প্রণয়নকারী, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী, বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ অধিকর্তা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তাছাড়া তিনিই উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করতেন।

মুদ্রা ও লিপিমালায় প্রাপ্ত সুলতানগণের বিভিন্ন উপাধি থেকে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মুদ্রায় প্রাপ্ত উপাধি 'সুলতান-উল-আযম' বা 'সুলতান-উল-মু'আয়যাম' (উভয় উপাধির অর্থ বড় শাসক) তাঁদের সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্য দেয়। আবার কোনো কোনো সুলতান 'সুলতান-উল-আদিল' (ন্যায় পরায়ণ শাসক), 'ইমাম-উল-আযম' (বড় নেতা) বা 'সিকান্দার-উস-সানি' (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার) উপাধি ব্যবহার করতেন। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ কোনো খলিফার নাম অঙ্কন না করে মুদ্রায় নিজেদেরকে "নাসির-ই-আমীর-উল-মুমিনীন" (বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী) 'ইয়ামীন-খলীফত্-উল্লাহ্' (আল্লাহ্র প্রতিনিধির ডান হাত), 'ইয়ামীন আল্-খিলাফত্' (খিলাফতের ডান হাত) রূপে ঘোষণা করতেন।[৪] পরবর্তীকালে বাংলার সুলতানগণ নিজেরাই খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। ইলিয়াসশাহী বংশের সুলতান

---

[২] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৪০৫।

[৩] I. H. Qureshi, *Administration of the Sultanate of Delhi* (Karachi :Pakistan Historical Society,1958), p. 62.

[৪] Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. 1B (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2003), pp. 688-89.

সিকান্দর শাহ সর্ব প্রথম ইমাম বা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ (রাজা গণেশের পুত্র) সর্ব প্রথম 'খলিফাতুল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজেকে 'নাসির- উল্-ইসলাম ওয়াল মুস্লিমীন' বা 'গাউস-উল্-ইসলাম ওয়াল মুস্লিমীন' (উভয় উপাধির অর্থ ইসলাম ও মুসলনমাদের সাহায্যকারী) বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ইলিয়াসশাহী বংশের সুলতানেরা 'খলিফাতুল্লাহ্ বিল্ হুজ্জতে ওয়াল রুর্হান্' উপাধি গ্রহণ করেন। হুসেনশাহী বংশের সুলতানদের শিলালিপিতে এই উপাধির ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু মুদ্রায় তারা ইসলামের প্রথম চার খলিফার নাম অঙ্কিত করেন। এসব উপাধির ব্যবহার এ কথাই প্রমাণ করে যে, সুলতানগণ মুসলমানদের নিকট নিজেদেরকে ইসলামের ধারক ও বাহকরূপে প্রতিপন্ন করতে আগ্রহী ছিলেন।[৫] যাহোক, এসব উপাধিতে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেলেও তা যে নেহায়েত বাহ্যিক ও মৌখিক প্রকাশ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ আইন প্রণয়ণ করতেন।[৬]

**অমাত্যবর্গ :** স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন ব্যবস্থায় যে সব উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তাঁদেও মধ্যে সুলতানের অমাত্য ও সভাসদবর্গ এবং অন্যান্য অভিজাত রাজপুরুষগণ অন্যতম। এঁদেরকে সাধারণত 'আমীর' বা 'মালিক' অভিধায় ভূষিত করা হতো। তাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন এবং প্রয়োজনে দরবারেও উপস্থিত থাকতেন। তারা সুলতানদের পরামর্শ দিতেন। অমাত্যবর্গ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন।[৭] কখনো কখনো ক্ষমতাশালী এবং উচ্চাভিলাষী অমাত্য স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভাতুরিয়া পরগনার প্রভাবশালী জমিদার রাজা গণেশ সুলতান আযম শাহের শাসনামলে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বায়েজীদকে হত্যা করে ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।[৮]

অমাত্যবর্গ রাজ্যের বহিরাক্রমণ বা স্থানীয় গোলযোগের সময়ে তাঁরা আক্রমণ প্রতিরোধ বা শান্তি স্থাপনে নিয়োজিত থাকতেন। সুলতান নির্বাচনের ব্যাপারেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতেন। মুসলমানদের মধ্যে রাজতান্ত্রিক কোনো উত্তরাধিকার আইন ছিল না, সে কারণে কোনো

---

[৫] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস - সুলতানী আমল*, পৃ. ৪০৬।

[৬] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১০ম সংস্করণ (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৩), পৃ. ২৩৩।

[৭] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস ১২০৪- ১৫৭৬* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০০), পৃ. ৬০০।

[৮] Abdul Karim, "Aspects of Muslim Administration in Bengal down to A.D 1538." *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Vol.111, Dhaka, p. 58.

সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর একাধিক পুত্র-সন্তান থাকলে তাঁদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিতো। এমতাবস্থায় অমাত্য বা আমীর ও মালিকগণের নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিতো। অমাত্যগণের নির্বাচনের বিরুদ্ধে কেউ সিংহাসন অধিকারের সাহস করতো না, কারণ অমাত্যবর্গই ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। সুতরাং তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া শাসন করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অবশ্য অমাত্যগণ সাধারণত পরলোকগত সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সিংহাসনে বসাতেন। স্বাধীন সুলতানী যুগে শুধু একবারই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর অমাত্যগণ প্রথমে তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পরে সিকান্দর শাহ অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে অমাত্যগণ ঐ বংশেরই অন্য এক যুবরাজ জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ্‌কে সিংহাসনে বসান।[৯]

**উজির** : স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন ব্যবস্থায় উজির বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতানের পরেই ছিল তাঁর স্থান। তিনি ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকল বিভাগের উপর উজির কর্তৃত্ব করতেন, উজির বেসামরিক প্রশাসন ছাড়াও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। অনেক সময়ে সুলতান দুর্বল হলে বা সুলতান রাজধানীর বাইরে গেলে উজিরই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।[১০] বাংলাদেশের সুলতানী আমলে এইরূপ কয়েকজন উজিরের নাম পাওয়া যায় যেমন: সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সময়ে আজম খান, রাজা গণেশ; জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের সময়ে খান জাহান, মাহমুদ শাহের সময়ে হাবশ খান এবং শাম্‌স্‌ উদ্দীন মুজাফফর শাহের সময়ে হোসেন মক্কী। এভাবে দেখা যায় যে, উজিরগণ মাঝে মাঝে সুলতানদের জন্য বিপজ্জনক ছিলেন, কারণ সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বা নিজেদের উচ্চাশা পূরণ করার জন্য তাঁরা নিজেদের স্বার্থে কাজ করতেন এবং পরে নিজেই সিংহাসন অধিকার করতেন। রাজা গণেশ এবং হোসেন মক্কী এভাবেই সিংহাসন অধিকার করেন। সেখানে শিলালিপিতে উজির সম্পর্কে অন্যরূপ তথ্যও পাওয়া যায়। শিলালিপিতে উজিরকে 'ইক্‌লীম্‌ আরছা' বা শহরের শাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়। আবার একই লোককে উজির পদবীর সঙ্গে সঙ্গে 'সর-ই-লস্কর' (সৈনাধ্যক্ষ) 'কতোয়াল' (নগরাধ্যক্ষ) এবং 'শরাবদার-ই-গায়র মুহল্লী' (অসাধারণ পানীয় অধ্যক্ষ) রূপেও অভিহিত করা হয়েছে।[১১] সুতরাং মনে করা হয় যে, স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার উজিরগণের নানা রকম

---

[৯] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, পৃ. ২৩৪।

[১০] Abdul Karim, "Aspects of Muslim administration in Bengal down to A.D 1538." *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Vol.111, Dhaka, p. 59.

[১১] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল*, পৃ. ৪১০।

কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল এবং একই লোক উজির, সর-ই-লস্কর ইত্যাদি কয়েকটি দপ্তরের দায়িত্ব পালন করতেন।

সুলতানগণের প্রধানমন্ত্রীদের অন্তত কেউ কেউ 'খান-ই-জাহান' উপাধি লাভ করতেন। প্রধান আমীরকে বলা হতো 'আমীর-উল-উমারা'। সুলতানের মন্ত্রী, অমাত্য ও পদস্থ কর্মচারীগণ 'খান মজলিস্', 'মজ্লিস-ই-আলা', 'মজলিস-ই-আযম', মজলিস-ই-মুয়ায্যম, 'মজলিস-আল-মজলিস', 'মজলিস-বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করতেন। বাংলা সাহিত্যে উজিরের পদমর্যাদা সম্পন্ন আরও দুটি পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায়—'দবীর-ই-খাস' এবং 'সাকের মল্লিক'। 'দবীর-ই-খাস' ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব, যিনি চিঠিপত্র বিভাগের প্রধান ছিলেন। আলাউদ্দীন হুসেন শাহের 'দবীর-ই-খাস' ছিলেন রূপ এবং সনাতন ছিলেন 'সাকের মল্লিক'। শেষোক্ত পদবীর সঠিক অর্থ অনুধাবন করা যায় না। তবে চৈতন্যচরিতামৃত-এ সনাতন সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, তিনি আলাউদ্দীন হুসেন শাহের প্রধান সচিব ছিলেন।[১২]

**অন্যান্য রাজকর্মচারী :** স্বাধীন সুলতানী আমলে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমীর, উজির প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়াও সুলতান বিভিন্ন ধরনের রাজ-কর্মচারী নিয়োগ করতেন। সমসাময়িক সূত্রে কতকগুলো পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পদবীদৃষ্টে মনে হয় এরা দরবারেই নিযুক্ত থাকতেন। এগুলো হচ্ছে: হাজিব, সিলাহ্দার, শরাব্দার, জমাদার এবং দ্বারবান। সমসাময়িককালের শাসন ব্যবস্থায় **হাজিব** ছিলেন অনুষ্ঠানের কর্তা; তিনি উচ্চপদস্থ অফিসার ও অমাত্যগণকে তাঁদের নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী সুলতানের সম্মুখে পরিচয় করে দিতেন। চীনা বিবরণে দেখা যায় যে, চীনা দূতেরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুলতানের দরবারে সম্বর্ধিত হতেন। এই অনুষ্ঠান হাজিবই পরিচালনা করতেন। 'সিলাহ্দার' শব্দের অর্থ বর্মরক্ষক, সিলাহদার ছিলেন সুলতানের বর্মরক্ষক। যুদ্ধের সময়ে বা শিকারের সময়ে সিলাহ্দার সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।[১৩] ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্ সোনারগাঁও-এর গর্ভনর বাহরাম খানের সিলাহ্দার ছিলেন।

'শরাব্দার' সুলতানের পানীয়-এর ব্যবস্থা করতেন। এই পানীয় মদ বা শুধু পানি বা শর্বত হতে পারে। চীনা সূত্রে প্রকাশ যে, বাংলার সুলতানগণ মদ্য পান করতেন না, কিন্তু তাঁরা মিষ্টি শর্বত পান করতেন। 'জমাদার' সুলতানের পোশাকের তত্ত্বাবধান করতেন এবং 'দ্বারবান' রাজ-প্রাসাদের ফটকে পাহারা দিতেন।[১৪]

---

[১২] রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), ৫ম সংস্করণ (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড প্রাঃ লিঃ, ২০০৫), পৃ. ৭৫।

[১৩] তদেব, পৃ. ৪০৯।

[১৪] I.H.Qureshi, *Administration of the Sultanate of Delhi*, p. 56.

এছাড়া সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে 'ছত্রী' নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে সুলতানের মাথার ওপর ছত্র ধারণ করতো, না হয় সুলতানের দেহরক্ষী ছিল। মালাধর বসু (গুনরাজ খান), কেশব বসু (কেশব খান) প্রমুখ কর্মচারীগণ বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। সুলতানের চিকিৎসক ছিলেন সাধারণত বৈদ্য বা কবিরাজ। তাঁদের উপাধি হতো 'অন্তরঙ্গ'। কয়েকজন সুলতানের হিন্দু সভাপণ্ডিতও ছিল। সুলতানের প্রাসাদে অনেক ক্রীতদাস থাকতো।

সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। বিভাগটি দবীর-ই-খাস (একান্ত সচিব)- এর অধীনে ন্যস্ত থাকতো। তিনি কর্মকর্তা কর্মচারী, করদরাজ্য এবং বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সুলতানের বার্তা বিনিময় ও খবরাখবর আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করতেন। এ বিভাগে অনেক দবীর (সচিব) ছিলেন। যেমনঃ 'কার্-ই- ফর্মান্' ছিলেন বিভিন্ন ফরমান জারি করার দায়িত্বে। 'দবীর' ছিলেন চিঠি-পত্র বিভাগের প্রধান। তাছাড়া 'কাতিব' ছিলেন পত্রলেখক।[১৫]

'কোতোয়াল বক়ালি' ছিলেন দিউয়ান-ই-কতোয়ালী বা পুলিশ বিভাগের প্রধান। তাঁর অধীনে অনেক কতোয়াল ছিল। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল তাঁদের দায়িত্ব। তাঁরা শহরের আগন্তকদের গতিবিধির উপর নজর রাখতো। বাংলায় তখন সুগঠিত গুপ্তচর প্রথা চালু ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত খবরাখবর গুপ্তচরেরা সুলতানকে সরাসরি জানাতেন।[১৬]

উপর্যুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও সুলতানের অনেক দাস নিযুক্ত করতেন। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমলেও রাজকার্যে অসংখ্য দাস নিযুক্তি করা হয়। সুলতান রুকন্-উদ্-দীন্ -বার্বক্ শাহ্ হিন্দুদের কারসাজিক নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আট হাজার হাবশী দাস আমদনি করে তাদেরকে প্রাসাদের নানা কাজে নিয়োজিত করেন। ফলত এই হাবশীরা পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশকে সরিয়ে হাবশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭]

### রাজস্ব বিভাগ

স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব বিভাগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতের তুর্কী সুলতানদের রাজস্ব নীতি মুসলিম আইনজ্ঞদের হানাফী আইন-বিধির অর্থনীতির নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হতো। মধ্যযুগে বাংলার রাজস্ব বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে এটা অনুমেয় যে, দিল্লী সালতানাতের প্রবর্তিত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই এখানকার রাজস্ব কাঠামো গড়ে

---

[১৫] K.P.Dutta,*Administrative aspects of medieval institutions in India* (Calcutta: Shri R.K. Dev, 1972), p. 253.

[১৬] Ibid, p. 254.

[১৭] I.H.Qureshi, *Administration of the Sultanate of Delhi*, p. 57.

ওঠে। সুলতানী আমলের রাজস্বের উৎসের মধ্যে গনীমাহ্, ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক এবং আবগারী শুল্ক উল্লেখযোগ্য। সুলতানী আমলে বিশেষত প্রথম যুগে গণীমাত্ অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ অর্থ রাজ্যের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসরূপে গণ্য হতো। ইসলামি আইন মতে, গণীমাতের চার পঞ্চমাংশ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করার এবং এক পঞ্চমাংশ রাজকীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল।[১৮] তবে বাংলায় এই নিয়ম কতখানি মান্য করা হতো, তা জানা যায় না।

রাজস্বের উৎসগুলোর মধ্যে খারাজ বা ভূমি রাজস্বই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। গনীমাহ্ লাভের কোনো সময় সীমা ও পরিমাণ ছিল না, আর যুদ্ধও সবসময় সংঘটিত হতো না। অন্য পক্ষে, ভূমি রাজস্বের পরিমাণ এবং আদায়ের সময় উভয়ই নির্ধারিত ছিল। তবে সব সময়েই যে, এক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা হতো তা বলা যায় না।[১৯] দিল্লীর ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্বের হার বৃদ্ধির বা হ্রাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবুল ফযলের বর্ণনা মতে, প্রাক-মুঘল আমলে বাৎসরিক প্রাপ্য কর ৮টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যেতো। খাজনা নির্ধারণ উৎপাদিত ফসলের সম্ভাব্য পরিমাণের উপর ভিত্তি করে করা হতো এবং সাধারণত প্রজাগণ ছিল অনুগত ও তারা নিয়মিত কর পরিশোধ করতো। নগদ পরিশোধ ব্যবস্থার পাশাপাশি কোনো কোনো এলাকার উৎপাদিত শস্য ভাগাভাগির নিয়মও চালু ছিল।[২০]

শিলালিপিতে 'সর-ই-গোমস্তা' নামক একটি রাজকর্মচারী পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গোমস্তা ছিলেন ভূমি রাজস্ব আদায়কারী। হোসেন শাহী আমলে হিরণ্য ও গোবর্ধন নামক দুজন হিন্দু অমাত্য সাতগাঁও এলাকায় 'অধিকারী' পদে নিযুক্ত থেকে খাজনা আদায় করতেন এবং আট লক্ষ টাকা নিজেরা রেখে ১২ লক্ষ টাকা সুলতানের কোষাগারে পাঠাতেন। সুলতানের প্রাপ্য টাকা নিয়ে যাবার জন্য রাজধানী থেকে যে সব কর্মচারী আসতো তাদের 'আরিন্দা' বলা হতো।[২১]

ভূমি রাজস্বের পরেই বাণিজ্য শুল্কের স্থান। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা ব্যবসায়-বাণিজ্যে অগ্রসর ছিল, বিশেষত পর্তুগীজ নাবিক এবং বণিকদের আগমনের ফলে বাংলার বাহির্বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। চীনা সুত্রে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দরে শুল্ক আদায় করা হতো। বারবোসার বিবরণে সমুদ্র উপকূলে এবং দেশের অভ্যন্তরে অনেক শহরে বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের জন্য সরকারি কর্মচারী নিয়োজিত ছিল । জলপথে যে সব জিনিস আসতো তাদের উপর শুল্ক বাদায় করতো এবং যে সব ঘাটে এসব শুল্ক আদায় করা হতো তাদের বলা হতো শুল্কঘাট। সুতরাং মনে হয় যে,

---

[১৮] N.K. Sinha, *Economic History of Bengal,* Vol.1 (Calcutta : Gosain & Co., 1959), p. 91.

[১৯] Ibid, p. 93.

[২০] R. H. Hallingbuy, *The Zamidary settlement of Bengal*, Vol.11 (Calcutta: P. R. Publishing, 1926), p. 27.

[২১] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল*, পৃ. ৪১১।

অভ্যন্তরীণ বণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ের উপরই শুল্ক আদায় করা হতো। আবগারি শুল্ক আদায়ের উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে চৈতন্য দেবের ভ্রমণ কাহিনীতে হাটকর, পথকর ও ঘাটকরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘাঁটি, দানী প্রভৃতির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, নদী পারাপারের জন্য শুল্ক আদায় করা হতো।[২২]

## সামরিক বিভাগ

স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সামরিক বিভাগ। বাংলায় মুসলিম রাজ্য সামরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতান নিজেই সৈন্য বাহিনীর সার্বধিনায়ক ছিলেন। কোনো কোনো সময় বিশেষ করে স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রথম দিকে সুলতানেরা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন। আবার কোনো কেনো সময় ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতি নিয়োগ করা হতো। সেনাবাহিনী এ সময়কালে ৪ ভাগে বিভক্ত ছিল (১) অশ্বারোহী বাহিনী, (২) পদাতিক বাহিনী, (৩) নৌবাহিনী, ও (৪) হস্তী বাহিনী। অশ্বারোহী বাহিনী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ জয়ে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল মুসলমান সৈন্য বাহিনীর প্রাণস্বরূপ। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ জয়ের সময়ে তারা বুঝতে পারে যে, এখানে অশ্বারোহী বাহিনী অচল, কারণ নিম্ন বঙ্গে নদী নালার আধিক্য হেতু এবং এই এলাকা বর্ষায় প্লাবিত হওয়ায় এখানে অশ্বারোহী বাহিনী নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে না। এ কারণে সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খলজী সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন এবং তখন হতে শেষ পর্যন্ত নৌবাহিনী মুসলমানদের সামরিক বাহিনীর অঙ্গ ছিল।[২৩]

সমসাময়িক শিলালিপিতে সামরিক বিভাগের তিন রকম উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায়: যথা সর-ই-লস্কর, সর-ই-খাইল ও জঙ্গদার। প্রধান সেনাপতিকে বা বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যে সব বাহিনী প্রেরিত হতো, তাদের অধিনায়কদের 'সর-ই-লস্কর' বলা হতো এবং বাংলার পদাতিকদের বিশিষ্ট নাম ছিল 'পাইক' এরা এ দেশেরই লোক ছিল; এরা খুব যুদ্ধ পারদর্শী ছিল। জঙ্গ শব্দের অর্থ যুদ্ধ এবং এই সূত্রে জঙ্গদারকে সাধারণ সৈনিক মনে করা যায় অথবা হয়তো কোনো সাধারণ সৈনিক যুদ্ধে ক্ষমতা প্রদর্শন করলে তাকে 'জঙ্গদার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হতো। বাংলা সাহিত্যে লঙ্কর উপাধিও দেখা যায়, যেমন পরাগল খান ও ছুটি খানকে লস্কর রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। লঙ্কর শব্দের অর্থও সৈন্য, তবে মনে হয়, লঙ্কর শব্দও জঙ্গদারের মতো যুদ্ধে ক্ষমতা প্রদর্শনকারী সৈন্যদের প্রতি ব্যবহার করা হতো। একজন সর-ই-খাইল-এর অধীনে দশজন সাধারণ সৈন্য থাকতো। দশজন সর-ই-খাইলের নেতৃত্ব দিতেন একজন সিপাহসালার। দশজন

---

[২২] তদেব।

[২৩] I.H. Qureshi, *Administration of the Sultanate of Delhi*, p. 56.

সিপাহসালারের অধিনায়ক ছিলেন একজন আমীর। দশজন আমীরের নেতাকে 'মালিক' বলা হতো। সর্বোচ্চ পর্যায়ে একজন 'খান' একলাখ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।[২৪]

নদী মাতৃক বাংলাদেশে নৌ বাহিনীর প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। প্রকৃতপক্ষে অশ্বারোহী বাহিনী বছরের ছয় মাস দেশরক্ষা নিশ্চিত করতে পারতো, আর বাকী ছয় মাস পাইকদের সমর্থনপুষ্ট নৌবহর দায়িত্ব পালন করতো। ইওয়াজ খল্‌জীর সময়কাল থেকেই নৌবহর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। নৌবাহিনীর প্রধানকে বলা হতো 'মীর-ই-বহর'। তার দায়িত্বের মধ্যে ১. নদী পরিবহনের জন্য হরেক রকমের নৌকা তৈরি, ২. যুদ্ধে ব্যবহৃত হাতি পারাপারের জন্য মজবুত নৌকা সরবরাহ, ৩. দক্ষ নৌ-সেনা নিয়োগ, ৪. নদীর তত্ত্বাধবান এবং ৫. ফেরীঘাটে শুল্ক আদায় ।

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার সামারিক বিভাগে হাতিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতো। বাংলার সুলতান কর্তৃক যুদ্ধে হাতি ব্যবহার করার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হাতি সাধারণত যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম আনা নেওয়ার জন্য এবং সৈন্য বাহিনীর নদী পারাপারের জন্য ব্যবহৃত হতো।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার সৈন্যরা প্রধানত তীর-ধুনক দিয়ে যুদ্ধ করতো। এ ছাড়া তারা বর্শা, বল্লম ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করতো। শর ও শুল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে 'আরাদা' ও 'মঞ্জালিক'। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে বাংলার সৈন্যরা কামান চালনা শিখে এবং ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তারা কামান চালনায় দক্ষতার জন্য সুনাম অর্জন করেন।[২৫]

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুদক্ষ সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা ছাড়াও দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্হা সুদৃঢ় করার জন্য বাংলার স্বাধীন সুলতানেরা দুর্গ নির্মাণ করতেন। দুর্গ হিসেবে একডালা দুর্গই সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলএবং দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ্ তুগলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একডালা দুর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক জিয়া উদ-দীন বরনী এবং শামস সিরাজ আফীফ একডালা দুর্গের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এই বর্ণনার সাহায্যে বাংলার দুর্গের স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। আফীফ্ একডালা দুর্গকে একটি দ্বীপরূপে বর্ণনা করেছেন এবং বারানীর মতে একডালা দুর্গ একদিকে পানি এবং অন্যদিকে জঙ্গল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। মধ্যযুগে যখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার হয়নি এবং বিশেষ করে বাংলায় যেখানে বছরের অর্ধেকের বেশি সময় প্লাবিত থাকে,

---

[২৪] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল*, পৃ. ৪১৩।

[২৫] Abdul Karim, "Aspects of Muslime Administration in Bengal down to A.D 1538." *JASP*, Vol.111, p. 63.

সেখানে একডালা দুর্গ যে দুর্ভেদ্য ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই।[২৬] বাংলায় ভাটি অঞ্চলে এ রকম মাটির দেওয়াল বেষ্টিত অসংখ্য দুর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সৈন্যদের বেতন এবং ভাতা সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। চীনা বিবরণে শুধু বলা হয়েছে যে, সৈন্যরা বেতন এবং রেশন পেতো। কিন্তু বেতনের হার বা রেশনের পরিমাণের কোনো উল্লেখ নেই।[২৭]

## বিচার বিভাগ

স্বাধীন সুলতানী আমালের বিচার ব্যবস্থা মধ্যযুগের ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম ন্যায়বিচারের উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ সময়ে বিচার ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল এবং বাংলায় শরিয়াহ্ আইন প্রয়োগ করা হতো। তাছাড়া প্রত্যেক সুলতান জ্ঞানী এবং ন্যায়-বিচারক ছিলেন। সমসাময়িক শিলালিপিতেও কোনো কোনো সুলতানকে জ্ঞানী ও ন্যায় বিচারক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮] আরও কথিত আছে যে, কাজিগণ যে সব ব্যাপারে ন্যায় বিচার করতে অসমর্থ হতেন সে সব ব্যাপারে সুলতান নিজেই বিচার করতেন।

সুলতান নিজেই ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ বিচারক। তবে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমায় বিশেষ করে রাজদ্রোহ এবং ধর্মদ্রোহ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি নিজেই বিচার করতেন।[২৯] সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ ধর্মদ্রোহিতার জন্য হরিদাসকে বাইশ বাযারে প্রহার করার শাস্তি দিয়েছিলেন এবং সুলতান রুকন্ উদ্দীন বার্‌বক শাহ্ রাজদ্রোহের অপরাধে ইসমাইল গাজীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। দিল্লীর সুলতানগণ বিচার বিভাগের কর্তা ছিলেন এবং মোগল বাদশাহ্ বিচার করার জন্য সপ্তাহের দুই বা একদিন নির্দিষ্ট করে রাখতেন। বাংলার সুলতানগণ এরূপ কোনো দিন নির্দিষ্ট করে রাখতেন কিনা জানা যায় না।[৩০]

সাধারণ বিচার কাজ পরিচালনার জন্য শহর ও গ্রামে 'কাজি' (বিচারক) নিয়োজিত ছিল। আইন বিষয়ক জটিল মামলাগুলো প্রধান আইনবিদ নিষ্পত্তি করতেন, আর 'শরিয়াহ্' আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমস্যা দেখা দিলে উক্ত আইনে বিশেষজ্ঞ 'মালিক-উল-উমারা-ওয়াল-ওয়াযারা'-

---

[২৬] সুনীতিভূষন কানুনগো, *বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস* ( চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২), পৃ. ৫৬।

[২৭] Abdul Karim, "Aspects of Muslime administration in Bengal down to A.D 1538." *JASP*, Vol.111, p. ৬৭.

[২৮] V.A. Smith, *The Early History of India* (London : Oxford University Press, 1914), p. 277.

[২৯] B. Ahmad, *Administration of Justice rule in Muslime India* , (Aligarh: 1914), p. 60.

[৩০] সুনীতিভূষন কানুনগো, *বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ.৫৯।

এর সমাধান দিতেন। সুলতানও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না এবং কাজি তার বিচার করতে পারতেন।[৩১] এ ব্যাপারে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, একদিন শিকারের সময় সুলতানের একটি তীর এক বিধবার ছেলেকে বিদ্ধ করে।বৃদ্ধা কাজি সিরাজ উদ্দীনের নিকট নালিশ করলে কাজি সাহেব সুলতানকে ডেকে বিচারালয়ে প্রকাশ্যে সুলতানের বিচার করেন। সুলতান কাজির আদেশ মাথা পেতে নেন এবং বলেন যে, কাজি, সুবিচার না করলে সুলতান তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। কাজিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন যে, সুলতান তাঁর বিচার না মানলে কাজি তাঁকে বেত্রাঘাত করতেন। সুলতানী যুগের জন্য এটা ন্যায় বিচারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।[৩২]

অপরাধীদের দুই প্রকার শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার ও নির্বাসন। কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রমাণও আছে। এছাড়া বন্দী করার প্রমাণও পাওয়া যায়।[৩৩] শীরান খলজী আলী মর্দানকে বন্দী করেন এবং হুসায়ন শাহ্ সনাতনকে বন্দী করেন। তখন সরকারী জেলখানা ছিল না। বন্দীদের কোন একজন অফিসারের অধীনে রাখা হতো। কোনো কোনো সময় রাজদ্রোহীদিগকে দুর্গে বন্দী করে রাখা হতো। নরহত্যার জন্য মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো কিনা জানা যায় না।[৩৪] নরহত্যার ক্ষেত্রে ইসলামের আইনই প্রযুক্ত হতো। তাছাড়া সুলতানের কোনো কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সুলতান তাকে মৃত্যুদন্ড দিতেন। গ্রামাঞ্চলে 'পঞ্চায়েত' বিচার কাজ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। অন্যদিকে হিন্দু জনগোষ্ঠী সামাজিক বিষয়াদিতে হিন্দু ধর্মীয় আইন ও প্রথা মতো বিচার পেতো।[৩৫]

**প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন:** শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য স্বাধীন সুলতানী আমালে সমগ্র বাংলায় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। মুদ্রা ও শিলালিপিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে সুলতানী যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। তবে সেই ধারণা খুব যে স্পষ্ট তা বলা যায় না। মুদ্রায় ইক্‌লীম্, আরছা্, শহর, কসবা্ ও খিত্তা নামক প্রশাসনিক বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলালিপিতে ইকলীম, আরছা, শহর, কসবা্, ও থানা নামক আঞ্চলিক শাসনস্তরের নাম পাওয়া যায়।[৩৬]

---

[৩১] তদেব।

[৩২] P.L. Paul, *The Early History of Bengal,* vol.11 (Calcutta: The Indian Press Ltd, 1939),p.107..Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* vol. 1B, pp. 725-27.

[৩৩] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৩৭-৩৮।

[৩৪] Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, vol. 1B, pp.725-27.

[৩৫] P.L. Paul, *The Early History of Bengal*, p. 112.

[৩৬] Wahid Hossain, *Administration of Muslims in India* (Calcutta: Calcutta University,1961), p.21.

**ইক্‌লীম** : ইক্‌লীমকে বর্তমান সময়ের বিভাগের সাথে তুলনা করা যায়। মুদ্রায় একটি ইকলীম ও শিলালিপিতে দুইটি ইকলীমের নাম পাওয়া যায়ঃ মুয়ায্যমাবাদ ও মুবারকাবাদ। প্রথমটির উল্লেখ সুলতান সিকান্দর শাহের শাসনকাল থেকে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের শাসনকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ চর্তুদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) সময়ে প্রাপ্ত মুদ্রা ও শিলালিপিতে পাওয়া যায়।[৩৭] ইক্‌লীম্ মুবারকাবাদের নাম কেবলমাত্র সূলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালের একটি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। মুয়ায্যমাবাদকে ঢাকা জেলার সোনারগাঁও-এর অদুরে মুয়ায্যপুরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয় এবং ইকলীম মুয়াজ্জমাবাদ সোনারগাঁও হতে উত্তর পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়ে সিলেট পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। একটি বিস্তীর্ণ এলাকা ইক্‌লীম্ মুয়ায্যমাবাদের অধীনে ছিল। ইক্‌লীম মোবারকবাদ ঢাকা হতে পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে দক্ষিণ ঢাকা এবং বর্তমান ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।[৩৮]

**আরছা** : আরছাকে বর্তমান সময়ের জেলার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। শিলালিপি ও মুদ্রায় মোট সাতটি আরছার নাম পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাতগাঁও (উড়িষ্যা), সাজলা (মনখাবাদ), হাদিগড় (রাঢ়), শ্রীহট্ট (সিলেট), চাটগাঁও (পূর্ব বাংলা) এবং আওয়ানিস্তান ওরফে কামরু (কামরূপের সীমান্তে) অবস্থিত ছিল।[৩৯] আরছা শহর-ই-নৌ এর অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে অনেকে মনে করেন যে শহর-ই-নৌ পাণ্ডুয়া বা ফিরুজাবাদের সঙ্গে অভিন্ন।

ইকলীম ও আরছার শাসনকর্তাদের পদবী একই রকমের। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উজির, সর-ই-লস্কর, জমাদার-ই-গায়র মুহল্লী নামক পদবীধারীরাই ইক্‌লীম্ ও আরছার শাসক। এ কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে, ইকলীম ও আরছা এক ও অভিন্ন এবং একই প্রশাসনিক এলাকাকে ইকলীম ও আরছা উভয় নামে অভিহিত করা হত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক বিভাগের নাম ছিল আরছা এবং পূর্ব বঙ্গের বিভাগকে বলা হতো ইকলীম।[৪০] এটা ঠিক যে, আজ পর্যন্ত যেসব সূত্র পাওয়া গেছে, তাতে পশ্চিম বঙ্গের কোথাও ইক্‌লীম্ নাম পাওয়া যায়নি। কিন্তু পূর্ব বঙ্গে অবস্থিত আরছার নাম পাওয়ায় এই মতো গ্রহণ করা যায় না। শিলালিপি ও মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইকলীম দ্বারা বড় এলাকা ও আরছা দ্বারা ছোট এলাকা বোঝাতো এবং আরছা ইকলীমেরই অংশ বিশেষ।

---

[৩৭] Ibid, p.22.

[৩৮] Abdul Karim, "Early Muslim rulers of Bengal and their subjects" *JASP*, 1958, pp. 73-75.

[৩৯] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, পৃ. ২৩৮।

[৪০] I. H. Qureshi, *Administration of the Sultanate of Delhi*, p. 99.

**শহর, কসবা, খিত্তা :** শহর, কসবা, এবং খিত্তা প্রায় একার্থবোধক। শহর শব্দের অর্থ শহর বা নগর; কসবা এমন এক নগর যার রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় নয় এবং খিত্তা যার রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়। তবে মনে হয় শহরের সাথে কসবা ও খিত্তার পার্থক্য এই যে, শহর হলো ব্যবসা কেন্দ্র, কসবা এবং খিত্তাহ সামরিক প্রয়োজনে গঠিত নগর বিশেষ। এ দিক দিয়ে কসবা ও খিত্তাকে সামরিক ছাউনীর সাথে তুলনা করা যায়। খিত্তা ছিল স্থায়ী সামরিক ছাউনী, অপরদিকে অস্থায়ী সামরিক ছাউনীকে বলা হতো কস্‌বা । শহর, কসবা ও খিত্তা এই তিনটি কেন্দ্রই উজির ও সর-ই-লস্করের অধীনে ছিল।[৪১]

**থানা :** শিলালিপিতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় থানা নামক আরও একটি স্থানীয় শাসন বিভাগ ছিল। তবে এই থানাও সর-ই- লস্করের অধীনে ছিল। এ পর্যন্ত দুটি থানার অস্তিত্বই পাওয়া। যথা: লাউবেলা ও লাউড়। থানা লাউবেলা এবং লাউড়ের অবস্থান দৃষ্টে মনে হয় এগুলি সীমান্তে অবস্থিত ছিল। লাউবেলাকে চব্বিশ পরগনা জেলায় ত্রিবেণীর দশ মাইল পূর্বে অবস্থিত লাউবেলার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয় এবং লাউড় সিলেট জেলায় অবস্থিত।

**শিক্ :** সুলতানী আমলের স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে শিককেও একটি শাসন একক বলে মনে করা হয়। কেননা সুলতান রুকন্ উদ্দীন বারবক শাহ এবং সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের শিলালিপিতে শিকদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত শিলালিপিতে উলুগ নসরত খানকে জর, বারোর এবং অন্যান্য মহালের শিকদার রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বোঝা যায় যে, শিকদার কয়েকটি মহালের ভারপ্রাপ্ত শাসন কর্তা ছিলেন এবং আরও ধারণা করা যায় যে, কয়েকটি মহাল নিয়ে একটি শিক গঠিত হতো। হাদিগড় নামে একটি মহালের নাম পাওয়া যায় আবার হাদিগড়কে আরছা রূপেও উল্লেখ করা হয়েছে।

**সামন্ত :** স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলায় সামন্তের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের সময়ে ভান্দসী রায় ঘোড়াঘাট এলাকায় সামন্ত ছিলেন। তাছাড়া আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময়ে রামচন্দ্র খান বেনাপোলের সামন্ত ছিলেন। সামন্তেরা নিদিষ্ট পরিমাণ কর দেয়ার পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকার শাসনভার পেতো।[৪২]

---

[৪১] Ibid, p. 100.

[৪২] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, পৃ. ২৩৮-৩৯।

স্বাধীন সুলতানী আমলে শুধু মুসলমানরা নয়, হিন্দুরাও শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি তাঁরা বহু মুসলমান কর্মচারীর উপরে ওয়ালীও নিযুক্ত হতেন। বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সচিব ও সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৪৩]

## উপসংহার

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলায় মুসলিম শাসন ভারত উপমাহদেশের বৃহত্তর আঙ্গিকে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল ছিল ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময়েই সমগ্র বাংলা একক শাসনাধীনে আসে এবং এ ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন বিকাশ লাভ করে। স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার কারণেই বাংলার ঐশ্বর্য, বৈভব, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য চরমে ওঠে। এ সময়কার প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো, ন্যায়বিচার ও সামরিক কৌশল যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় টিকে থাকবে এবং সামাগ্রক প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রেরণা যোগাবে। স্বাধীন সালতানাতের দুশো বছরের সুশাসনের কারণে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, ও স্থাপত্যে বাংলা ভূখণ্ড ব্যাপক উৎকর্ষ লাভ করে। তাছাড়া বর্তমানের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা স্বাধীন সুলতানী প্রশাসন ব্যবস্থার 'দবির' ভিত্তিক কাঠামোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ আমলের রাজস্ব, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রশাসন ব্যবস্থার অবদানেই বাংলা হয়েছিল স্ব-নির্ভর ও সমৃদ্ধশালী ।

---

[৪৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.৭৭।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা ১৪১৫

# ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা

মুনসী মুনজুরুল হক*

**Abstract:** The non-cooperation movement of 1971 is an important event in the history of Bangladesh. It may be called prelude to the Liberation War of Bangladesh. After the establishment of Pakistan the disparity and misrule pursued by the government against the Bengali people of East Pakistan led them to raise protest against it. This also led step by step the Bengali people towards the Liberation War. With the passage of time, the consciousness of the Bengali people reached its highest peak. This consciousness was shown in the general election of 1970 in which Awami League got absolute majority. In spite of that the scheduled session of the National Assembly was posponed with avode aim of depriving Awami League from power. As a protest against this mechanism Awami League Chief Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called the non-cooperation movement. The Bengali people responded to his call spontaneously (with great enthusiasm) from March 2 to 25, 1971. The intellectuals also actively took part in this non-cooperation movement.

## ১. ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ এবং শেষ হয় একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। এর পটভূমিকায় আছে তেইশ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তানের জন্মমুহূর্ত থেকেই এ ভূখণ্ডে শুরু হয় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন। ক্রমান্বয়ে তা স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়, এবং অবশেষে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৪৮-৫২ সময়কালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ শাসনের অবসান, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের 'ছয় দফা' আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলন—এসব পর্যায় পাড়ি দিয়ে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। অসহযোগ আন্দোলনের ওপর অসংখ্য বই-পুস্তক লেখা হলেও তেমন কোনো গবেষণা হয়নি।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১লা মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান অকস্মাৎ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৭০ সালের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। সে হিসেবে এ দলটির পাকিস্তানে সরকার গঠনের কথা ছিল। জাতীয় সংসদের অধিবেশনও আহ্বান করা হয়েছিল ৩রা মার্চ ১৯৭১ তারিখে। কিন্তু আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যেন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারে সে উদ্দেশ্যে শুরু হয় চক্রান্ত। ১লা মার্চ ১৯৭১ তারিখে আকস্মিকভাবে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ঐ ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছিল। ব্যাপারটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছেও অস্পষ্ট ছিল না। তাই মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[১] ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মকাণ্ড স্বতস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। বুদ্ধিজীবীরাও এ সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র উক্ত আন্দোলন দমনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতের কিছু আগে নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণপূর্বক গণহত্যা শুরু করলে ২৬শে মার্চ ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অচিরেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে তাই অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

**২. সংজ্ঞা :** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার পূর্বে বুদ্ধিজীবী কারা সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। বুদ্ধিজীবী সমাজের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Intelligentsia'। এটি একটি রুশ শব্দ 'ইনতিলিগেন্ত' (Intelligenth) থেকে এসেছে। উনিশ শতকের ষাটের দশকে রুশ লেখক 'ববোরিকিন' (Boborekin) প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন।[২]
সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড শীলস এর ভাষায়:

> Intellectuals are the aggregate of persons in any society who employ in their communication and expression, with relatively higher frequency than most other members of the society, symbols of general scope and abstract reference concerning men, society nature and the cosmos.[৩]

অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী হলেন যেকোন সমাজের সেই সব ব্যক্তিবর্গ যাঁরা তাঁদের আদান প্রদান ও অভিব্যক্তিতে সমাজের অন্যান্য সদস্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত সাধারণ পরিধিসমন্বিত ও বিমূর্ত নির্দেশবাহী প্রতিকসমূহ প্রয়োগ করে থাকেন। সাধারণ অর্থে অধ্যাপক-শিক্ষক, আইনজীবী, কবি-লেখক-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ প্রমুখ ব্যক্তিকে বুদ্ধিজীবী

---

[১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২রা মার্চ, ১৯৭১; *দৈনিক পাকিস্তান*, ২রা মার্চ, ১৯৭১।

[২] *গ্রেট সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া*, ১০ম খ (নিইইয়র্ক: ১৯৭৬), পৃ. ৩১৮।

[৩] এডওয়ার্ড শীলস, "ইন্টেলেক্টচুয়ালস", *ইনটারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য সোশাল সায়েন্সস*, ডেভিড শীলস (সম্পা.), ৭ম খণ্ড (ইউ.এস.এ.: ১৯৯৬), পৃ. ৩৯৯।

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে এখন ঐ শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাদার-অপেশাদার মানুষ যাঁরা নিজ জ্ঞানানুশীলন ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করে থাকেন তাঁদেরই বুদ্ধিজীবী বলা হয়। Elite অপর একটি ইংরেজি শব্দ যার দ্বারা শিক্ষিত সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীকে বোঝায়। লেলিনের মতে, বুদ্ধিজীবী হলো, ...all educated people, the members of the liberal professons, the brain workers, ...as distinct from the manual workers.[৪] অর্থাৎ সকল শিক্ষিত লোক, যারা উদার বৃত্তিধারী, যারা কায়িক শ্রমজীবীদের থেকে আলাদা, যাদেরকে 'মেধাশ্রমিক' বলা যায়। রবার্ট মিচেল্স-এর মতে:

> Intellectuals are the persons possessing knowledge or in a narrower sense those whose judgment, based on reflection and knowledge, derives less directly and exclusively from sensory perception than in the case of non-intellectuals... those who have merely accumulated knowledge are not true intellectuals. The scholar must possess priestly qualities and fulfill priestly functions, including political activity.[৫]

অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন জ্ঞানের অধিকারী, কিংবা সংকীর্ণ অর্থে তাঁরাই বুদ্ধিজীবী যাঁদের বিচারবুদ্ধি গভীর চিন্তা ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সরাসরি বা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে ততোটা উৎসরিত নয় যেমনটা হয়ে থাকে অ-বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে। যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান সঞ্চয়ই করেছেন তাঁরা সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী নন। পণ্ডিত ব্যক্তির যাজকসুলভ গুণাবলি থাকতে হবে এবং তাঁকে যাজকের দায়িত্বই পালন করতে হবে, যার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও থাকবে। ফরাসিতে এঁদেরই বলে 'এলিট'।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করে এবং অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশের যুব সমাজ, বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করে তুলতে তাঁরা অনেকেই সাহায্য করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শনও তাঁরা ছাত্র ও যুবকদের নিকট বারবার বিশ্লেষণ করেছেন। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৭), আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯১৮-১৯৯৭), মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩), অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, খান সারোয়ার মুরশিদ, সৈয়দ আলী আহসান (১৯১৮-২০০২), মোশাররফ হোসেন, আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭), অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ (জ. ১৯৩৫), অজয় রায় (জ. ১৯২৮) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬]

### ৩. ২রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ঘটনাবলি

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২রা মার্চ সারা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় ছাত্র

---

[৪] তদেব।

[৫] রবার্তো মিচেলস, 'ইন্টেলেকচুয়ালস', *এনসাইক্লোপীডিয়া অব দ্য সোশাল সায়েন্সস*, এডউইন আর.এ. সেলিগম্যান (সম্পা.), ৭ম খণ্ড (ইউ.এস.এ.: ১৯৫৯), পৃ. ১১৮।

[৬] মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১২।

জনতার বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। এ পতাকা পরিকল্পনা ও অঙ্কন করেন শিল্পী শিবনারায়ণ দাশ।[৭] আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আহমদ ফজলুর রহমানের সহধর্মিনী হাছিনা রহমান কাপড় কেটে মানচিত্রখচিত পতাকা তৈরি করে দেন।[৮]

২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের কোনো না কোনো সংগঠন অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছিল। ২রা মার্চ ১৯৭১-এর হরতালে পাকিস্তান সরকারের পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর হাতে ঢাকায় যারা শহীদ হন সেই শহীদের লাশ নিয়ে অন্যান্যদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শোক মিছিল করে শহীদ মিনারে জমায়েত হন। ৩রা মার্চ সকাল এগারোটায় গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বটতলায় প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে শিক্ষকদের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।[৯]

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশের) শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণ ও সরকারি কর্মচারীরাসহ সর্বস্তরের জনতা বঙ্গবন্ধুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করতে থাকে।[১০] শিক্ষকদের সমাবেশ নিয়ে দৈনিক *সংবাদ* পত্রিকায় বলা হয়:

> গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সভা ও শোভাযাত্রা করেন। তাঁহারা নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের দাবিতে বিভিন্ন ধ্বনি প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ, তরুণ নির্বিশেষে সকল শিক্ষকই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হইতে বাহির হইয়া পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী ও হাইকোর্টের মোড় হইয়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গমন করে।[১১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন অধ্যাপক ৩রা মার্চ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, শোষক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও কারসাজি করে পূর্ব বাংলার শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি নস্যাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাঁরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অধ্যাপকবৃন্দ বলেন, সুপরিচিত দু'একটি রাজনৈতিক মহলের অযৌক্তিক দাবির অজুহাতে জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত রাখা এ অশুভ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ। এ গণবিরোধী চক্রের কার্যকলাপ দেশকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।[১২]

৪ঠা মার্চ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত

---

[৭] তদেব।

[৮] মোনায়েম সরকার, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস; মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১," অন্তর্গত সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২০৭।

[৯] তদেব।

[১০] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৭৮১-৭৮২।

[১১] *সংবাদ*, ৪ মার্চ ১৯৭১।

[১২] তদেব।

রয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। বিবৃতিতে তারা অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন বাতিল করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।[১৩]

সাংবাদিকগণও চুপ করে বসে থাকেননি, তাঁরাও জনতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি জানান। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ৪ঠা মার্চ ১৯৭১ তারিখে এক জরুরি সভায় বাংলাদেশের জনসাধারণের সার্বিক মুক্তি আদায়ে গণআন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সভাটি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে (১) গণহত্যার[১৪] বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ এবং এ হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও নিহতদের পরিবারের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়, (২) সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের ব্যাপারে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে মৌলিক নীতি ঘোষিত হয়েছে তাহা পালনের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধি-নিষেধাদি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা, সরকার বা মালিক পক্ষ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করলে সাংবাদিকগণ তা সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করবেন, (৩) সঠিক মতামত প্রকাশের অধিকার না দিলে সাংবাদিকরা বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন, (৪) ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন, (৫) বিশিষ্ট সাংবাদিক নাজিউল্লাহ ও শামসুজ্জোহার দণ্ডাদেশ বাতিল এবং স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁদেরকে অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবি।[১৫] সংবাদপত্র ও সাংবাদিকবৃন্দ তথা বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণে আন্দোলনে গতি সঞ্চার হয়। ২রা মার্চ বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেন–রেডিও-টেলিভিশন কর্তৃক যদি আন্দোলনের খবর প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে এসব ক্ষেত্রে চাকরিরত বাঙালিরা কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন। এ ঘোষণা অনুযায়ী ৪ঠা মার্চ ঢাকায় ২৪ জন প্রখ্যাত শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে,

> যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁরা বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না।[১৬]

একই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ইংরেজি দৈনিক 'দি পাকিস্তান অবজারভার'-এর গণবিরোধী ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেন:

> ঢাকার দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ আমরা কর্তব্য মনে করিতেছি। বিশেষ করিয়া ৪ঠা মার্চ, এই পত্রিকা সংবাদ পরিবেশনায় ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে সমগ্র দেশে লুটতরাজ, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছে, তা দেশবাসীর অভাবিতপূর্ব বিক্ষোভ ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগের প্রতি নিষ্টুররূপে

---

[১৩] আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ৬৪।

[১৪] ২রা মার্চ ঢাকা শহরে হরতাল চলাকালে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাহিনী কার্ফুভঙ্গের জন্য মিছিলে গুলি বর্ষণ করলে অনেকে নিহত ও আহত হয়। জনগণের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণকে বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ সংবাদপত্রে দেওয়া বিবৃতিতে গণহত্যার সামিল বলে অভিহিত করেন।

[১৫] *দৈনিক সংবাদ*, ৫ মার্চ ১৯৭১।

[১৬] রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি*, পৃ. ৬৪।

> অপমানকর। দেশবাসীর প্রতি আমরা আবেদন করি, তাঁরা যেন এই পত্রিকাটি বর্জন করেন। বিবৃতিদানকারী শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন।[১৭]

সকল সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সকলেই যে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, কেউ কেউ বিরোধিতাও করেছিলেন। *'দি পাকিস্তান অবজারভার'*-এর ভূমিকা ছিল অনুরূপ, নেতিবাচক।

অসহযোগ আন্দোলনে কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরাই পাকিস্তান সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন নাই, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। ৪ মার্চ, লাহোর হাইকোর্টের ৪ জন প্রখ্যাত আইনজীবী মালিক ইয়াসিন খান ওয়াট্টো, মালিক মোহাম্মদ জাফর, নির্বাচিত এমএনএ আবি` হাসান মিন্টু এবং সাহেবজাদা শের আলী খান এক যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন:

> জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্য দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের কোন নাগরিকই এ পরিস্থিতির নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। তাঁরা ৭ মার্চের আগেই জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ডাকার আহবান জানান।[১৮]

৫ই মার্চ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্দোলনে নিহত শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন। জানাজায় ইমামতি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এ.কিউ. চৌধুরী। জানাজা শেষে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। এ মিছিলে নেতৃত্ব দান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক এম.এ. নাসের, রেজিস্ট্রার এ.কে.এম. জহিরুদ্দীন, ছাত্রকল্যাণ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক এম. এ. জব্বার এবং দু' ফ্যাকালটির ডীন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানরাও মিছিলে যোগ দেন। কালো কাপড়ের ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল "বাঙালি হত্যা বন্ধ করো, সামরিক শাসন বাতিল করো, গোলটেবিল না রাজপথ–রাজপথ রাজপথ, স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলা কায়েম করো, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত, নতুন নাম নতুন দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ, কৃষক রাজ শ্রমিক রাজ কায়েম করো কায়েম করো" প্রভৃতি।[১৯] ২রা ও ৩রা মার্চ সারা দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচিতে শাসকগোষ্ঠীর গুলি বর্ষণে নিহতদের স্মরণে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক,শিক্ষার্থী যাদের থাকার কথা ক্লাশে, গবেষণাগারে তারা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাস্তায় নেমে আসেন।

৫ই মার্চ লেখক, বুদ্ধিজীবী ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির নাম পাল্টিয়ে 'বাংলা শিক্ষক সমিতি' রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সভাশেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি মিছিল বের করা হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাংলা শিক্ষক সমিতির (পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতি) এডিটর হেনা দাস, শিক্ষক সমিতির ঢাকা শহর

---

[১৭] ত্রিবেদী, একাত্তরের *দশমাস*, পৃ. ২১; সুকুমার বিশ্বাস, *অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী) পৃ. ১২৩। প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, আহমদ শরীফ, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, খান সরোয়ার মুরশিদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নীলিমা ইব্রাহীম, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ।

[১৮] আহমেদ ফারুক হাসান, *উত্তাল মার্চ* ১৯৭১ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৯।

[১৯] রহমান, *অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি*, পৃ. ৬৪।

শাখার সম্পাদক আবদুর রউফ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা কমিটির সম্পাদক সিরাজুল হক, ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি এবাদত হোসেন ও বাংলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব জয়নুল আবেদিন চৌধুরী।[২০] শিক্ষক সমিতির আন্দোলনে সরকারি কলেজের শিক্ষকবৃন্দও ছিলেন। সরকারি চাকুরি করে আন্দোলনে নামা ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও শিক্ষকরা পিছপা হননি।

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিষ্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রাম হতে প্রেরিত এক তারবার্তায় বলেন যে:

> সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার শর্তাবলী গ্রহণ করা প্রেসিডেন্টের মোটেই অসুবিধাজনক ব্যাপার নহে এবং সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতার দেশ শাসন করার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। গত ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেন্ট স্বয়ং জাতীয় বিপত্তি ডাকিয়া আনিয়াছেন। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া বর্তমান অচলাবস্থা নিরসন করা যাইতে পারে।[২১]

৫ই মার্চ ঢাকার লেখক ও শিল্পীবৃন্দ জনতার সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং শহীদ মিনারে প্রফেসর আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতার শপথ নেন। লেখক-শিল্পীদের মিছিল শহীদ মিনারের দিকে যাবার সময় মিছিল হতে–"তুলি-কলম-কাস্তে-হাতুরি–এক করো এক করো", "লেখকদের সংগ্রাম–চলবে চলবে", "লেখক-শিল্পী-ছাত্র-জনতা–এক হও এক হও" ইত্যাদি শ্লোগান ধ্বনিত হয়। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১), মমতাজুর রহমান তরফদার, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মযহারুল ইসলাম বলেন:

> আজ বক্তৃতা করিবার সময় নয়, পথে নামার সময়। বাংলাদেশের স্বাধিকারের দাবীতে যখন পথে পথে ছাত্র, শ্রমিক, মেহনতি জনতা নির্ভয়ে বীরের মতন প্রাণ দিতেছে– আমরা লেখকরা তখন ঘরের কোণে চুপ করিয়া থাকিতে পারি না।আমরাও বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিতেছি।[২২]

কবি শামসুর রাহমান তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে যা বলেন সে সম্পর্কে *প্রতিরোধ* পত্রিকার রিপোর্ট:

> আমরা যখনই আমাদের দাবী লইয়া পথে আসিয়াছি, তখনই আমাদের বুলেট-বেয়নেটের আঘাতে নির্বিচারে হিংস্রভাবে হত্যা করা হইয়াছে।" '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণআন্দোলনের উদাহরণ টানিয়া তিনি বলেন, আমরা আর এইভাবে প্রাণ দিতে চাই না, চাই মুক্ত বাংলা। তিনি মিলিটারী বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লইবার আহবান জানান।[২৩]

অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, ঢাকার শিল্পী সমাজ, বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, ঢাকা সেবিকা বিদ্যালয়, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, গণশিল্পী গোষ্ঠী প্রভৃতি সংগঠন সমাবেশ ও মিছিল করে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। আলী আশরাফের সভাপতিত্বে ঢাকা

---

[২০] হাসান, *উত্তাল মার্চ*, পৃ. ৯।

[২১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ মার্চ ১৯৭১।

[২২] *প্রতিরোধ*, ২য় সংখ্যা, ৬ মার্চ ১৯৭১।

[২৩] তদেব।

সাংবাদিক ইউনিয়নের এক প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন কে.জি. মোস্তফা, আতাউস সামাদ, আলী তারেক। কে.জি. মোস্তফা তাঁর বর্ক্তৃতায় বলেন:

> শাসকগোষ্ঠী এক হাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের টোপ এবং অন্য হাতে উদ্যত বেয়নেট নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মানুষ বেয়নেটের চ্যালেঞ্জকেই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।[২৪]

৫ই মার্চ চলচ্চিত্র শিল্পের ৩৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করেন। তাঁরা বিবৃতিতে বলেন:

> পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক চক্রের চাপে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রেখে বর্তমান সরকার একথাই প্রমান করেছেন যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী মিটাবার সদিচ্ছা বর্তমান সরকারের নেই। এহেন সরকারের সংগে অসহযোগিতা করার জন্য পূর্ব বাংলার কৃষক, মজদুর,ছাত্র, বুদ্ধিজীবী তথা সমগ্র জনতার সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী, কুশলী সমাজ একথাই ঘোষণা করছে যে,পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায় না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না। পূর্ব বাংলার শোষিত জনতা জিন্দাবাদ। জনতার সংগ্রাম জিন্দাবাদ।[২৫]

৬ই মার্চ জাতীয় দৈনিকগুলো কালবিলম্ব না করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানায়। 'আর বিলম্ব নয়' শিরোনামে *দৈনিক সংবাদ*- এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> প্রেসিডেন্টের ১লা মার্চ তারিখের ঘোষণার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা নিরসনের কোন লক্ষণ এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই ক্রমাবনতিমুখী পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে যথাযথ ত্বরিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আয়ত্বের মধ্যে আনয়নের ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টারী গ্রুপের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের প্রতি ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য জরুরী আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উহা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় উক্ত ব্যবস্থাপত্রটি যে পরিস্থিতির উপযোগী নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের জনাব ভূট্টো ও কাউয়ুম খান ব্যতীত অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।[২৬]

বুদ্ধিজীবীরা অসহযোগের দিনগুলোতে জনসাধারণের সহিত একাত্ম হয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। ১লা মার্চ থেকে ধারাবাহিক ভাবে মিটিং, মিছিল চলছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজের সকল শ্রেণীই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক কর্মসূচি সফল করতে জনগণের কাতারে সামিল হয়ে পড়েন। লেখক, শিক্ষক-অধ্যাপক, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, পেশাজীবী সকলেই অসহযোগ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্দোলন বেগবান হয়। জনসাধারণ মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বুদ্ধিজীবীদের

---

[২৪] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২) পৃ. ২৭০।

[২৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ, ১৯৭১।

[২৬] *দৈনিক সংবাদ*, ৬ মার্চ ১৯৭১।

কর্মসূচিতে সাড়া দেয়, অথবা বলা যায় যে, আন্দোলন বৈধতা পায় এবং জনগণ যৌক্তিক মত শুনে উৎসাহিত হয়ে মানসিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

৬ই মার্চ পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও রাওয়ালপিণ্ডি সাংবাদিক ইউনিয়নের নয়জন কর্মকর্তা সংবাদপত্রের উপর প্রদত্ত সকল নিষেধাজ্ঞা বিশেষ করে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত বিধিনিষেধ অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানান। সংবাদপত্রের উপর থেকে সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন যে দাবি জানিয়েছিলেন, তাঁরা এক যুক্ত বিবৃতিতে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা পিএফইউজের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক ও সংগ্রামরত মেহনতি জনগণের সঙ্গে পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন: পিএফইউজের সেক্রেটারি জেনারেল মিনহাজ বার্না, পিএফইউজের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ মালিক, আরইউজের প্রেসিডেন্ট বশিরুল ইসলাম ওসমানী, পিইউজের প্রেসিডেন্ট হামিদ আখতার, পিইউজের জেনারেল সেক্রেটারি হোসেন নকী, এফইসি সদস্য এ.টি.চৌধুরী ও আই.এ.রহমান এবং পিপিএল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি সফদার মীর ও আব্বাস আখতার।[২৭] ৬ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেস ক্লাব থেকে একটি মিছিল করে একং বায়তুল মোকাররমের সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতাকালে পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিষ্ট-এর সভাপতি কে.জি. মোস্তফা অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের জন্যে তাদেরকে অভিনন্দন জানান। তিনি জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকদের প্রতিও অনুরোধ জানান।[২৮]

পূর্ব বাংলার সার্বিক স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে জয়যুক্ত করার জন্য শিল্পী সমাজ বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করেন। ঢাকার সঙ্গীত শিল্পী, নৃত্য শিল্পী ও পটুয়ারা (চিত্র শিল্পী) ৬ই মার্চ বাংলা একাডেমীতে এক সভায় মিলিত হয়ে এ শপথ নেন। সভার পর এক মিছিলে রাজপথ ঘুরে ঘুরে শ্লোগানে শ্লোগানে জানিয়ে দেন এ শপথের বার্তা। সভায় বিভিন্ন বক্তা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন:

> জনতার সংগ্রামে শিল্পীরা আজ এক কাতারে সামিল। জনসমুদ্রে আজ যে জোয়ার এসেছে তাকে রোধ করা যাবে না। শিল্পীদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও দেশ প্রেম রয়েছে তা বৃথা যেতে পারে না। জনগণের প্রাণের দাবী ও মানুষের ভাষাকে গান, অভিনয় ও চিত্রের মধ্যে দিয়ে সারা বাংলায় ব্যপ্ত করে দেয়ার জন্যে তাঁরা শিল্পী সমাজের প্রতি আহবান জানান।[২৯]

সভায় উপস্থিত টিভি সংবাদ পাঠক তাজুল ইসলাম ও সিরাজুল মজিদ মামুন শপথ করেন যে, তাঁরা কালো ব্যাজ পরিধান করেই খবর পাঠ করবেন। বিশিষ্ট অভিনেতা ও সঙ্গীত পরিচালক খান আতাউর রহমান সভায় শপথ নিয়ে বলেন যে, আজ থেকে তিনি জনতার দাবিকে গানে গানে

---

[২৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ ১৯৭১।

[২৮] তদেব, পৃ. ১০।

[২৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ ১৯৭১। পৃ. ১০। ।

ব্যক্ত করার জন্যে তরুণ কণ্ঠ-শিল্পী বাহিনী গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। শিল্পীদের এ সভায় লায়লা আরজুমান্দ বানু (১৯২৯-১৯৯৫) সভাপতিত্ব করেন।[৩০]

মুক্তি সংগ্রামের চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখার অনুপ্রেরণা যোগানোর তাগিদে গণমুখী সংগীত, নাটক, জীবন্তিকা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বাংলার বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ কতিপয় শর্তাধীনে বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের ৪৬ জন সদস্য এক বিবৃতিতে বলেন:

> দেশের সাময়িক অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিল্পীরা গত ১মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত বেতার ও টেলিভিশনের যাবতীয় অনুষ্ঠান বর্জন করে চলেছেন। বিবৃতিতে তাঁরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে যে সব শর্ত দিয়েছেন সেগুলো হচ্ছে: (১) যাবতীয় অনুষ্ঠান অবশ্যই আন্দোলনের অনুকুল হতে হবে। কোন অবস্থাতেই আন্দোলনের পরিপন্থী বা দেশের সামগ্রিক অবস্থার সহিত অসংগতিপূর্ন অনুষ্ঠান শিল্পীরা প্রচার করবেন না। (২) যতদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ততদিন প্রদেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংগীত একাডেমিগুলো বন্ধ থাকবে। তবে গণমুখী সংগীত পরিবেশনের প্রয়োজনে গণসংগীতের মহড়া চলতে থাকবে। (৩) যদি আবার সামগ্রিক হরতাল ঘোষিত হয় তবে শিল্পীদের অসহযোগ আন্দোলনও আবার চলতে থাকবে। শিল্পী সমাজের প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের বক্তব্য শোনেন এবং তাঁদের কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করেন।[৩১]

৬ই মার্চ (অব:) এয়ার মার্শাল আসগর খানের বঙ্গবন্ধুর সহিত একটি সাক্ষাৎকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের ভবিষ্যৎবাণী রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু আসগর খান এভাবে বিবৃত করেছেন:

> I asked Sheikh Mujibur Rahman what seenario he visualized and how the stalemate could be broken. He repplied that the situation was very clear. Yahya Khan would come to Dhaka first, followed by MM Ahmed (Head of the Planing Commission), who would be followed by Bhutto, Yahya Khan would then order millitary action and that would be the end of Pakistan. About himself, he said he hoped that he would be taken prisoner for if he was not, he would be killed either by the Pakistany army or by his own people. It is surprising that the sequence of events was almost extactly as he had forcast.[৩২]

---

[৩০] তদেব। চিত্রশিল্পী(পটুয়া) কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), অভিনেতা গোলাম মোস্তফা, আনোয়ার হোসেন, হাসান ইমাম ও রাজ্জাক, কণ্ঠ শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী, সংগীত শিল্পী-সংগঠক–সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক এবং শামসুল হুদা চৌধুরী। প্রস্তাব পাঠ করেন কণ্ঠশিল্পী আতিকুল ইসলাম

[৩১] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ মার্চ ১৯৭১; কাজী ফজলুর রহমান, *দিনলিপি: একাত্তর* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭) পৃ. ১৩। বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হচ্ছেন: আবদুল আহাদ, সমর দাস, ধীর আলী, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ হাফিজুর রহমান, হাসান ইমাম, রাজ্জাক, খান আতাউর রহমান, রওশন জামিল, মুস্তফা মনোয়ার, ওয়াহিদুল হক, কামাল লোহানী, ফেরদৌসী রহমান, সৈয়দ আবদুল হাদি, মাহমুদ-উন-নবী, আলতাফ মাহমুদ, এম এ হামিদ,সুমিতা, রোজী,সুচন্দা, কবরী, সুজাতা প্রমুখ। সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন জনাব হাসান ইমাম।

[৩২] Mohammad Asghar Khan, *Generals in Politics: Pakistan1958-1982* (Dhaka: UPL, 1983) p. 30; সিদ্দিকুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৪৫।

অর্থাৎ আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর কর্মপন্থা সম্পর্কে এবং আসন্ন অচলাবস্থা কিভাবে নিরসন সম্ভব সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ।তিনি উত্তরে বলেছিলেন বিষয়টি খুবই সোজা। ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসবেন তার পর এম এম আহমেদ(পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান) এবং তার পরে আসবেন ভুট্টোকে সাথে নিয়ে। ইয়াহিয়া খান সেনাভিযানের নির্দেশ দেবেন যা পাকিস্তানের সমাপ্তি ঘটাবে। তাঁর নিজের পরিণতি সম্পর্কে বলেন, তাঁকে বন্দী করা হবে, কারণ তা না হলে তাঁকে হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যা করবে, নয় তাঁর স্বদেশবাসীরাই সে কাজটি করবে। আশ্চার্যের ব্যাপার হলো তাঁর ভবিষ্যৎবাণী পরবর্তী পর্যায়ে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

২রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশে যে আন্দোলনের বীজ রোপিত হয় তারই পথ ধরে এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করে। ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

## ৪. ৭ই মার্চ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। এ দিন বঙ্গবন্ধু রমনার রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতা ও চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রামের এক দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন ।চারদিকে শুধু বিদ্রোহের উত্তেজনা। বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের মতো জনতার মিছিলের শ্লোগান ছিল—‘জয় বাংলা’, ‘বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়—বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ‘তোমার দেশ আমার দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ’, ‘তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা-মেঘনা-যমুনা’, ‘স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা—শেখ মুজিব শেখ মুজিব’, ‘পিণ্ডি না ঢাকা—ঢাকা ঢাকা’,[৩৩] ইত্যাদি শ্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস মাটি কম্পমান হলো। যোগাযোগ ব্যাবস্থা সম্পূর্ন অচল। অথচ লাখো লাখো মানুষ গ্রাম-বন্দর-অলিগলি থেকে ছুটে এসেছিল রেসকোর্স ময়দানের দিকে। তাদের হাতে রয়েছে লাঠি,রড,বাঁশ ইত্যাদি। দেশ-বিদেশ থেকে সাংবাদিকরাও এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনতে; তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে। নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষ এতে অংশ নেয়। বুদ্ধিজীবীরাও এ দিনের কর্মসূচি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে জনতার সাথে মিশে যান। লক্ষ জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্ব ছিল নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা সেদিন না দিলেও সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করবে, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব তবু এদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।”

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেসকোর্স ময়দান থেকে সরাসরি বাংলাদেশের রেডিও ও টেলিভিশনে একসঙ্গে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং তা বেতারে ঘোষণাও দেয়া হয়। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডি থেকে দুপুর নাগাদ হুকুম আসে ‘বন্দ করো ইয়ে সব’। বেতার কর্মীরা প্রশংসনীয়ভাবে বেতার কেন্দ্রে এবং মঞ্চে দুস্থানেই রেকর্ড করেছিলেন ভাষণ। তা থেকেই পরবর্তীতে ভাষণের রেকর্ড তৈরি হয়। প্রচার বন্ধ করে দেয়ার খবরটা তারা কায়দা করে মঞ্চে নেতাদের বলে দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতাতেই এর প্রতিবাদ করে বাঙালি বেতার কর্মীদের আহ্বান জানান কাজ বন্ধ করে

---

[৩৩] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ মার্চ ১৯৭১।

দিতে। বাংলাদেশের সব বেতার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। সাথে সাথে ঢাকা বেতারের সকল স্তরের অফিসার ও কর্মচারী তৎক্ষণাৎ কর্মবিরতি শুরু করেন এবং এদিন রাতেও আর বেতার চলেনি। রাতে বেতারের অফিসার ও কর্মচারীদের সাথে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে নেন এবং সে অনুযায়ী পরদিন ৮ই মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচারের মাধ্যমেই বেতার কর্মীরা তাদের কর্মবিরতির অবসান ঘটান।[৩৪]

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের সাথে যেমন আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তেমনি সাথে সাথে কতকগুলো 'আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক'ও করে ছিলেন। তিনি (বঙ্গবন্ধু) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নূরুল্লাহকে ডেকে পাঠান। বৈঠকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫) ও তাজউদ্দিন আহমেদ (১৯২৫-১৯৭৫) উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু, নূরুল্লাহকে বলেন, 'নূরুল্লাহ, আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরি করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই, তুমি আমায় কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরি রাখবে। আমি শেষ বারের ভাষণ দিয়ে যাব'। নূরুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বার্তাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বললেন এবং শুরু হয়ে গেল স্বাধীন বাংলার প্রথম রেডিও স্টেশন তৈরির কাজ। বিভাগীয় প্রধান জহুরুল হক সহ প্রায় সকল শিক্ষক ৯ দিন কাজ করার পর একটি ট্রান্সমিটার তৈরি করে ফেলেন। এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী। শর্ট ওয়েভে-এর শব্দ ধরা যেত।[৩৫]

বঙ্গবন্ধু, তাঁর সহকর্মী ও বুদ্ধিজীবী সমাজ আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা ছাড়বে না তাই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার বরণের ইতিহাস অনেক। তাই স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত করে রেখেছিলেন। যদিও তাঁর নির্দেশিত পথে বানানো ট্রান্সমিটারে স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে দিতে পারেনি মুক্তিকামী জনতাকে, তথাপি ইপিআরের ওয়ারলেস সেটে ২৬শে মার্চের ১ম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

## ৫. ৮ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঘটনাচক্র

৮ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা এ সময় আন্তর্জাতিক খবরের কেন্দ্রভূমি। সারা বিশ্বের গণমাধ্যমের দৃষ্টি ঢাকার প্রতি। এ দিন লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ পড়ানোর চেষ্টা করা হয়। বিকাল ৪ টায় শপথ পাঠের সময়। গভর্নর হাউজের (বর্তমান বঙ্গভবন) চারপাশে কড়া সেনা প্রহরা মোতায়েন করা হলো। প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীকে আনার জন্য লোক পাঠানো হলো। বি. এ. সিদ্দিকী আসতে রাজি হলেন না। বলে দিলেন, তাঁর পক্ষে শপথ পড়ানো সম্ভব নয়। বিচারপতি সিদ্দিকীর দৃঢ়তায় দেশবাসী আলোড়িত হলো। বিদেশি সাংবাদিকরা হতবাক। তাঁরা সিদ্দিকীর সাথে কথা বলতে চাইলেন। তিনি কোন সাংবাদিকদের সাথে কথা বললেন না।[৩৬] বিচারপতির সাহসী ও সময়োচিত সিদ্ধান্তে আইনজীবীসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত হয়। বিশেষ করে আইনজীবীরা আইনি সমর্থন ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজপথে নেমে আসতে কুণ্ঠিতবোধ

---

[৩৪] নাজিমুদ্দীন মানিক, *একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো* (ঢাকা: তিশা বুকস ট্রেড, ২০০০), পৃ. ৫২।

[৩৫] মনজুর আহমদ, *একাত্তর কথা বলে* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ২৬-২৭।

[৩৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ই মার্চ ১৯৭১।

করেননি।

১০ই মার্চ তারিখে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' বায়তুল মোকাররম থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত মিছিল নিয়ে যায়। সেখানে তারা কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।[৩৭] এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এক সভায় মিলিত হয়ে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানান। অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর(১৯১১-৮৪) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত চার দফা[৩৮] শর্তকে সঙ্কট নিরসনের ন্যূনতম পন্থা বিবেচনা করে অবিলম্বে তা মেনে নেয়ার দাবি জানান হয়। সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে গণআন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একদিনের বেতন আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৯]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শুধু গঠনমূলক পরামর্শ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দান করেই ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁরা আর্থিক সাহায্যের হস্তও প্রসারিত করেন। এতে সমাজের বিত্তশালীরাও সাহায্যদানে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত হয়।

গণহত্যার প্রতিবাদে এদিন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মর্তুজা বশীর সরকারের তথ্য ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় বিভাগ আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দেশের সকল চিত্রকরদের উক্ত প্রদর্শনী বর্জনের আহ্বান জানান।[৪০]

১২ মার্চ বাংলার মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বাস্তবমুখী প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য হাসান হাফিজুর রহমানকে আহবায়ক করে 'লেখক সংগ্রাম শিবির' গঠন করা হয়।[৪১] এ দিন অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) এক বিবৃতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তার সহযোগীদের প্রতি আহ্বান জানান।[৪২] অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ একজন পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবী। দৈনিক *আজাদের* সম্পাদক। *দৈনিক আজাদ* তখন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্ধ সমর্থক পত্রিকা। কিন্তু এ বুদ্ধিজীবীও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাঙালিদের দাবিকে সমর্থন না করে পারেননি।

---

[৩৭] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ মার্চ ১৯৭১।

[৩৮] চার দফা দাবি- (১) সামরিক আইন মার্শাল-ল প্রত্যাহার করতে হবে (২) সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে (৩)সকল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে হবে (৪) আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

[৩৯] *দৈনিক সংবাদ*, ১২ মার্চ ১৯৭১।

[৪০] তদেব।

[৪১] *দৈনিক সংবাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৭১। লেখক সংগ্রাম শিবিরের সদস্যবৃন্দ হলেন সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), আহমদ শরীফ, শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), শামসুর রাহমান, বদরুদ্দীন উমর (জ.১৯৩১), রণেশ দাশগুপ্ত(১৯১২-৯৭) (জ.১৯১২), সাইয়িদ আতিকুল্লাহ (জ.১৯৩৩), বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (জ.১৯৩৬), রোকনুজ্জামান খান (১৯২৫-১৯৯৯), ফজল শাহাবুদ্দিন (জ.১৯৩৬), সৈয়দ শামসুল হক (জ.১৯৩৫), আবদুল গাফফার চৌধুরী (জ.১৯৩৪), মহাদেব সাহা (জ.১৯৪৪), ফরহাদ মজহার (জ.১৯৪৭), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-২০০০), জহির রায়হান(১৯৩৫-১৯৫২), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (জ.১৯৩৬), আবু কায়সার (জ.১৯৪৫), মুনতাসীর মামুন (জ.১৯৫১), রফিক নওশাদ, শাহানুর খান, মো. নুরুল হুদা (জ.১৯৪০), সায্যাদ কাদির (জ.১৯৪৭), আহমেদ হুমায়ুন, আবদুল গনি, হুমায়ুন কবির, বশীর আল হেলাল (জ.১৯৩৬), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), ইখলাসউদ্দিন আহমদ, মিসেস লায়লা সামাদ ও মাসুদ আহমদ মাসুদ।

[৪২] তদেব।

১২ই মার্চ ১৯৭১ এ প্রায় শতাধিক মিছিল যায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। চলচ্চিত্র শিল্পীদের একটি মিছিল শহীদ মিনার থেকে বেরিয়ে ডিআইটি ভবনস্থ টেলিভিশন অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করে। মিছিল শুরুর আগে শহীদ মিনারে এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন চিত্রনায়ক রাজ্জাক, মোস্তফা, কবরী। তাঁরা জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এদিন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে সর্বশক্তি নিয়ে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফ, সাধারণ সম্পাদক কামাল লোহানী ও সদস্য আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা সভায় তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভাশেষে সাংবাদিকদের একটি জঙ্গি মিছিল বায়তুল মোকাররমে গিয়ে শেষ হয়।[৪৩]

১৯৭১ সালের ১২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এক সভায় মিলিত হয়ে পুনরায় বিশ্ববাসীর প্রতি বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করার জন্য আহবান জানায়। এদিন পঞ্চাশজন চারু ও কারুশিল্পীর উপস্থিতিতে আর্ট কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুর্তজা বশির ও কাইয়ুম চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। 'পটুয়া' কামরুল হাসানের আহ্বানে কলাভবনে 'পটুয়া' সমাজের এক সভা হয়। এ সভায় শাপলাকে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৪৪]

ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির ৪৮জন এ্যাডভোকেট জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সংকট অবসানকল্পে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪ দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিতে আইনজীবীরা অভিমত প্রকাশ করে বলেন:

> সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার এই দাবি খুবই ন্যায়সঙ্গত এবং তা পূরণে আপত্তি থাকা উচিত নয় কিংবা বিলম্বও ঠিক হবে না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার পর দেশে সামরিক আইন চালু রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই এবং একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন অব্যাহত রাখার পেছনেও কোন যুক্তি নেই।[৪৫]

বিবৃতিতে অন্যান্যদের মধ্যে স্বাক্ষর করেন: অ্যাডভোকেট আফসার উদ্দিন আহমেদ, মহিউদ্দিন আহমদ, সতীশ চন্দ্র রায়, এম এ বাসেত, মোঃ ইউসুফ আলী, এম দাউদ হোসেন ও শাহাদত আলী।[৪৬]

ঐ একই দিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ট্রেনী ডাক্তার সমিতির সভাপতি ডাঃ গাজী আব্দুল হক এক বিবৃতিতে জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে কর্মরত অধ্যাপকবৃন্দ বর্তমানে গণআন্দেলনে নিহত ও আহত পরিবার–পরিজনদের প্রত্যহ বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত নিজ নিজ চেম্বারে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবেন।[৪৭] এদিকে বাংলাদেশের চিকিৎসকগণও যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন। ১৫ই মার্চ 'পাকিস্তান মেডিকেল সমিতির পূর্বাঞ্চল শাখা' ও 'পূর্ব পাকিস্তান সরকারী চিকিৎসক সমিতি'–র যৌথ

---

[৪৩] তদেব।

[৪৪] *দৈনিক আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৭১; *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ মার্চ ১৯৭১।

[৪৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১।

[৪৬] তদেব।

[৪৭] তদেব।

উদ্দ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত চিকিৎসকদের এক সমাবেশে পূর্বাঞ্চল শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. সারোয়ার আলী বলেন:

> ডাক্তাররা সবসময় নির্যাতিত বুলেট খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়াইয়াছেন। তাহাদের কর্তব্য পালন ও যেকোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।[৪৮]

পাকিস্তান মেডিকেল সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডাক্তার মান্নান এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান চিকিৎসক সমিতির সভাপতি ডা: এস.এম.রব, পাকিস্তান মেডিকেল সমিতির পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি ডা: টি. আলী, পূর্ব পাকিস্তান চিকিৎসক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আশরাফ আহমদ, ডা: মোদাচ্ছের আলী, ডা: নাজমুন নাহার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। চিকিৎসকগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[৪৯] চিকিৎসক সমাজের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেক চিকিৎসক আন্দোলনকারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করেন।

১৩ মার্চ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' গণসঙ্গীতের আয়োজন করে। হাজার হাজার শ্রোতা এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে কোনো কোনো গণসঙ্গীতে কণ্ঠ মিলায়। 'জনতার সংগ্রাম চলবে' গানটির সঙ্গে বিপুল সংখ্যক শ্রোতাও অংশগ্রহণ করে। সকালে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। খবরে বলা হয়, পূর্বাহ্নে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের পরিচালক জনাব আশরাফুজ্জামানের আহবানে ঢাকা বেতার ভবনে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সহিত ঢাকা বেতার প্রতিনিধিদের এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপ আলোচনা ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রেও সংগ্রাম পরিষদ ও টেলিভিশনের কর্মী-কুশলীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়:

> সংবাদ, সঙ্গীত ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের নীতি হবে জনতাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা, জনতাকে প্রয়োজনবোধে কঠোরতর সংগ্রামের জন্য জাগ্রত রাখা। গণসংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বেতার ও টেলিভিশন কর্মীদের একযোগে কাজ করার কথা ঘোষণা করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে সংগৃহীত গান, নাটক, কবিতা, জীবন্তিকা প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বেতার ও টিভিকেন্দ্রে প্রেরণ করা হবে।[৫০]

১৪ই মার্চ, ১৯৭১-এ ঢাকার দৈনিকগুলোতে "আর সময় নেই" 'time is running out.'(অর্থাৎ সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে) শিরোনামে এক যৌথ সম্পাদকীয়তে আবেদন জানান হয়:

> আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে বলতে চাই, জাতি আজ চরমতম সংকটে নিপতিত। জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কি ধরনের সরকার কায়েম হবে তা নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা হল সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ তাদের দায়িত্বের আওতায় আসে না। অহিংস পথে

---

[৪৮] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ মার্চ, ১৯৭১।

[৪৯] তদেব।

[৫০] *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৭১।

> জনগণের সংগ্রাম পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল। তাঁদের হাত শক্তিশালী করতে হবে। আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছার জন্য নিবেদন জানাচ্ছি।[৫১]

পূর্ব বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের পঞ্চদশ দিবসে ১৬ই মার্চ, ১৯৭১ ঢাকায় রাজপথ প্রকম্পিত হয় শ্লোগান, মিছিল আর বজ্রশপথে। লেখক ও কারু শিল্পীদের মিছিল বেরোয়। বিকাল ৪টায় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয় চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ এবং লেখক সংগ্রাম শিবিরের মিছিল। যাত্রা শুরুর আগে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলেন:

> আমার সবুজ দেশ আজ লাল রঙের দেশ। অনেক রঙই আমার ছবিতে ব্যবহার করেছি। কিন্তু সবুজের দেশে লাল রঙের তুলনা নেই। সবুজের দেশের বুকের রক্তের লাল রঙ যারা রেখে গেছেন তাঁদের প্রাণের বাণীকে, তাঁদের সংগ্রামকে আমরা তুলির মাধ্যমে মূর্ত করে তুলবো।শিল্পী সমাজের নাটকে মোস্তফা, আলতাফ, রাজু আহমেদ, ফখরুল হাসান, হাফিজুর ও রাব্বানী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন আলতাফ মাহমুদ, জাহেদুর রহিম(১৯৩৫-৭৮),মোস্তফা জামান আব্বাসী ও অজিত রায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত ও সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখের কবিতা পাঠ করে শোনান – খান আতাউর রহমান, গোলাম মোস্তফা, হাসান ইমাম, আলী মনসুর, আনসার, আবদুল হামিদ ও আবদুল হাকিম। শুরুতে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে খান আতাউর রহমান সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।[৫২]

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর সরকারি খেতাব 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' বর্জন করেন। এপিপি এর খবরে প্রকাশ জনাব জয়নুল আবেদিন এক বিবৃতিতে বলেন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তিনি এই খেতাব বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।[৫৩] কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) তাঁর খেতাব 'সিতারা-ই-খিদমত' বর্জন করেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন:

> স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে বাঙালি ছাত্র-জনতা যখন প্রানপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙালির সেই চরম সংকটের মুহূর্তে একটি সরকারি খেতাব নামের সাথে যুক্ত রাখাকে তিনি একটি পরিহাস বলেই মনে করেন।[৫৪]

সকল বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রশ্নাতীত ছিল না, কবি আহসান হাবীব রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন। আবার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষ পরিবর্তন, দোদুল্যমানতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেওয়ার শামিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীও তাঁকে দেয়া 'সেতারায়ে ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেন। অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীগণও পাকিস্তানের দেয়া খেতাব বর্জনে এগিয়ে আসেন।[৫৫]

---

[৫১] ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশমাস*, পৃ. ৪১-৪২।

[৫২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মার্চ ১৯৭১; হাসান, *একাত্তরের দিনপঞ্জী*, পৃ. ৪৯।

[৫৩] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ মার্চ ১৯৭১।

[৫৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মার্চ ১৯৭১।

[৫৫] তদেব।

অসহযোগ আন্দোলনে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক শওকত ওসমানের 'স্বাধীনতার চিহ্ন' শিরোনামে লেখা প্রবন্ধ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর লেখায় তিনি বলেন:

> স্বাধীন জাতির অপরিহার্য শর্ত কী? জবাবে প্রথমেই বলা যায়: স্বাধীন দেশ বা জাতি তার নিজের সম্পদের উপর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। সেখানে অন্য কারো নাক গলানোর অধিকার বা ক্ষমতা নেই।[৫৬]

অনুরূপভাবে অসহযোগ ও মুক্তিসংগ্রামকে পুষ্ট করেছে লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ (জ. ১৯৩২)-এর 'আজকের আন্দোলন ও লেখক' শিরোনামে এক প্রবন্ধ:

> অনর্গল রচনা আমরা চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আকাঙ্খা, সাহিত্যের পাকা ফসল; যে তাজা রক্তধারা রাজপথে, শহরে, বন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, ঝলক ঝলক ঝাপটা মেরেছে আমাদের বুকে ও মুখে, তা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায় গ্রহণ করে বর্ষার নদীর মতো উজ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন।[৫৭]

অসহযোগ আন্দোলনের এই সময়ে লেখক-সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ ও শওকত ওসমানের লেখা ছিল সময়োপযোগী যা জনগণকে উজ্জীবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। এতে বুদ্ধিজীবী-জনতার সম্মিলন সম্ভব হয়েছিল। রাজনৈতিক কর্মসূচির সফলতায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে।

ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের এক সভায় অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান হয়। সভায় আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্যও সকল আইনজীবীর প্রতি আহবান জানান হয়।[৫৮] ১৭ মার্চ 'ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতি' ঢাকা বার লাইব্রেরী হল-এ আয়োজিত সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানায়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়:

> বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার উপর পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলনে অটল থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সৈয়দ আজিজুল হক, জিল্লুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, খন্দকার মাহবুব হোসেন এবং জালাল উদ্দিন ফারুক বক্তব্য রাখেন।[৫৯]

অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক বিরাট মিছিল ঢাকা বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণ করে। পরিভ্রমণকালে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি খতম করে শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে শ্লোগান প্রদান করেন।[৬০]

---

[৫৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ মার্চ ১৯৭১।

[৫৭] তদেব।

[৫৮] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৮ই মার্চ ১৯৭১।

[৫৯] *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ই মার্চ ১৯৭১।

[৬০] *দৈনিক সংবাদ*, ২২শে মার্চ ১৯৭১।

এদিকে প্রখ্যাত পাকিস্তানি আইনবিদ এ কে ব্রোহী ঢাকা সফরকালে অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আইনগত ফর্মুলার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রকৃতপক্ষে আইনগত কোনো বাধা নাই। উদাহরণ হিসাবে তিনি 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স এ্যাক্ট' এর কথা উল্লেখ করেন।[৬১]

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকমণ্ডলী', 'লেখক সংগ্রাম শিবির' এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ' ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানগামী পাকিস্তানি বিমান ও নৌবাহিনীর মালদ্বীপ ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দানের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে ঢাকা নগরীতে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। শিক্ষক-শিল্পী-সাহিত্যিকগণ ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। লেখক সংগ্রাম শিবিরের আহ্বায়ক হাসান হাফিজুর রহমানও এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ সরকারের এ ধরনের কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানান।[৬২]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ড. কামাল হোসেন অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে 'পাকিস্তান দিবসে' বলেন:

> ২৩শে মার্চ, ১৯৭১। একটি ব্যাতিক্রমধর্মী দিন। অন্যান্য বছর দিনটি 'পাকিস্তান দিবস' রূপে পালিত হত। কিন্তু '৭১ এর ২৩ মার্চ হাজার হাজার বাংলাদেশের পতাকা বিক্রি হল। আমার মনে পড়ে, ভোর ৬টায় আমি যখন গাড়ি নিয়ে আমার অফিস থেকে বের হলাম, তখন নওয়াবপুর রেলক্রসিং থেকে আমিও একটি বাংলাদেশের পতাকা কিনলাম। সংবিধানের সংশোধিত খসড়াসহ সকাল ৭টায় আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে পৌঁছলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে অনেক মিছিল এসে উপস্থিত হল এবং শেখ মুজিবের বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হল। অধিকাংশ বাড়ীঘর এবং গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে লাগল।[৬৩]

অসহযোগ আন্দোলন চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগোতে থাকে। বাঙ্গালিরা স্বাধীন পাকিস্তান দিবস পালন না করে পাকিস্তানকে ধিক্কার জানায়। কারণ একাত্তরের পূর্বের তেইশ বছরের ক্ষোভ ও বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ ছিল এ ঘটনা। বুদ্ধিজীবীদের নিখুঁত মূল্যায়নে তা বেরিয়ে আসে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর লিখিত প্রবন্ধে বলেন:

> মানুষের স্বাধীন বিকাশের জন্য স্বাধীন বাংলা চাই।' তিনি বলেন, 'মানুষে-মানুষে বৈষম্য ও দারিদ্র দূর করিতে না পারিলে পাকিস্তানের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে স্বাধীন বাংলার ইতিহাসেও ভবিষ্যতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে বাধ্য।' জনগণকে অভুক্ত রাখিয়া সেনাবাহিনী পুষ্ট করিয়া দেশরক্ষা করা যায় না, জনগণই দেশরক্ষার প্রকৃত বাহিনী।[৬৪]

হুমায়ুন কবীর তাঁর প্রবন্ধে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সঠিকভাবে তুলে ধরে ভবিষ্যৎ বাংলার ইতিহাসকে বীরত্বগাঁথায় সমৃদ্ধ করার জন্য লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান।[৬৫]

---

[৬১] *দি পিপল*, ২৩শে মার্চ ১৯৭১।

[৬২] *সংবাদ*, ২৪ মার্চ ১৯৭১।

[৬৩] হাসান হাফিজুর, *স্বাধীনতার দলিলপত্র*, ২:৭৮৯; *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ মার্চ ১৯৭১; ড.কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৭৪।

[৬৪] তদেব।

[৬৫] *দৈনিক সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৭১।

২৫শে মার্চ। ঢাকা নগরীতে প্রতিদিনের মতো এদিনও মিছিলের ঢল নামে। ঢাকা রাজপথ জনতার শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবুর রহমানের ৩২ নং বাসভবনের সম্মুখেও জনতার মিছিলের শ্লোগানে মুখরিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী রংপুর, সৈয়দপুর এবং চট্টগ্রামে পুনরায় গুলি চালানোর ঘটনায় ১১০ জন নিহত হওয়ার সংবাদ আসে। সেনাবাহিনীর এ হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে শেখ মুজিব ২৭শে মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন। বঙ্গবন্ধুর এ আহ্বান সংবাদপত্র সাহসিকতার সাথে প্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৫শে মার্চ পুনরায় জনগণের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সামরিক জান্তার প্রতি আহবান জানান। সংবাদপত্রে 'Only way out is to accept Awami League demands in toto' শিরোনামে লেখা হয়:

> The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, reiterated here today that no power on Earth could now frustrate the just and legitimate demands to the 75 million people of East Pakistan. The Awami League addressed a number of procession which marched upto his Dhanmondi residence today. He said, 'Our demand are just and clear and there is no other way out than to accept to the demands in toto.[৬৬]

## ৬. ঢাকার বাইরে অসহযোগ

অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবী সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে ৩রা মার্চ এক সভায় মিলিত হন। কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর আবদুল করিমের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনুষ্ঠিত এ সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং বর্তমান অবস্থায় ছাত্র শিক্ষক ঐক্যের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন।[৬৭] ৮ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তৃতা করেন:

> উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আবদুল করিম, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ফজলী হোসেন, ড. আনিসুজ্জামান প্রমুখ। এ আর মল্লিককে সভাপতি এবং ড. আনিসুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন–অধ্যাপক মাহবুব তালুকদার, অধ্যাপক রফিউদ্দিন আহমদ, ড.এখলাসউদ্দীন আহমদ, ড.এম বদরুদ্দোজা, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, অধ্যাপক হুজ্জাতুল ইসলাম লতিফী, রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান, ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবু হেনা মোহাম্মদ মহসীন, সহকারী প্রকৌশলী সুধীররঞ্জন সেন।[৬৮]

অসহযোগের দিনগুলোতে প্রত্যহই কোন না কোন সংগঠন কোন না কোন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল। আইনজীবী, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের কর্মসূচিও বাদ যায়নি। চট্টগ্রাম সরকারি

---

[৬৬] *The Morning News*, Karachi and Dhaka, 26 March 1971.

[৬৭] *দৈনিক পাকিস্তান*, 8 মার্চ ১৯৭১।

[৬৮] এ আর মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও মুক্তিসংগ্রাম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ৬৩; আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ.২৫।

কলেজের শিক্ষকেরা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সভা-সমাবেশ করেন। এ কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য বেসরকারি কলেজের শিক্ষকেরাও এগিয়ে আসেন।[৬৯]

১৫ মার্চ লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত অধ্যাপক আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন: এ. আর. মল্লিক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, নাজমুল আলম, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী (জ.১৯৩৬) ও আনিসুজ্জামান (জ.১৯৩৭)।[৭০] জনতার সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য নিজেদের আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আনিসুজ্জামান। এভাবে আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের আরো সক্রিয় হওয়ার তাগিদ দেন।

৪ঠা মার্চ বরিশালের আইনজীবীরা সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে।[৭১] ১৬শে মার্চ, ১৯৭১ খুলনার শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক ও শিল্পীরা বাংলাদেশের আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপনের এক কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। তাঁদের এক নীরব মিছিল প্রেস ক্লাব থেকে যাত্রা করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণের পর হাদিস পার্কের শহীদ মিনারে যায়। সেখানে তাঁরা গণআন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করার শপথ গ্রহণ করেন।[৭২] ফরিদপুর বার সমিতির সভাপতি খান বাহাদুর মুহাম্মদ ইসমাইল এক বিবৃতিতে বলেন:

> গভর্নর পদে নিযুক্ত ব্যক্তির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানিয়ে ঢাকা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি ন্যায়বিচার ও স্বদেশপ্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তজ্জন্য তাঁকে অবিলম্বে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বাণী পাঠানোর জন্য আমি ফরিদপুর বার সমিতির পক্ষ থেকে দেশের অন্যান্য সকল বার সমিতিকে অনুরোধ করছি। এই সংগে প্রেসিডেন্টের ঢাকা বাসভবনেও তারবার্তা পাঠিয়ে তাকে এইসব অনুরোধ জানানো হোক: তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, গণতন্ত্রের প্রতি প্রাথমিক বিধান মেনে চলবেন এবং অবিলম্বে ঘোষণা করবেন যে জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য প্রণীত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হবে এবং দেশকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও ধ্বংসের পথে না গিয়ে জাতীয় সংহতি রক্ষা করা হবে।[৭৩]

রাজশাহীতে ১৩ই মার্চ ১৯৭১-এ লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের এক যৌথ সভায় একটি 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চার দফা ও গণআন্দোলনের প্রতি সমর্থনে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান বর্তমান আন্দোলনভিত্তিক না হলে অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে তাঁরা ব্যানার ও প্লাকার্ড নিয়ে মিছিল করে এবং 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গান গেয়ে সভা শেষ হয়। তাঁদের আয়োজিত পথসভায় বক্তৃতা করেন প্রফেসর মযহারুল ইসলাম।[৭৪]

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান একাত্তরের ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার নামে ধাপ্পা দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫শে মার্চ দিন শেষে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। অবশেষে রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়ার নির্দেশ কার্যকর করতে পাক-সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি

---

[৬৯] তদেব, পৃ. ২৭।

[৭০] তদেব, পৃ. ২৮।

[৭১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ই মার্চ ১৯৭১।

[৭২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ই মার্চ ১৯৭১।

[৭৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ই মার্চ ১৯৭১।

[৭৪] তদেব।

জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংগঠিত হয় ইতিহাসের ভয়াবহ নৃশংস গণহত্যা। লাখো বাঙালি ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকান্ড বিশ্ববিবেককে গভীরভাবে নাড়া দেয়। দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ এ বর্বরোচিত হামলাকে প্রতিহত করতে রুখে দাড়াঁয়। বাঙালিদের মনে এক নতুন সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত হয়। শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যার পরিণতিতে সৃষ্টি হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র।[৭৫] সাতাশ বছর বয়সে নিবেদিত প্রাণ সাংবাদিক সাইমন ড্রিঙ্ক ২৫শে মার্চ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ছাদে পালিয়ে থেকে গণহত্যার জ্বলন্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। পাক বাহিনীর বিমান বন্দরের তল্লাসী থেকে সংগ্রহকৃত তথ্যাদি রক্ষা করে ব্যাঙ্কক থেকে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায়। এ প্রতিবেদনই বহির্বিশ্বে ঢাকার গণহত্যার প্রথম বিস্তারিত সংবাদ। সাইমন ড্রিং তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদনে যা তুলে ধরেন তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

> In the name of God and united Pakistan, Dacca is today a crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, cold-blooded shelling by units of the Pakistan Army as many as 7,000 people are dead, large area of the city have been lebeled and East Pakistan's fight for independence has been brutally ended. Despite claims by President Yahya Khan, head of the country's Military Government that the situation is now calm, tens of thousands of people are fleeing to the countryside, the city streets are almost deserted and the killings are still going on in other parts of the Province.[৭৬]

## ৭. উপসংহার

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলনের (২রা মার্চ ১৯৭১–২৫শে মার্চ ১৯৭১) গুরুত্ব অপরিসীম। অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জাতির সবচেয়ে সচেতন অংশ, জাগ্রত বিবেক বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবীগণ বাঙালি জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দিতে টালবাহানা করতে থাকে তখনই বুদ্ধিজীবীগণ সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনে জাতিকে অনুপ্রাণিত করেন। শিক্ষক ও অধ্যাপক সমাজ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আন্দোলনে উৎসাহিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে রাস্তায় নেমেছেন, মিছিল করেছেন এবং জাতির মুক্তির জন্য শপথ নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থেকে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে শিক্ষক অধ্যাপকবৃন্দের অনুপ্রেরণা, পরামর্শে ছাত্র যুবকরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্ররা ডেমি রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে এবং সর্বশেষে ২৫শে মার্চের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতম গণহত্যার পর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

সাংবাদিক, সাহিত্যিকরা সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর কঠোর নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পিছপা হননি। কবি-সাহিত্যিক-লেখকের

---

[৭৫] হাসান, *একাত্তরের দিনপঞ্জি*, পৃ. ৫৪।

[৭৬] Moudood Elahi (compilation), *Assignment Bangladesh'71* (Dhaka: Momin publications, 1999), p. 112.

প্রবন্ধ পাঠে জাতি অনুপ্রাণিত হয়েছে। ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর গোটা জাতি যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তখন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী তা দমন করেছে অস্ত্রের ভাষায়। মিছিলের উপর গুলি চলেছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। নিহত হয়েছে অনেকে। হত্যা করা হয়েছে বুদ্ধিজীবীগণকেও। আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য এগিয়ে এসেছেন চিকিৎসক সমাজ। আইনজীবীরা সাংবিধানিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন, কোর্ট বর্জন করেছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পী, চারু ও কারু-শিল্পী, সঙ্গীত-শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজক রাস্তায় নেমে এসেছেন, মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করেছেন। রেডিও-টেলিভিশনের শিল্পীরা শাসকবর্গের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাঙালির স্বার্থের অনুকুলে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারে শিল্পী সমাজ শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করেছেন।

রাজনৈতিক সঠিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনা যেমনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে তেমনি বুদ্ধিজীবীরাও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন, সহযোগিতা করেছেন–যা সাফল্যের শীর্ষ শিখরে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর কাছে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল প্রতিপক্ষ। তাই উনসত্তরের গণআন্দোলন, '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন, এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা বুদ্ধিজীবীদের নিধনের নীল নকশা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর মাথায় ছিল। সে দুরভিসন্ধির উলঙ্গ প্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে। পাকিস্তানের পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন তাদের এদেশীয় কিছু দোসরদের সহযোগিতায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

# আইবিএস প্রকাশনা

## পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

*আইবিএস জার্নাল* (বাংলা), ১৪০০:১–১৪১৪-১৫

*ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য* (সেমিনার : ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

*বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা* (সেমিনার : ৬), আমানুলাহ আহমদ (১৯৮৫)

*বাঙালীর আত্মপরিচয়* (সেমিনার : ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা* (সেমিনার : ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

*বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল),* ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

## Journals and Books (in English)

***The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,*** Vols. I-XXX (1976-2007)

***Reflections on Bengal Renaissance*** (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

***Studies in Modern Bengal*** (Seminar Volume 2), edited by S.A.Akanda (1984)

***The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905-1911)*** by M.K.U.Molla (1981)

***Provincial Autonomy in Bengal*** (1937-1943) by Enayetur Rahim (1981)

***The District of Rajshahi : Its Past and Present*** (Seminar Volume 4), edited by S.A.Akanda (1984)

***Tribal Cultures in Bangladesh*** (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

***Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh*** (Seminar Volume 8) edited by S.A.Akanda & M. Aminul Islam (1991)

***History of Bengal : Mughal Period, Vols. 1 & 2*** by Abdul Karim (1991, 1995)

***The Institute of Bangladesh Studies : An Introduction*** (2004)

***The Journal of the Institute of Bangladesh Studies : An Up-to-date Index*** by M. Shahjahan Rarhi (1993)

***Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses*** Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

***Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm*** edited by Priti Kumar Mitra & Jakir Hossain (2004)

# পঞ্চদশ সংখ্যার সূচিপত্র

| | | | |
|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী | ॥ | ১৯৩৭ সালের নির্বাচন : কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী কৌশল | ০৭ |
| বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা | ॥ | বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে চিত্রকলার ভূমিকা (১৯৪৮-১৯৭১) | ১৭ |
| আখতার জাহান দুলারী | ॥ | বাংলাদেশ-কুয়েত বাণিজ্যিক সম্পর্ক : সমস্যা ও সম্ভাবনা | ৩৩ |
| মুহাম্মদ আলা উদ্দিন | ॥ | মুসলিম নারী সমাজে 'পর্দাপ্রথা' এবং বাংলাদশের সমাজ বাস্তবতা :একটি ভূ-রাজনীতিক পর্যালোচনা | ৪৫ |
| এম. নূরুল ইসলাম<br>শেখ আশিকুর রহমান প্রিন্স | ॥ | চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরন : একটি এলাকাভিত্তিক সমীক্ষা | ৬৭ |
| মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী | ॥ | বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা | ৭৭ |
| শাহ্নাজ সুলতানা | ॥ | বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজের পরিবর্তমান পরিবার কাঠামো : একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ | ৯১ |
| মোঃ শাহ্ আজম<br>সালমা আক্তার | ॥ | বাংলাদেশে ই-কমার্স : প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা | ১০৭ |
| মো. রুহুল আমিন | ॥ | বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ড | ১২১ |
| খবির উদ্দীন আহম্মদ | ॥ | মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষা | ১৪৩ |